প্রকাশক :
অনুরাধা রায়
১৬৫, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৬

মুদ্রক :
এ সি রায়
এ পি প্রেস
১৬৫, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

সূচীপত্র

রুডইয়ার্ড কিপলিং

১৯০৭ এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ব্রিটিশ লেখক রুডইয়ার্ড কিপলিং। তাঁর জীবনের দীর্ঘদিন কেটেছে আমাদের এই ভারতবর্ষে এবং তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসও কিশোর-পাঠ্য গল্পসম্ভারে সে যুগের ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশ নরনারীর জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশিকতাবাদের প্রবক্তা কিপলিং 'ভারতবিদ্বেষী' হিসেবে এদেশে পরিচিত হলেও একালের বিচারে তার রচনাশৈলী ও পাঠককে সহজেই আবিষ্ট করার ক্ষমতা নতুন মূল্যায়নের দাবী রাখে।



ভারতবর্ষ

রুডইয়ার্ড কিপলিং

ইমরে সাহেব অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল। কোন ওয়ার্নিং না দিয়ে সম্ভাব্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই, যৌবনে এবং জীবনের সুরুতে—ইমরে সাহেব হঠাৎ দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গেল। অর্থাৎ ছোট্ট ভারতীয় শহরে সে চাকুরী করতো, সেখানে তাকে আর দেখা গেল না।

আগের দিন সে বেঁচেছিল, সুখে ছিল, ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলেছিল। পরের দিন সকালে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করেও বোঝা গেল না, লোকটা কোথায় গেছে।

লোকটা বাড়ীতে নেই, সময় মত অফিসে যায়নি এবং তার গাড়ীটা রাস্তায় নেই। এই সমস্ত কারণে এবং যেহেতু তার অনুপস্থিতি অতি সামান্য মাত্রায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, সাম্রাজ্যও অতি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্য থেমে ইমরে সাহেবের কি হয়েছে, তাই নিয়ে খোঁজ খবর নিলো। পুকুরে জাল ফেলা, কুয়োয় লোক নামালো এবং বারোশো মাইল দূরে নিকটতম বন্দরে ও ষ্টেশনে ষ্টেশনে টেলিগ্রাম পাঠানো হলো। কিন্তু জালে ইমরে সাহেব উঠলো না, টেলিগ্রামের তারেও লোকটা উঠলো না। লোকটার কোন খবর ধরা পড়লো না। লোকটা হারিয়ে গেছে।

তারপর ভারতীয় সাম্রাজ্যের কাজ আর থেমে থাকলো না এবং ইমরে সাহেব মানুষ থেকে প্রহেলিকায় হোলো।—এমন একটা রহস্য, যা নিয়ে ক্লাবের টেবিলে লোকে আসর জমায় এবং তারপরেই কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। ইমরে সাহেবের বন্দুক, ঘোড়া ও গাড়ী যে সবচেয়ে বেশী দাম দিয়ে কিনতে রাজী, তার কাছে বিক্রি করা হলো। ওর ঊর্ধ্বতন অফিসার ইমরে সাহেবের মাকে অবিশ্বাস্য একটা চিঠি লিখলেন।

লিখলেন, ইমরে উধাও, তার বাংলোটা খালি পড়ে আছে।

চিড়বিড়িনি গরমের তিন চারটে মাস গেলো। তারপর আমার বন্ধু পুলিশ অফিসার ষ্ট্রিকল্যাণ্ড নেটিভ জমিদারের কাছে ইমরের বাংলোটা ভাড়া নিল। ওর জীবন ধারণের ধারাটা অদ্ভুত ধরনের বলে লোকে বলাবলি করতো। ষ্ট্রিকল্যাণ্ডের বাড়ীতে খাবার জিনিষ সব সময় থাকতো কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে করতে সাইড-বোর্ড থেকে যা ইচ্ছে তুলে খেতো, অভ্যাসটা মানুষের পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর নয়। আমার বন্ধুর গেরস্থালী বলতে ছটা রাইফেল, তিনটে শটগান, ঘোড়ায় চড়ার পাঁচটা রেকাব এবং অনেকগুলো মাহশীর মাছধরার ছিপ, স্যামন মাছ ধরার জন্যে সবচেয়ে বড় যে ছিপ ব্যবহার করা হয় তার থেকেও বড়। এগুলো ওর বাংলোর আধখানা জুড়ে থাকতো। বাকী আধখানায় থাকতো ষ্ট্রিকল্যাণ্ড ও তার কুকুর টিয়েটজেনস।

টিয়েটজেনসের জন্ম রামপুরে। প্রকাণ্ড চেহারা, দিনে দুটো মানুষের খোরাকী খায়। কুকুরটা তার নিজস্ব ভাষায় প্রভুর সঙ্গে কথা বলে এবং বাইরে ঘুরতে ঘুরতে হার ম্যাজেস্ট ভারত-সম্রাজ্ঞীর শান্তি নষ্ট করতে পারে, এমন কিছু দেখলেই প্রভুর কাছে ফিরে এসে খবর দেয়। ফলটা হয়, ঝামেলা এবং নেটিভদের ফাইন বা কয়েদের সাজা।

স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করতো টিয়েটজেনস্ এক পরিচিত প্রেতাত্মা

এবং কাউকে ঘৃণা ও ভয় করলে সে যে সম্মান পায়, কুকুরটা নেটিভদের কাছে থেকে সেই সম্মান পেতো। বাংলোর একটা ঘর, বিছানা, কম্বল, জল, খাওয়ার পাত্র কুকুরটাকে দেওয়া হয়েছে।

কেউ রাতে ষ্টিকল্যাণ্ডের ঘরে ঢুকলে কুকুরটা তাকে ফেলে দিয়ে চেঁচাতে থাকে যতোক্ষণ না কেউ আলো আনে। একবার ও ষ্টিকল্যাণ্ডের জান বাঁচিয়েছিল। ফ্রন্টিয়ারে স্থানীয় কোন মার্ডারের খোঁজে গিয়েছিল ষ্টিকল্যাণ্ড।

লোকটাকে আন্দামানে পাঠানোর ধান্দা ছিল ষ্টিকল্যাণ্ডের। লোকটা তাকে আরও দূরে পাঠাবে বলে দাঁতের মধ্যে একটা ছোরা চেপে ধরে ভোর রাতের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে সাহেবের তাঁবুতে ঢুকছিল। কুকুরটা তখনই ওকে ধরে ফেলে এবং আইনের চোখে অপরাধ প্রমান হওয়ার পর লোকটার ফাঁসি হয়।

সেদিন থেকে টিয়েটজেনস্ গলায় রূপোর কলার পরে থাকে এবং তার কম্বলে একটা মনোগ্রামের ছাপ দেওয়া হয়েছে। কম্বলটা আবার ডবল-বুনট কাশ্মীরী পশমের।

সোহাগী কুকুরতো! কোন কারণেই ও ষ্টিকল্যাণ্ডের কাছ থেকে দূরে থাকতে রাজী নয়। একবার তার জ্বর হলে কুকুরটাকে নিয়ে ঝামেলা বেঁধে ছিল। ও প্রভুকে কি করে সাহায্য করতে হয় জানে না, অথচ কাউকেও কিছু করতে দেবেনা। শেষ-বেশ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাক্তার ম্যাকারনট কুকুরটার মাথায় বন্দুকের বাঁট মেরে বেহুঁস করে তবে ষ্টিকল্যাণ্ডকে কুইনিন্ ইনজেক্সন্ দিতে পারে।

ষ্টিকল্যাণ্ড ইমরে সাহেবের বাংলো ভাড়া নেওয়ায় কিছুদিন পরেই আমাকে কোন কাজে ওই ষ্টেশন হয়ে যেতে হয় এবং ক্লাবে জায়গা না পেয়ে আমি ওর বাংলোয় উঠি। বাংলোটা ভালো, আটটা ঘর, ছাদটা খড় দিয়ে ভাল করে ছাওয়া, যাতে বৃষ্টিতে জল না পড়ে এবং ছাদের ঠিক নীচে সীলিং-ক্লথ, চুণকাম করা ছাদের মতই দেখায়। ষ্টিকল্যাণ্ড

বাংলো নেবার সময় বাড়ীওলা নতুন করে ওটা রং করিয়েছে। ভারতীয় বাংলোগুলো কিভাবে তৈরী জানা না থাকলে কল্পনা করা যায় না যে ওই সীলিং-ক্লথের খানিকটা ওপরে তিন কোণা খড়ের-ছাওয়া ছাদের অন্ধকার সহর, যার ভেতরে ইঁদুর, বাদুড়, পিঁপড়ে কি নেই বলা শক্ত।

আমাকে দেখে সেণ্টপলস গির্জার ঘণ্টা ধ্বনির মতো আওয়াজ করে আমার কাঁধে থাবা রেখে টিয়েটজেনস্ জানালো, আমাকে দেখে সে খুশী। খাওয়ার পাট চুকিয়ে ষ্ট্রিকল্যাণ্ড নিজের কাজে গেল।

গ্রীষ্মের অসহ্য গরমের বদলে এখন বর্ষাকালের ভ্যাপসা গরম। হাওয়া নেই, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বর্শার মত মাটিতে পড়ছে, যেখানে জল ছিটকে উঠছে, সেখানটা নীল কুয়াশার মত দেখাচ্ছে। বাঁশঝাড়, আতাগাছ, পয়েনসেটিয়া, আমগাছগুলো জলের মধ্যে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

বাগানের বেড়ার ঝোপে ব্যাঙ ডাকছে। আলো নিভে আসার একটু আগে পেছনের বারান্দায় বসে আমি জলের শব্দ শুনছি আর ঘামাচি চুলকাচ্ছি। টিয়েটজেনসের মেজাজ ভালো নেই, বেচারা আমার কোলে মাথা রেখেছে। চা খাবার সময় ওকে বিস্কুট খেতে দিলাম। পেছনে ঘরগুলো অন্ধকার। ষ্ট্রিকল্যাণ্ডের রেকাব আর বন্দুকে তেলের গন্ধ, ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না।

আমার চাকর অন্ধকারে এসে দাঁড়ালো, লোকটার মসলিন—জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। ও বললো, এক ভদ্রলোক এসেছেন, কারো সঙ্গে দেখা করত চাইছেন মনে হয়। লোকটাকে আলো আনতে বলে আমি ড্রইংরুমে ঢুকলাম। মনে হল, একটা জানালার বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু আলো আনতে দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই, শুধু বাইরে বর্শার মত বৃষ্টি আর ভিজে মাটির গন্ধ। ইতিমধ্যে টিয়েটজেনস্ বৃষ্টির মধ্যে বাইরে পালিয়েছে। চিনি—লাগানো বিস্কুটের লোভ

দেখিয়ে অনেক কষ্টে ওকে ফিরিয়ে আনা গেল।

জলে ভিজে বাড়ী ফিরে ট্রিকল্যাণ্ড প্রথমেই বললো, কেউ এসেছিল? আমি জানালাম যে কেউ এসেছে বলে ভুল খবর দিয়ে আমার চাকর আমাকে ড্রইংরুমে ডেকে আনে কিম্বা কোনো লোফার হয়তো ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে এসে পরে হিম্মতে না কুলোনোয় পালিয়ে গেছে। হঁ্যা—না কিছু না বলে ডিনারের অর্ডার দিল ট্রিকল্যাণ্ড।

রাত ন'টার সময় আমরা শুতে গেলাম। টিয়েটজেনস এতোক্ষণ টেবিলের নীচে শুয়েছিল। এবার ষ্ট্রিকল্যাণ্ড যেমনই নিজের ঘরে ঢুকলো কুকুরটা উঠে বারান্দায় শুতে গেলো। প্রভুর ঘরের পাশেই কুকুরের সাজানো-গোছানো ঘর, কিন্তু কুকুরটা সেখানে না যেয়ে বারান্দায় শুতে গেলো দেখে অবাক হলাম। কারো বিয়ে-করা বউ যদি বৃষ্টির মধ্যে ঘর ছেড়ে বারান্দায় শুতে যেতো, আমি ততোটা অবাক হতাম না। কিন্তু টিয়েটজেনস্ কুকুর এবং প্রাণী হিসেবে নিশ্চয়ই মেয়ে মানুষের থেকে সেরা! আমি আশা করেছিলাম, কুকুরের মালিক কুকুরটাকে চাবকাবে। কিন্তু পারিবারিক ট্র্যাজেডীর কথা বলবার সময় লোকে যেমন অদ্ভুত হাসি হাসে, তেমনি হাসলো আমার বন্ধু। এখানে আসার পর থেকে ও বাইরে শুচ্ছে, আমার বন্ধু জানালো, ওকে যেতে দাও। ও ষ্ট্রিকল্যাণ্ডের কুকুর, সুতরাং আমি এই নিয়ে আর কিছু বললাম না। তবে এই রকম অবহেলা পেয়ে বন্ধুর মনের অবস্থাটা অনুমানে বুঝলাম। টিয়েটজেনস বারান্দায় আমার জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ঝোড়ো হাওয়ায় ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে, খড়ে-ছাওয়া ছাদে ধাক্কা দিচ্ছে। কাঠের দরজায় ডিম ছুঁড়ে মারলে হলুদ কুসুম যেমন ছিটকে যায়, বিদ্যুৎ তেমনি ছিটকে পড়ছে আকাশের গায়ে। তবে বিদ্যুতের আলো হলুদ নয়, বরং হাল্কা নীল। আমার জানালার বাঁশের-বাতার-তৈরী গরাদের বাইরে প্রকাণ্ড কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমুচ্ছেনা, পিঠের লোমগুলো

ঘাড়া, পাগুলো যেন লছমন-ঝোলার দড়ির ব্রীজের মত টান-টান। বজ্রের শব্দের মাঝে মাঝে আমার চোখ বুজে আসছে কিন্তু মনে হয় আমার নাম ধরে কে যেন ডাকছে, কিন্তু তার গলার স্বর ফিস্‌-ফিস্‌ আওয়াজের মতো, ভালো শোনা যাচ্ছে না। বজ্রবিদ্যুৎ থেমে যায়, আকাশে চাঁদ ওঠে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে চাপা গর্জন করে টিয়েট-জেনস। কে যেন আমার ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করে, বাড়ীটার ভেতর হেঁটে বেড়ায়, বারান্দায় ভারী নিঃশ্বাস নেয়। এবং ঠিক যখন আমার ঘুম আসছে, আমি ছাদে কিম্বা দরজায় কারো ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পাই।

আমি 'ষ্ট্রিকল্যাণ্ডের ঘরে ছুটে গিয়ে জানতে চাই, সে আমাকে ডাকছিল কিনা। অর্ধেক পোষাক পরা অবস্থায় পাইপ মুখে বিছানায় শুয়ে আছে ষ্ট্রিকল্যাণ্ড।

আমি জানতাম, তুমি আসবে, স্ট্রিকল্যাণ্ড বললো।

আমি কি আজকাল বাড়ীর এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছি? জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ, স্ট্রিকল্যাণ্ড কখনও ড্রইংরুমে কখনও স্মোকিংরুমে, কখনও বা অন্যত্র রাত দুপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেসে উঠে আমাকে শুতে যেতে বললো আমার বন্ধু।

নিজের ঘরে ফিরে আমি সকাল অবধি ঘুমুলাম। কিন্তু স্বপ্নেও জাগরণের মধ্যে আমার বার বার মনে হয়েছে যেন কার আমাকে খুব প্রয়োজন আছে, যেন কার প্রয়োজন না মিটিয়ে আমি অবিচার করছি। অথচ লোকটা কে, তার প্রয়োজনটাই বা কি, কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে, ফিস-ফিস করতে করতে দড়জার বোল্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে লুকিয়ে ঘরে যেতে যেতে সেই ছায়া শরীরী যেন আমার আলস্য কিম্বা শৈথিল্যের জন্যে অনুযোগ জানাচ্ছে এবং আধো ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি বাগানের বৃষ্টির শব্দও বারান্দায় টিয়েটজেনসের চাপা গর্জন। দুদিন আমি ওই ভুতুড়ে বাংলোয় ছিলাম। রোজ অফিসে চলে যেতো

আমার বন্ধু। আট দশ ঘন্টা আমাকে টিয়েটজেনসের সঙ্গে ঐ বাংলোয় থাকতে হোতো। যতোক্ষণ আলো থাকতো, আমরা দুজনেই শান্তিতে থাকতাম। কিন্তু অন্ধকার হলেই আমরা দুজনেই বারান্দায় বেরিয়ে জড়াজড়ি করে বসে থাকতাম। আপাতদৃষ্টিতে বাড়ীতে আমরা ছাড়া কেউ নেই কিন্তু সারা বাড়ী জুড়ে এমন এক অশরীরী অস্তিত্ব, যার সঙ্গে আমি গোলমাল করতে চাই না। আমি কখনও সেই প্রেতচ্ছায়াকে দেখতে পাইনি। কিন্তু চলে যাওয়ার পর ঘরের পর্দার কাঁপন আমার চোখে পড়ে। সে চেয়ার থেকে উঠলে বাঁশের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ আমার কানে আসে। ড্রইংরুমে বই আনতে ঢুকলে আমি বুঝতে পারি, আমি কখন চলে যাবো, সেই অপেক্ষায় কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

গোধূলির আলো রহস্যটা আরও বাড়িয়ে দেয়। কুকুর টিয়েটজেনস যখন লোম খাড়া করে অন্ধকার ঘরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আমার চোখে অদৃশ্য কোন ছায়া মানুষের গতিবিধি অনুসরণ করে। আমার চাকর এসে আলো জ্বাললে তবে আমার সঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢোকে টিয়েটজেনস। কিন্তু তখনও সে তক্কে তক্কে থাকে এবং আমার পেছনে অদৃশ্য কোন ছায়া মানুষের দিকে তার চোখ। কুকুর সঙ্গী হিসাবে আনন্দদায়ক, ধারণাটা নির্জলা মিথ্যে, এতোদিনে বুঝলাম।

অবশেষে বাধ্য হয়ে আমি স্ট্রিকল্যাণ্ডকে যতোটা সম্ভব ঠাণ্ডা মেজাজে বোঝালাম যে যদিও তার আতিথেয়তা আমার পছন্দ, তার বন্দুক ও মাছ ধরা ছিপগুলো ও আমার অপছন্দ নয়, তবু আমি এই বাংলোর পরিবেশ পছন্দ করছি না এবং সেই জন্যেই আমি এখন ক্লাবেই থাকবো। স্ট্রিকল্যাণ্ড ক্লান্ত হাসি হেসে বললো: এখানেই থাকো। ব্যাপারটার মানে কি, দেখাই যাক। এই বাংলোয় আসার পর থেকেই ব্যাপারটা আমার নজরে এসেছে। ...টিয়েটজেনস আমাকে ছেড়ে গেছে, তুমিও যেতে চাও? এর আগে আমি বিধর্মীদের মূর্তি

সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে প্রায় পাগলা গারদে যাওয়ার মত অবস্থায় পড়েছিলাম। দ্বিতীয়বার সে রকম অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছে আমার নেই। সাধারণ লোকে যে ভাবে ডিনার খায়, স্ট্রিকল্যাণ্ড তেমনি স্বাভাবিকভাবে ঝামেলায় পড়ে।

সুতরাং আমি আরও পরিষ্কার করে বললাম যে যদিও আমি ওকে খুবই পছন্দ করি এবং দিনের বেলা ওর সঙ্গে দেখা হলে যদিও আমি খুবই খুশী হবো, ওর বাংলোয় রাত কাটাবার সামান্যতম ইচ্ছেও আমার নেই। কথাটা ওকে জানালাম ডিনারের পরে। ততোক্ষণে টিয়েট্‌ভেনস বারান্দায় বেরিয়ে গেছে ভূতের ভয়ে।

খুবই স্বাভাবিক, ছাদের দিকে তাকিয়ে স্ট্রিকল্যাণ্ড বলে,

ওই দেখো! দেওয়াল ও ছাদের নীচে সীলিং ক্লথের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে বাদামী রঙের দুটো সাপের লেজ! ল্যাম্পে-র আলোয় সাপ দুটোর দীর্ঘ ছায়া। সাপ দেখলে আমার ভয় ও ঘেন্না হয়। কেননা সাপের চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, ওরা মানুষের পতনের রহস্য জানে ও যখন নন্দন কানন থেকে আদম বহিষ্কৃত হয়, তখন শয়তান মানুষের উদ্দেশ্যে যে ঘৃণা অনুভব করেছিল, সাপের চোখে সেই অনুভূতি। তাছাড়া তার দংশনে মৃত্যু।

ছাদটা নতুন করে ছাওয়া দরকার।

আমি বলি, মাছ ধরা ছিপটা দাও। আমি ওদের টেনে নামাচ্ছি।

না হে, ওরা ছাদের বীমে লুকিয়ে পড়বে। আমি ছাদে উঠে ওদের খুচিয়ে নামাচ্ছি। তুমি রড হাতে তৈরী থাকো, নামলেই মারবে।

বারান্দা থেকে মালীর ব্যবহৃত মই এনে ঘরের দেয়ালে লাগালো স্ট্রিকল্যাণ্ড। সাপের লেজগুলো সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় ও চটের মত সীলিং ক্লথের আড়ালে ওদের দীঘল শরীরের খস্‌খস্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সে ল্যাম্প হাতে মই বেয়ে উঠতে থাকে। আমি ওকে সীলিং ক্লথ ও ছাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাপ খোঁজার

বিপদ এবং সীলিং-ক্লথ ছিঁড়ে বাড়ীওয়ালার সম্পত্তি নষ্ট করার অযৌক্তিকতা বোঝাবার চেষ্টা করি।

ননসেন্স।

স্টিকল্যাণ্ড বলে।

ওরা কাপড়ের আড়ালে দেয়ালের ধারে লুকোবে। ইটগুলো সাপের পক্ষে এখন বড্ড বেশী ঠাণ্ডা, সেই তুলনায় ঘরটা গরম। ওরা গরম খুঁজছে।

দেয়ালের কার্নিস থেকে সীলিং ক্লথ ছেঁড়ে স্টিকল্যাণ্ড। তারপর সেই ফাঁক দিয়ে ছাদের বীমগুলোর মধ্যে উঁকি দেয়। আমি দাঁতে দাঁত চেপে রড তুলি, কারণ ছাদ থেকে কি যে আমার মাথার ওপরে নামবে, কিছুই বলা যায় না।

হুঁ!

ছাদে স্টিকল্যাণ্ডের গলার আওয়াজ মেঘের গুরু গুরু গর্জনের মত শোনায়।

ছাদ আর সীলিং ক্লথের মাঝখানে আর একটা ঘরের মত জায়গা আছে।

বাই জোভ, এখানে কে যেন রয়েছে! সাপ? আমি নীচে থেকে জানতে চাই।

না, মরা মানুষের লাস। ছিপটা দাও তো, খুঁচিয়ে দেখি। ওটা ছাদের বড় বীমটায় শুয়ে আছে।

আমি ছিপটা তুলে দিই।

পেঁচার বাসা, সাপের আড্ডা! ছাদে উঠে ছিপ দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে স্টিকল্যাণ্ড বলছে, যেই হও, বেরিয়ে এসো! হ্যাঁ, মাথাটা বেরিয়েছে, এবার নীচে পড়ছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে সীলিং-ক্লথ ভারী কিছুর ভারে নীচের ল্যাম্পটার দিকে ঝুলে পড়ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি ল্যাম্পটা সরিয়ে নিলাম। ফরফর করে দেয়াল থেকে ছিঁড়ে এলো সীলিং-ক্লথ,, ফাটলো, দুললো,

ফাঁক হয়ে গেলো এবং টেবিলের ওপর ভারী কিছু একটা পড়লো,, যার দিকে তাকাতে আমার সাহস হচ্ছিল না।

স্ট্রিকল্যাণ্ড মই থেকে নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। সে বেশী কথার লোক নয়, টেবিল ক্লথটা তুলে টেবিলের ওপরের লাশটা ঢেকে দিলো।

মনে হচ্ছে, আমার বন্ধুই ঘরে ফিরে এসেছে। ততোক্ষণে লাশ-ঢাকা টেবিল ক্লথটা একটু নড়ছে! ছোট্ট একটা সাপ বেরিয়ে আসতেই ষ্ট্রিকল্যাণ্ডের হাতের ছিপের বাঁট তার পিঠে পড়ে সাপটার পিঠ ভেঙে গেল। আমার এতে খারাপ লাগছিল, আমি আর কোন মন্তব্য করলাম না। যাই হোক, কাপড়ের নীচে আর কোনও জীবনের চিহ্ন দেখা গেল না।

সত্যিই কি ইমরে?

আমি জানতে চাইলাম।

হ্যাঁ, ইমরে। ওর গলাটা এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত দু ফাঁক করে কাটা।

তারপর আমরা এক সঙ্গে উঠি : তাই ওর প্রেতাত্মা ফিস ফিস করে সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতো।

...ততোক্ষণে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কুকুর টিয়েটজেনস ঘরে এসেছে। ছেঁড়া সীলিং ক্লথ। টেবিল অবধি ঝুলছে, ঘরে নড়াচড়ার জায়গা নেই। কুকুরটা বসে পড়েছে।

ব্যাপারটা খারাপ। কেউ মরবার জন্যে বাংলোর ছাদে ওঠে না এবং সীলিং ক্লথ দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রাখে না। এখন প্রশ্ন হলো, ইমরেকে কে খুন করলো? আমি যখন এই বাংলো ভাড়া নেই, ইমরের চাকর বাকরদেরও নিয়েছি। ইমরে নির্দোষ, ঝুট ঝামেলায় থাকতো না, তাই না? আর যদি সব চাকরগুলোকে একসঙ্গে ডাকি, ওরা সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আর্যদের ষ্টাইলে গুলতাপ্পি মারবে।

এক এক করে ডাকলে ওরা ছুটে গিয়ে দোস্তদের খবর দেবে।

বাইরে কাশির শব্দ। স্ট্রিকল্যাণ্ডের দেহরক্ষী বাহাদুর খানের ঘুম ভেঙেছে বোঝা গেলো। ভেতরে এসো। খুব গরম, তাই না?

ছ' ফুট লম্বা মুসলমান দেহরক্ষী বাহাদুর খানের মাথায় সবুজ পাগড়ী।

বাহাদুর খান, কাল আমি হরিণ শিকারে যাবো। ওই ছোট্ট রাইফেল আর গুলির কেসটা নিয়ে এসো।

স্ট্রিকল্যাণ্ড বললো।

৩৬ এক্সপ্রেস রাইফেলের ব্রীচে গুলি ভরলো স্ট্রিকল্যাণ্ড। বাহাদুর খান, ইমরে সাহেব হঠাৎ ইউরোপে চলে গেছেন, তাই না?

হ্যাঁ, সাহেব, লোকে তাই বলে—উনি ফিরলে তুমি আবার ওঁর কাছে চাকরী করবে?

হ্যাঁ, সাহেব, নিশ্চয়ই। উনি আমাদেব সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করতেন।

কিন্তু বাহাদুর খান। ইমরে সাহেব হঠাৎ ইউরোপে চলে গেলেন, ব্যাপারটা কি রকম আশ্চর্য্য নয়?

সাহেব, সাদা মানুষদের নিয়ম কানুন আমরা কি বুঝি?

খুবই কম বোঝ। তবে শীগগিরই আরও বুঝবে। ইমরে সাহেব তাঁর দীর্ঘ যাত্রা শেষ করে এসে পাশের ঘরে ওঁর চাকরের জন্য অপেক্ষা করছেন, ততক্ষণে স্ট্রিকল্যাণ্ডের লোডেড রাইফেলের নল বাহাদুর খানের চওড়া বুকের মুখোমুখি। হাতে ল্যাম্প, পেছনে রাইফেল দিয়ে খোঁচাচ্ছে ষ্ট্রিকল্যাণ্ড, পাশের ঘরে ঢুকে ছাদের ছেঁড়া সীলিং ক্লথ মেঝেয় আধমরা সাপ ও সবশেষে ফ্যাকাশে মুখে টেবিল ক্লথে মোড়া ইমরের লাশটা দেখলো বাহাদুর।

দেখেছো? ষ্ট্রিকল্যাণ্ড জানতে চায়।

হ্যাঁ, সাদা মানুষের হাতে আমি কাদার তালের মতো। হুজুর, কি করতে চান?

এক মাসের মধ্যে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাই, আবার কি ?

ইমরে সাহেবকে খুন করার জন্যে ? না, সাহেব, ভেবে দেখুন, ইমরে সাহেব আমার বাচ্ছা ছেলেটাকে নজর দিয়েছিলেন। চার বছরের ছেলেটা দশ দিনের মধ্যে জ্বরে ভুগে মারা যায়।

ইমরে সাহেব কি বলেছিলেন ? উনি বললেন, ছেলেটা খুব সুন্দর, তার মাথায় হাত দিয়ে উনি আদর করলেন। ওঁর ডাকিনী—বিদ্যার প্রভাবে ছেলেটা জ্বরে ভুগে মারা গেল।

সাহেব যখন রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন, আমি ওঁকে খুন করি।

তারপর কুকুরটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বাহাদুর খান বললো—

শয়তানের অনুচরটাই শুধু জানতে পারে, আমি কি করেছি। বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করছো, তবে দড়ি দিয়ে বীমের সঙ্গে লাশটা বেঁধে রাখোনি বলে এখন তুমি দড়িতে ঝুলবে। আর্দালী !

ঢুলতে ঢুলতে দুটো পুলিশ ভেতরে ঢুকলো ? ওকে থানায় নিয়ে যাও।

তাহলে আমার ফাঁসি হবে ?

সূর্য ওঠে কিম্বা জল গড়িয়ে যায়, এদুটো যেমন সত্যি, তেমনই—

না, সাহেব, দেখুন, আমি মরেই গেছি ! পাটা তুলে দেখালো বাহাদুর। আধমরা সাপের মাথাটা ওর পায়ের কড়ে আঙুল কামড়ে ধরে আছে।

সাহেব, আমি জমিদার পরিবারের ছেলে। লোকের সামনে ফাঁসিতে মরা আমার পক্ষে লজ্জাকর। তাই আমি এইভাবে আত্মহত্যা করছি। মনে রাখবেন, সাহেবের সার্টগুলো সব গুণে রাখা হয়েছে এবং তাঁর বেসিনে এক টুকরো সাবান রাখা হয়েছে। আমার বাচ্ছা ছেলেকে ডাকিনী বিদ্যায় খুন করেছিল ইমরে সাহেব। তাই ইমরে সাহেবকে আমি খুন করেছি। তোমরা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইলে কেন ? এখন আমার সম্মান বেঁচেছে এবং আমি মরে

যাচ্ছি।

এক ঘণ্টা পরে সাপের বিষক্রিয়ায় মারা গেল বাহাদুর খান। তার ও ইমরে সাহেবের লাশ ছুটো পুলিশ নিয়ে গেল।

এর নাম উনবিংশ শতাব্দী, ষ্ট্রিকল্যাণ্ড বলে। ইমরে ভুল করেছিল, আমি জবাব দিই, প্রাচ্যের চিন্তাধারা না বোঝা এবং ঋতু পরিবর্তনের দরুন বাচ্চা ছেলের জ্বর হওয়ার ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগের ফল। বাহাদুর খান চার বছর ওর কাছে চাকরী করেছে।

…হরিণ শিকারী কুকুর টিয়েটজেনস এবার তার নিজের ঘরে ফিরে নিজের কম্বলের নীচে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছে। পাশের ঘরে শূন্য শিথিল ছেঁড়া সীলিং ক্লথ টেবিল ক্লথের ওপর লুটোচ্ছে।

আমার নিজের চাকরও চার বছর আমার চাকরী করেছে। সে এখন আমার বুট খুলছে। আমি ওকে বলি—

ব্যাপারটা তুমি কিছু বুঝেছিলে? গোধূলি আলোয় যে অশরীরা সুবিচারের আশায় বাংলোয় আসতো—

আস্তে সাহেব, বুটটা আমাকে খুলতে দিন।

* * *

উইলিয়াম ফকনার

১৯৪৯ এ নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষ্যে এক বক্তৃতায় অ্যামেরিকান কথাশিল্পী উইলিয়াম ফকনার বলেছিলেন : মানুষ শুধু সহ্য করবেনা, সে জয় করবে। অথচ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দ্য সাউণ্ড অ্যাণ্ড দ্য ফিউরি', শ্রেষ্ঠ বড় গল্প 'দ্য বেয়ার' এবং বর্তমান সংকলন অন্তর্ভুক্ত শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প 'রোজ ফর এমিলি' মানুষের যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনের, ব্যর্থতার ও অসম্পূর্ণতার আলেখ্য। য়ুরোপীয় 'চেতনাতরঙ্গ' আংগিকের ধারায় এক জটিল কথনরীতি সাহিত্যে এনেছিলেন ফকনার এবং সুবোধ বালকপাঠ্য সহজ ও জনপ্রিয় কোন গল্প-উপন্যাস তিনি জীবনে কখনো লেখেননি।



এমিলির জন্য গোলাপ

উইলিয়াম ফকনার

॥ এক ॥

যখন মিস এমিলি গ্রিয়ারসন মারা গেলেন, সারা শহরের মানুষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে ছুটেছিল। পুরুষেরা গিয়েছিল ভেঙে পড়া এক স্মৃতিস্তম্ভকে সম্মান ও ভালবাসা জানাতে, মেয়েরা এমিলির বাড়ীর ভেতরটা দেখতে চেয়েছিল। একজন পুরোনো চাকর—যে একই সঙ্গে বাগানের মালী ও রান্না-ঘরের পাচক, সে ছাড়া আর কেউ গত দশ বছর এমিলির বাড়ীর ভেতর ঢোকেনি।

বাড়ীটা প্রকাণ্ড। চৌকোণা ফ্রেমের দেয়ালগুলো এককালে সাদা ছিল। গোল গম্বুজ, বুরুজের আকাশ-ছোঁয়া ছুঁচলো চূড়া, গুটোনো পার্চমেণ্টের মত ঝুল-বারান্দা।

বাড়ী তৈরীর ষ্টাইল—ভারিক্কী অথচ ঠুনকো। এই রাস্তাটা ছিল আমাদের শহরের সবচেয়ে অভিজাত পাড়া। কিন্তু মোটর-গ্যারেজ এবং কার্পাস তুলো থেকে বীজ ঝাড়াই করার মেসিন আজ এই এলাকায় স্মরণীয় নামগুলো মুছে দিয়েছে। কার্পাস তুলোর ওয়াগন ও পেট্রল পাম্পগুলোর মাঝখানে একা জেগে আছে মিসেস এমিলির

বাড়ীটা—অবাধ্য জেদী ছিনাল মেয়ের ভাঙা শরীরের মত। ওয়াগন ও পাম্পগুলো যেন চোখের বালি। এবং এখন, যেখানে সীডারের ছায়ায় গোরস্থানে শুয়ে আছে জেফারসনের যুদ্ধে দু'পক্ষের নিহত যত সৈনিক, যাদের পদমর্য্যাদা আমরা জানি; কিন্তু নাম জানিনা, সেখানে আরও অনেক স্মরণীয় নামের প্রতিনিধিদের পাশে শুয়ে থাকবে মিস এমিলি।

বহু বছর ধরে মিস এমিলি আমাদের শহরের ঐতিহ্য, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের প্রতীক। উত্তরাধিকারসূত্রে সে দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চেপেছে, ১৮৯৪এ, যেদিন থেকে শহরের মেয়র কর্ণেল সারটোরিস—হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোকই প্রথম নির্দেশ জারী করেছিলেন, অ্যাপ্রন না পরে কোন নিগ্রো মেয়ে সহরের রাস্তায় বের হতে পারবে না—অথচ উনিই বললেন, মিস এমিলিকে কোন ট্যাক্স দিতে হবে না, ওর বাবার মৃত্যুর সময় থেকে যতোদিন পর্যন্ত বাঁচবে এমিলি, ততোদিন। জটিল একটা গল্প আবিষ্কার করেছিলেন মেয়র কর্ণেল সারটোরিস—মিস এমিলির বাবা আমাদের শহরের পৌর-কর্তৃপক্ষকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, ব্যবসায়িক স্বার্থে এইভাবে টাকাটা ফেরত দিচ্ছে শহরের মানুষ।

কর্ণেল সারটোরিসের যুগের একজন মানুষের পক্ষেই এমন অদ্ভুত একটা আবিষ্কার সম্ভব। এবং একজন রমণী ছাড়া আর কেউ কি এটা বিশ্বাস করতো? অথচ মিস এমিলি কারও করুণার পাত্রী হতে চায়নি। সে বিশ্বাস করেছিল, কর্ণেল সারটোরিস যা বলেছেন তাই সত্যি।

* * *

এলো নতুন যুগ এবং আধুনিক চিন্তাধারা—ব্যবস্থাটা নতুন মেয়র আর অল্ডারম্যানদের মনঃপূত হল না। বছরের প্রথমে মিস এমিলিকে ট্যাক্সের নোটিশ পাঠানো হল। ফেব্রুয়ারী মাস এলো, কিন্তু চিঠির উত্তর এলো না। ওরা কানুন-মাফিক চিঠি দিলেন, এমিলিকে তার

সুবিধা অনুযায়ী শেরিফের অফিসে দেখা করতে বলা হল। এক সপ্তাহ পরে মেয়র নিজেই চিঠি লিখলেন, উনি কি এমিলির বাড়ী যাবেন, না গাড়ী পাঠালে মিস এমিলি আসবেন ?

এবার উত্তর এল—সেকেলে ও এক অদ্ভুত ধরণের কাগজে অস্পষ্ট কালিতে সরু ফুলকাটা অক্ষরে লেখা—এমিলি আজকাল বাড়ীর বাইরে যায় না। সঙ্গে ট্যাক্স-নোটিশটা বিনা মন্তব্যে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

অল্ডারম্যানদের স্পেশাল মিটিং ডাকা হল। তারপর এক প্রতিনিধি-দল ওর সঙ্গে দেখা করতে গেল। চীনে-মাটির ওপরে কারুকাজ আঁকার ক্লাস নিতো এমিলি, আট দশ বছর আগে—ক্লাশ বন্ধ হওয়ার পরে আর কেউ কখনও তার বাড়ীতে ঢোকেনি। ওরা দরজায় ধাক্কা দিতে বুড়ো নিগ্রো চাকর দরজা খুলে দিল। হলঘরের আবছা আলো থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে গাঢ়তর ছায়ার দিকে। ধুলো এবং অব্যবহৃত ঘরের গন্ধ—বন্ধ ঘরের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ।

নিগ্রো চাকর ওঁদের বসবার ঘরে নিয়ে গেল। লোকটা একটা জানলার পর্দা সরালো। ওঁরা দেখলেন, ভারী চামড়ায় মোড়া আসবাবপত্র, কিন্তু চামড়ায় ফাটল দেখা দিয়েছে।

ওঁরা বসলেন, ওঁদের উরুর কাছাকাছি সূক্ষ্ম ধুলোর রেণু সূর্য কিরণের নিঃসঙ্গ রেখায় ধীর বহমান অণুর মত ঘুরছিল। ইজেলের বুকে সময়ের দাগ, সেখানে মিস এমিলির বাবার ছবি—রঙিন খড়ি ও পেন্সিলে আঁকা। এমিলি ঘরে ঢুকতেই ওরা উঠে দাঁড়ালেন। বেঁটে-মোটা মহিলার পরনে কালো পোষাক, সোনার সরু চেন কোমরে নেমে এসেছে, বেল্টের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। আবলুশ কাঠের ছড়িতে ভর দিয়ে সে হাঁটছিল, ছড়ির সোনা-বাঁধানো মাথায় ময়লা দাগ। তার শরীরের হাড়গুলো সরু। তাই যে চেহারায় অন্য কাউকে গোলগাল মনে হত, এমিলিকে মনে হয় বেঢপ মোটা। তার চোখে মুখে কেমন একটা ফোলা ফোলা ভাব—

যেন স্রোতহীন জলে দীর্ঘদিন ডুবে আছে একটা মানুষের শরীর, যেন তার চামড়ায় জলে-ডোবা শবদেহের ফ্যাকাশে রং। মুখে অসংখ্য চর্বির স্তর, চোখ দুটো তারই মধ্যে হারিয়ে গেছে—যেন কেউ একতাল ময়দার ভেতরে দুটো জ্বলন্ত কয়লার কুচি পুরে দিয়েছে। এমিলি ওদের বসতে বলেনি। দরজায় দাঁড়িয়ে ও চুপ করে শুনছিল। অল্ডম্যান কথা বলতে বলতে হোঁচট খাচ্ছিল, কথা জড়িয়ে গিয়েছিল, এক সময় উনি থেমে গেলেন। তারপর ওরা শুনতে পেলেন এমিলির পোষাকের আড়ালে সোনার চেনের প্রান্তে অদৃশ্য ঘড়ির টিক-টিক শব্দ।

'জেফারসনে আমি কোন ট্যাক্স দিই না'—এমিলির গলা শুকনো, ঠাণ্ডা 'কর্ণেল সারটোরিস আমাকে বুঝিয়ে ছিলেন, আমার কাছে এ শহরের কোন ট্যাক্স পাওনা নেই। সিটি রেকর্ডস যদি কেউ খুঁজে দেখেন, তাহলেই দেখবেন—'

আমরা দেখেছি। মিস এমিলি, আমরা শহরের নতুন প্রশাসক। আপনি কি শেরিফের নোটিশ পাননি?'

'হ্যাঁ কটা কাগজ আমাকে পাঠানো হয়েছে। যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি হয়তো ভাবছেন, তিনিই শেরিফ। কিন্তু জেফারসন শহরে আমাকে ট্যাক্স দিতে হয় না—'

'কিন্তু রেকর্ডে সে রকম কিছু লেখা নেই। আইন অনুযায়ী আমাদের'—

'আপনারা কর্ণেল সারটোরিসের সঙ্গে দেখা করুণ।' (অথচ কর্ণেল সারটোরিস প্রায় দশ বছর আগে মারা গেছেন) জেফারসনে আমি ট্যাক্স দিই না...

'টোবে!' নিগ্রো চাকরটা এগিয়ে এল, 'এঁদের বাইরে নিয়ে যাও।'

॥ দুই ॥

ওঁরা হেরে গেলেন। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে মিস এমিলির বাড়ি থেকে যখন অদ্ভুত একটা দুর্গন্ধ হওয়ায় ছড়াতো, তখনও একই

ভাবে হার মেনেছিল ওঁদের পূর্ব পুরুষেরা। আর দু'বছর আগে এমিলির বাবা মারা গেছেন, সামান্য ক'দিন আগে এমিলির প্রেমিক ওকে ছেড়ে গেছে। অথচ আমরা ভেবেছিলাম, হোমার ব্যারনের সঙ্গেই এমিলির বিয়ে হবে।

বাবার মৃত্যুর পরে খুব কমই বাইরে যেত এমিলি। হোমার ব্যারন যে দিন তাকে ছেড়ে গেল, লোকে এমিলির দেখাই পেতো না। সাহস করে দু একজন মহিলা হয়তো দেখা করতে গেছেন, কিন্তু এমিলি দেখা করেনি। গোটা বাড়িতে জীবনের একমাত্র চিহ্ন ছিল নিগ্রো চাকর টোবে, তখনও সে যুবক—বাজারের ঝুড়ি হাতে সে বাইরে যেতো, ভেতরে ঢুকতো।

'পুরুষ মানুষ কি রান্নাঘর সাফসুৎরো রাখতে পারে?'

মেয়েরা বলতো। তাই এমিলির বাড়ি থেকে যখন তীক্ষ্ণ দুর্গন্ধ ভেসে এল, ওরা অবাক হয়নি। বিশ্রী গন্ধটা হাওয়ায় ছড়াচ্ছিল—বাইরের স্থূল অতি সাধারণ জনবহুল পৃথিবী এবং অভিজাত গ্রিয়ারসন পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের আর একটা সূত্র।

প্রতিবেশিনী এক মহিলা মেয়রের কাছে অভিযোগ জানালেন। তখন ঐ শহরের মেয়র প্রাক্তন বিচারপতি ষ্টিভেনসের বয়স আশি বছর।

'কিন্তু ম্যাডাম, এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?'

'কেন, মিস এমিলিকে খবর পাঠান, এভাবে আশে পাশে বদ গন্ধ ছড়ানো আইন বিরুদ্ধ—'

'তার দরকার হবে না। হয়তো বাড়ির আশে পাশে সাপ বা ইঁদুর মেরে ফেলে রেখেছে ওই নিগ্রো চাকরটা।......আমি ওকে বলবো—'

কিন্তু পরের দিন মেয়রের কাছে আরও দুটো অভিযোগ এল। কিছুটা দুঃখিত ও কিছুটা বা লজ্জিত হয়ে এক ভদ্রলোক লিখেছেন, কিছু একটা করা দরকার। আমি মিস এমিলিকে বিরক্ত করতে চাইনা। কিন্তু বিশ্রী গন্ধটা—

সেদিন রাতে অল্ডারম্যানদের মিটিং বসলো—তিনজন পাকা-দাড়ি বুড়ো এবং নতুন যুগের একজন কম বয়সী সদস্য। ব্যাপারটা খুবই সরল, অল্প বয়সী ভদ্রলোক বোঝাচ্ছিলেন, মিস এমিলিকে লোক পাঠিয়ে বলে দিন, বাড়ীর আশপাশ সাফসুৎরো রাখতে হবে। ওঁকে কিছুটা সময় দিন, যদি উনি নেহাৎই—

মাথা খারাপ নাকি মশায়? মেয়র আঁতকে উঠলেন, একজন অভিজাত পরিবারের ভদ্রমহিলাকে আপনি বলবেন, ওঁর বাড়ী থেকে বদগন্ধ ছড়াচ্ছে?

তাই পরের দিন, মধ্যরাতের কিছুটা পরে চারজন লোক মিস এমিলির লন পেরিয়ে চুপি চুপি চোরের মত ওঁর বাড়ীর চারপাশে ঘুরলো, ইটের গাঁথনির নীচের দিকে ও মাটির নীচের ভাঁড়ার ঘর থেকে কোন বাজে গন্ধ আসছে কিনা, শুঁকে পরখ করলো—ওদের একজন কাঁধে ঝোলানো চূনের থলি থেকে চূণ ছড়াচ্ছিল।

লন পেরিয়ে ওরা যখন ফিরে গেল, ওপরের একটা অন্ধকার জানলায় আলো জ্বললো। আলোর পেছনে ছায়া—মিস এমিলির ঋজু ও অনমনীয় শরীরের কাঠামো স্থির, নিশ্চল, পাথরে গড়া মূর্তির মত। যারা বাড়ীর আশপাশ সাফ করতে এসেছিল, তারা রাস্তার ধারে সারি বাধা লোকাষ্ট গাছের ছায়ায় লুকিয়ে গেল। হপ্তা খানেক পরে বাড়ীটা থেকে আর কোন দুর্গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসতো না।

অনেকটা এই ঘটনার সময় থেকেই জেফারসনের মানুষ এমিলির কথা ভেবে দুঃখ পেত। এমিলির দূর সম্পর্কের ঠাকুমা মিসেস ওয়াট শেষ বয়সে সম্পূর্ণ উম্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

শহরের লোকের ধারণা, গ্রিয়ারসনেরা নিজেদের বড়ো মহলের লোক ভাবে—বাস্তবে যতোটা, তার থেকেও বেশী। শহরের কোন যুবককেই মেয়ের উপযুক্ত পাত্র বলে মানতে রাজী হননি এমিলির বাবা। অনেক সময় মূকাভিনয়ের একটা নাটকীয় দৃশ্য আমরা কল্পনায় দেখেছি। পেছনের পটভূমিতে সাদা পোষাক পরা তন্বী এমিলি এবং

মঞ্চের সামনের দিকে এমিলির বাবার কুৎসিৎ ছায়া—তার হাতের মুঠোয় চাবুক। সামনের দরজাটা হাট করে খোলা, অপমানিত কোন প্রেমিক সেখান দিয়ে একটু আগেই বেরিয়ে গেছে।

সুতরাং তিরিশের কোঠায় পৌঁছেও তখন এমিলির বিয়ে হল না, আমরা ঠিক খুশী হতে পারিনি, তবে ওদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা সঠিক প্রমাণ হল। পরিবারে পাগলামীর পুরোনো ইতিহাস সত্বেও এমিলির বিয়ে হতে পারতো, যদি সুযোগগুলো সদ্ব্যবহার করা হত।

যখন ওর বাবা মারা গেলেন, জনশ্রুতি শোনা গেল, এই বাড়ীটা ছাড়া ভদ্রলোক এমিলির জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। একদিক থেকে লোকে খুশীই হল। এমিলি একা, এমিলি নিঃস্ব, এমিলি আমাদেরই একজন। নিজের কাছে এক পেনী কম বা বেশী থাকার নৈরাশ্য বা আনন্দ এখন এমিলিও বুঝতে পারবে। আমাদের সামাজিক কানুন মাফিক মহিলারা সহানুভূতি ও সাহায্যের উদ্দেশ্যে মিস এমিলির কাছে গেলেন। এমিলির পোষাক আগের মতই, মুখে বিষাদের চিহ্ন নেই। আমার বাবা বেঁচে আছেন, সে বোঝাতে চাইছিল। মৃতদেহটা তিনদিন পর্য্যন্ত কবর দেওয়া গেল না। পাদ্রী ও ডাক্তারা অনেক বুঝিয়েও যখন কাজ হল না, যখন জোর করে ডেডবডিটা সরানোর ব্যবস্থা হচ্ছে, হঠাৎ ভেঙে পড়লো এমিলি। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা মৃতদেহটা গোরস্থানে নিয়ে গেলাম।

এমিলি পাগল, আমরা তখনও বলিনি। আমরা জানতাম, এটাই স্বাভাবিক। একের পর এক যুবক তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছে, তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন এমিলির বাবা। এবং এখন যখন সে একা, রিক্ত, অসহায়, সে কাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবে? যিনি জীবনের সমস্ত সম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাঁকে, তাঁরই স্মৃতিকে।

॥ তিন ॥

অনেক, অনেকদিন অসুখে পড়েছিল এমিলি। যখন আবার তাকে দেখলাম, তার চুল ছোট্ট করে ছাঁটা, ছোট্ট মেয়ের মত—গীর্জার জানালায় রঙীন কাঁচের ওপরে আঁকা দেবদূতের মত শান্তি ও শোক দিয়ে গড়া তার মুখচ্ছবি।

শহরের ফুটপাথগুলো বাঁধানোর কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, এমিলির বাবার মৃত্যুর পর কাজ শুরু হল। কনষ্ট্রাকশন্ কোম্পানীর সঙ্গে এলো নিগ্রো শ্রমিক, খচ্চরের পাল, যন্ত্রপাতি এবং একজন ইয়াংকি ফোরম্যান—তার নাম হোমার ব্যারন।

তার দীর্ঘ শরীর, শ্যামল রং, সে কৌশলী, দক্ষ এবং উদ্যোগী পুরুষ। সে দরাজ গলায় কথা বলে, তার চোখের তারা কালো, কিন্তু চামড়ার রঙের মতো অত গাঢ় নয়। বাচ্চা ছেলেরা দল বেঁধে তার পেছনে পেছনে হাঁটে, সে নিগ্রো মজুরদের গালাগালি দেয়, গাঁইতির ওঠা-নামাব তালে তালে মজুরেরা গান গায়। পার্ক বা চৌরাস্তার কাছা-কাছি শহরের কোথাও যদি অনেক মানুষের হাসির শব্দ শোনা যেত, ভীড়ের কেন্দ্র জুড়ে হোমার ব্যারনকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যেত।

তারপর এক সময় দেখা গেল, প্রতি রবিবার বিকেলে হলুদ ঘোড়ায় টানা হলুদ চাকাওলা বগীগাড়ীতে হাওয়া খেতে বেরোয় হোমার ব্যারন ও এমিলি গ্রিয়ারসন। হোমারের সম্বন্ধে এমিলির উৎসাহ দেখে আমরা খুশী হয়েছিলাম। মহিলারা অবশ্য বলেছিলেন, গ্রিয়ারসন পরিবারের কোন মেয়ে উত্তরের ষ্টেট থেকে আসা একজন ইয়াংকি দিনমজুরের সঙ্গে গুরুতর কোন ব্যাপারে কখনোই নিজেকে জড়াবে না।

অবশ্য অন্যরা, বিশেষ করে বুড়োরা বলে ছিল, দুঃখ যতো তীব্র হোক,

অভিজাত পরিবারের কোন মহিলা আভিজাত্যের দায়িত্ব ভোলে না। বেচারা এমিলি, ওরা শুধু বলতো, ওর আত্মীয়দের উচিত ওকে বোঝানো। ক্লপ্ ক্লপ্ ক্লপ্—হলুদ ঘোড়ায় টানা হলুদ চাকাওলা বগীগাড়ীটা রাস্তা দিয়ে চলে যেত। রবিবার বিকেলের সূর্য যেন বাড়ির ভেতরে ঢুকতে না পারে, তাই আশেপাশের বাড়িগুলোর জানালা বন্ধ—বন্ধ খড়খড়ির আড়ালে রেশম ও স্যাটিনের শব্দ হয়: বেচারা এমিলি—

কিন্তু সে মাথা উঁচু করে চলা ফেরা করতো, আমরা হয়তো তখনই তার নৈতিক পতনের কথা ভাবছি। যেন গ্রিয়ারসন পরিবারের শেষ প্রতিনিধি আমাদের কাছে তার আভিজাত্যের স্বীকৃতি চাইছে, যেন মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তার এই নতুন যোগাযোগের স্পর্শ আর একবার প্রমাণ করলো, কোন কিছুতে বিচলিত বা প্রভাবিত না হওয়াই আভিজাত্যের আসল চিহ্ন।

যেমন ধরা যাক, এমিলি যখন ইঁদুর-মারা সেঁকো বিষ কিনলো। অবশ্য সে এক বছর পরের কথা। এক বছর ধরে সবাই বলছে, 'বেচারা এমিলি—।'

অ্যালবামা থেকে ওর দুজন মামাতো দিদি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তখন।

'আমি বিষ কিনতে চাই', ও ওষুধের দোকানের সেলসম্যানকে বলেছিল। তখন এমিলির বয়স তিরিশের কিছু বেশী, আগের চেয়ে আরো রোগা, মাথায় রগ ও দুই চোখের কোটরের আশে পাশে মুখের চামড়া টান-টান, চোখের দৃষ্টি শীতল ও উদ্ধত—লাইট-হাউসের আলো জেলে রাতের সমুদ্রে নাবিককে পথ দেখায় যে মানুষ তার মুখের মত।

আমি বিষ কিনতে চাই, এমিলি বলছিল। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—কিন্তু মিস এমিলি, কোন ধরনের বিষ? ইঁদুর মারার জন্যে—'

তোমার দোকানের যে বিষ সব চেয়ে ভালো, তাই দাও। কোন ধরণের, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

দোকানদার অনেকগুলো বিষের নাম করে।
'ওগুলো হাতী মারবার পক্ষেও যথেষ্ট। কিন্তু আপনি যা চাইছেন—'
আর্সেনিক। বিষটা জোরালো নয়?
'আর্সেনিক? হ্যাঁ, ম্যাডাম। কিন্তু আপনি যা চাইছেন—'
আমি আর্সেনিক চাইছি।'
দোকানদার এমিলির দিকে তাকায়। সে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় এমিলি, শিরদাঁড়া সরল ও ঋজু, মুখের চামড়া হাওয়ায় ওড়া নিশানের মত টান টান।
'কিন্তু ম্যাডাম, আইন অনুযায়ী আপনাকে বলতে হবে, কি উদ্দেশ্যে আপনি বিষ চাইছেন?'
মাথাটা পিছনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকালো এমিলি, চোখে চোখ পড়লো, এক সময় চোখ নামিয়ে ভেতরে গেল, দোকানী, আর্সেনিকটা প্যাকেটে মুড়ে দিল। নিগ্রো ডেলিভারী-বয় এমিলির হাতে পৌঁছে দিয়েছিল। দোকানী আর আসেনি।
বাড়ীতে ফিরে প্যাকেটটা খুললো এমিলি। বাক্সের ওপরে মড়ার মাথা ও হাড় আঁকা, নীচে লেখা:
'ইঁদুরের জন্যে।'

॥ চার ॥

পরের দিন আমরা সবাই বলেছিলাম, এমিলি আত্মহত্যা করবে। এবং আমরা ভেবেছিলাম, সেই ভালো। প্রথম যখন ওকে হোমার ব্যারনের পাশে দেখেছি, আমরা বলেছি, এমিলি ব্যারনকে বিয়ে করবে। কিন্তু এল্কস ক্লাবের ছোকরাদের সঙ্গে মদ খেতে খেতে হোমার বলছে, ওসব বিয়ে-টিয়ে তার ধাতে পোষাবে না। তখনও আমরা ভেবেছি, এমিলি ওকে বিয়ে করাতে রাজী করাতে পারবে। তারপর প্রতি রবিবার বন্ধ খড়খড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা বলেছি, বেচারা এমিলি। রাস্তা দিয়ে ছুটে গেছে বগীগাড়ী। মিস এমিলির

মাথা উঁচু, হোমার ব্যারনের মাথায় হ্যাট ট্যারচা ভাবে লাগানো, দাঁতের ফাঁকে সিগার, হাতের হলুদ দস্তানার মুঠোয় ঘোড়ার লাগাম ও চাবুক।

তারপর মহিলারা বললেন, আমাদের শহরের মান মর্য্যাদা নাকি ধুলোয় মিশে যাচ্ছে, তাছাড়া ছেলে ছোকরাদের পক্ষে এ ধরনের ব্যাপার খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত। পুরুষেরা কেউ এমিলির ব্যাপারে মাথা গলাতে রাজী নয়, কিন্তু মহিলাদের চাপে পড়ে পাত্রী এমিলির সঙ্গে দেখা করলেন।

সে সাক্ষাতে কি ঘটেছিল, পাত্রী কখন বলেননি কিন্তু আর কখনও তিনি এমিলির সঙ্গে দেখা করেন নি। পরের রবিবার আবার রাস্তা দিয়ে বগীগাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াতে গেল এমিলি ও ব্যারন।

অগত্যা পাত্রীর স্ত্রী অ্যালবামায় মিস এমিলির আত্মীয়দের চিঠি লিখলেন। যাদের সঙ্গে ওর রক্তের যোগ আছে, তারাই এখন ওর কাছে এসেছে। এবার কি হয় দেখাই যাক—আমরা ভাবছিলাম। প্রথমে কিছুই ঘটলো না। তারপর আমরা নিশ্চিত হয়ে উঠলাম যে এমিলি ও হোমারের বিয়ে হতে চলেছে। গয়নার দোকানে পুরুষদের টয়লেট সেটের অর্ডার দিয়েছে এমিলি—রূপোর তৈরী, প্রত্যেকটা জিনিষের ওপর খোদাই করা থাকবে হোমার ব্যারন নামের দুই আদ্যাক্ষর—এইচ, বি।

দুদিন পরে আমরা শুনলাম, নাইট শার্ট সমেত এক সেট পুরুষের পোশাক কিনেছে এমিলি। বিয়ের সব তাহলে ঠিকঠাক, আমরা খুশী হলাম।

রাস্তা বাঁধানোর কাজ ইতিমধ্যে মিটে গেছে। সুতরাং হোমার ব্যারন যখন হঠাৎ একদিন শহর থেকে উধাও হয়ে গেল, আমরা অবাক হইনি।

আমরা জানতাম, ব্যারন বিয়ের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত কিংবা এমিলির মামাতো বোনেদের অ্যালবামায় ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা করছে।

এক হপ্তা পরেই ওরা অ্যালবামায় ফিরে গেল। এবং মাত্র তিন দিন পরেই শহরে ফিরে এল হোমার ব্যারন। একজন প্রতিবেশী দেখেছিল, সন্ধ্যার সময় নিগ্রো চাকরটা পেছনের দরজা খুলে ওকে ভেতরে ঢুকতে দিল।

…অথচ তারপর আর কখনও আমরা হোমার ব্যারনকে দেখিনি। কিছুদিন মিস এমিলিকে দেখা যায়নি। বাজারের বাস্কেট নিয়ে বাইরে যায়, ভেতরে আসে নিগ্রো চাকর। কিন্তু সামনেব বন্ধই থাকে। দরজায় কখনো কখনো ওকে জানালায় দেখা যায়। যেমন সেদিন রাতে, পৌর কর্মচারীরা যখন দুর্গন্ধ দূর করার জন্যে বাড়ীর আশে পাশে চুন ছড়াচ্ছে। কিন্তু পরের দুমাসে রাস্তায় বেরোয়নি এমিলি। আমরা জানতাম, এইটাই স্বাভাবিক। এমিলির স্বভাবে আছে ওর বাবার জ্বলন্ত ও তীব্র সেই গুণ বা দোষের উত্তরাধিকার, যা এমিলির জীবনের সব স্বপ্নকে পুড়িয়েছে, আগুনের ক্রুদ্ধ শিখার মত যা আজও নেভেনি।

আবার যখন এমিলিকে দেখলাম, সে মোটা হয়েছে, তার চুলে পাক ধরেছে। পরবর্তী কয়েক বছরে চুলগুলো আরও পেকেছে, শেষ পর্যন্ত চুলের রং দাঁড়ালো নুন মেশান গোলমরিচের গুঁড়োর রং, লোহার চুরের রং—তারপর চুলগুলো আর রঙ বদলায়নি। চুয়াত্তর বছরে যখন সে মারা গেল, তখন তার চুল চূর্ণ লোহার মত ধূসর, পরিশ্রমী শক্তিশালী কোন প্রৌঢ় পুরুষের মত।

তখন থেকেই সামনের দরজাটা বন্ধ থাকতো। মাঝখানে ছ-সাত বছর নীচের তলার একটা ঘরে ষ্টুডিও সাজিয়ে চীনে-মাটির ওপরে ছবি আঁকার ক্লাস নিতো এমিলি। তখন তার বয়স চল্লিশ। কর্ণেল সারটোরিস ও তার বন্ধুবান্ধবের মেয়ে ও নাতনীদের সেখানে নিয়মিত পাঠানো হতো। যে অনুভূতির প্রেরণায় তাদের পঁচিশ সেণ্টের মুদ্রা হাতে রবিবার গীর্জায় পাঠানো হয়, সেই একই কর্তব্যের খাতিরে। ইতিমধ্যে এমিলির ট্যাক্স মকুব করা হয়েছিল।

তারপর এল নতুন যুগ, নতুন মানুষ। তারাই শহরের মেরুদণ্ড ও প্রাণ। চীনেমাটির ওপর ছবি আঁকতে শিখেছিল যে মেয়েরা, তারা মা হল। কিন্তু আর তাদের মেয়েদের রঙের বাক্স, তুলি ও মেয়েদের ম্যাগাজিন থেকে কাটা ছবি নিয়ে এমিলির কাছে পাঠালো না। শেষ ছাত্রী বিদায় নেবার পর সামনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের মত।

দিন, মাস, বছর গেছে। নিগ্রো চাকরের চুল পেকেছে, লোকটা কুঁজো হয়ে গেছে, বাজারের বাস্কেট হাতে ও বাইরে যায়, ভেতরে আসে। মাঝে নীচের তলার একটা জানালায় এমিলিকে দেখা যায়, ওপর তলাটা ও নিশ্চয়ই বন্ধ করে রেখেছে।

যেন দেয়ালের কুলুঙ্গীতে রাখা পাথরে খোদাই করা এক মূর্তি—সে আমাদের দিকে চেয়ে আছে কিনা, কে বলতে পারে? এভাবেই সে যুগের মত যুগ কাটিয়ে দেয়—আমাদের প্রিয় রমণী, যার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই, কোন কিছুই যাকে বিচলিত করে না, শান্ত নিথর মনোবিকারের প্রতিচ্ছবি।

এবং এই ভাবেই একদিন সে মরে গেল। ধুলো এবং ছায়ায় ঢাকা বাড়ীর ভেতরে যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল, নিগ্রো চাকরটা ছাড়া তাকে দেখা করার আর কেউ ছিল না। এমিলি যে অসুস্থ, তাও আমরা জানতাম না। নিগ্রো চাকর কারো সঙ্গে কথা বলে না, হয়তো এমিলির সঙ্গে ও নয়। অব্যবহারে লোহায় যেমন মরচে ধরে, দীর্ঘ দিনের নৈঃশব্দ্যে তার কণ্ঠস্বরেও তেমনি জং ধরেছে। নীচের তলার একটা ঘরে মারা গেছে এমিলি। ওয়ালনাটের ভারী খাট পর্দা ঘেরা, পাকা চুলে ঢাকা মাথাটা যে বালিসের ওপরে শুয়ে আছে, আলোর অভাবে সেখানে হলুদ রং ধরেছে।

॥ পাঁচ ॥

যে মহিলারা প্রথমে এসেছিলেন, নিগ্রো চাকরটা তাদের দরজা খুলে দিল। ওঁরা চাপা গলায় কথা বলছিলেন, ওদের দ্রুত ও উৎসুক দৃষ্টি চার পাশে ঘুরছিল। নিগ্রো চাকরটা বাড়ীর ভেতর দিকে গেল। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে সে বাইরে পা বাড়ালো। এই শহরে আর কেউ তাকে কখনো দেখেনি।

অ্যালবামা থেকে এমিলির দুই মামাতো বোন এসেছিল। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন হল। বাজার থেকে কেনা ফুলের স্তবকের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল এমিলির শরীর। এমিলির বাবার ক্রেয়ণ পেন্সিলে আঁকা মুখ গম্ভীর ও চিন্তান্বিত। মহিলাদের কলরব অদ্ভুত ভীষণ। জন কয়েক বুড়ো মানুষ—তারা আজ কনফেডারেট সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম ব্রাশ করে পরেছে—লন ও বারান্দায় ভীড় করে ওরা মিস এমিলির গল্প করছিল। ওদের গল্প শুনে মনে হবে যেন মিস এমিলি ওদের সমবয়সী। হয়তো ওরা সত্যিই বিশ্বাস করে, ওরা যৌবনে এমিলির সঙ্গে পার্টিতে নেচেছে, এমিলিকে ভালোবেসেছে। ওদের স্মৃতিতে সময় গণিতের নিয়ম মেনে চলে না, ওদের স্নায়ুতে অতীত কোন ক্ষীয়মান পথ নয়, ঘাসে ঢাকা বিশাল এক প্রান্তর—শীতের হিমতুষার যাকে সম্পূর্ণ ছুঁতে পারে না। একেবারে সাম্প্রতিক একটা যুগ বোতলের সরু মুখের মত ওদের অতীতের মাঝখানে ব্যবধান রচনা করে।

আমরা জানতাম, ওপরের তলায় একটা ঘর আছে, যেখানে গত চল্লিশ বছর কেউ কোন দিন যায়নি। আমরা জানতাম, প্রয়োজন হলে দরজা ভেঙে ওখানে ঢুকতে হবে। এমিলির মৃতদেহ যতক্ষণ না যথাযথ সম্ভ্রমে কবরস্থ হল, ততোক্ষণ আমরা অপেক্ষা করেছিলাম।

দরজা ভাঙার প্রচণ্ড আলোড়নে ঘরটা ধুলোয় ভরে গেল। একটা ক্ষীণ, তীক্ষ্ণগন্ধ স্নায়ুতে ভেসে এল। যেন আমরা কোন কবরের ভেতরে ঢুকেছি। এই ঘর নববধূর বাসরশয্যার জন্যে সাজানো। পর্দায় ঝরা

গোলাপের ম্লান রং। আলোয় গোলাপী শেড।

কবরের তীক্ষ্ণ গন্ধ সব কিছু থেকে ভেসে আসছে—ড্রেসিং টেবিলে রাখা স্ফটিকের পানপাত্র থেকে, জং-ধরা রূপোর তৈরী পুরুষের টয়লেট সেট থেকে—আজ সেই রূপোয় এত কালো দাগ, মনোগ্রামে নামের আদ্যক্ষর দুটো চোখেই পড়ে না।

জিনিষ পত্রের ভীড়ে একটা কলার এবং টাই যেন কেউ এখুনিও ছুটো খুলেছে, তুলতে যেতেই ধুলোর ওপরে আধো চাঁদের আকারের দাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চেয়ারের পেছনে সযত্নে ভাঁজ করা স্যুট, নীচে এক জোড়া জুতোমোজা নীরব এবং পরিত্যক্ত।

···বিছানার ওপরে পুরুষ শুয়েছিল!

অনেকক্ষণ ধরে আমরা দেখছি, শুধু দেখছি। মাংসহীন মুখের অদ্ভুত গম্ভীর হাসি। যে ভাবে সে শুয়ে আছে, বোঝা যায়, একদিন সে কাউকে আলিঙ্গনে বেঁধে ছিল। কিন্তু এখন, যে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন ঘুম প্রেমকে অতিক্রম করে মিলনমুহূর্তের মুখভঙ্গিমাও মুছে দেয়, সেই ঘুমের আড়ালে প্রেমিক তার দয়িতার কাছে প্রবঞ্চিত হয়েছে।

তার শরীরের যেটুকু এখনও অবশিষ্ট, নাইট-শার্টের যেটুকু তাকে এখনও চেপে আছে, তারই আড়ালে গলা-পচা শব এখন আর বিছানা থেকে আলাদা করা যাবে না। তার শবদেহের ওপরে এবং যে বালিশে সে মাথা রেখেছে, তার ওপরেও ধুলো জমেছে। ধুলো, যা কখনও ধৈর্য্য হারায় না, যে চিরদিন জেগে থাকে।

তারপর আমরা দেখতে পেলাম, বিছানার ওপরে দ্বিতীয় একটা বালিশে, আর একটা মানুষের মাথার ছাপ। যেন কেউ শবদেহের পাশে বালিশে মাথা রেখে শুয়েছিল। আমাদের একজন বালিশ থেকে কি একটা তুললো।

প্রায়-অদৃশ্য ধুলোর শুকনো কটুগন্ধ বুকে নিয়ে আমরা দেখলাম, মেয়েলি মাথার একগাছি পাকা চুল, চূর্ণ লোহার মত ধূসর তার রং।

* * *

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

১৯৫৪য় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন. অ্যামেরিকান কথাসাহিত্যিক আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে। স্বল্পকথনভিত্তিক পৌরুষদীপ্ত তাঁর রচনার আঙ্গিক। মানুষ যে কোন আদর্শের জন্য যুদ্ধ করে, সেই আদর্শ শেষ পর্যন্ত অনিবার্য্যভাবে পরাজিত হয়, কিন্তু মানুষ অপরাজেয়—হেমিংওয়ে বিশ্বাস করতেন। সেই পরাজিত আদর্শ 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' উপন্যাসে প্রেম, 'ফর হুম দ্য বেল টলস্' উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রতীতি এবং 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী' উপন্যাসে অতিকায় মাছের প্রতীকে রূপ নেয়। তাঁর মৃত্যু অ্যাক্সিডেন্ট না আত্মহত্যা—সে বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে।



মৃগয়া

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

এখন দুপুরের খাবার সময়। সবুজ রঙের দু-পরদা কাপড়ের তাঁবুর ভেতর বসে ওরা ভান করছে, যেন কিছুই হয়নি।

'লাইমজ্যুস না লেমন-স্কোয়াশ?' ম্যাকমবার জানতে চায়।

'গিমলেট' রবার্ট উইলসন বলে।

(গিমলেট জিন্ ও লাইমজ্যুস মেশানো ককটেল)।

'আমাকেও গিমলেটই দাও। আমার চড়া কিছু দরকার' ম্যাকমবারের বউ বলে।

'ঠিক তাই। ওকে তিনটে গিমলেট মেশাতে বলো।'

নিগ্রো বয় এরই মধ্যে ককটেল মেশাতে শুরু করেছে। বোতলগুলো ঠাণ্ডা রাখার জন্যে ক্যানভাসের ব্যাগে রাখা হয়েছে। তাঁবুর ওপরে গাছের ছায়া। গাছের পাতার ভেতর দিয়ে গরম হাওয়া আসছে। সেই হাওয়ায় ক্যানভাসের ব্যাগগুলো ভিজে উঠেছে।

'নিগ্রোদের কত দিতে হবে'? ম্যাকমবার জানতে চায়।

'এক কুইড দিলেই যথেষ্ট'। বেশী দিলে ওদের খাঁকতি বেড়ে যাবে, উইলসন বোঝায়।

(কুইড ব্রিটিশ স্ল্যাং, এক কুইড মানে এক পাউণ্ড)।

'হেডম্যান ওদের মধ্যে টাকাটা বিলিয়ে দেবে তো?'

নিশ্চয়ই।

আধ ঘণ্টা আগে ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবার নিগ্রো বাবুরচি, বয়, জন্তুর চামড়া ছড়ানো যাদের কাজ, আর মাল বওয়া যাদের পেশা, তাদের কাঁধে চড়ে বিজয়গর্বে বন থেকে তাঁবুতে ফিরেছে। বন্দুক বয়ে নিয়ে যাওয়া যাদের কাজ, তারা অবশ্যই এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়নি। তাঁবুর দরজায় ওকে নামিয়ে দিয়ে নিগ্রো বয়রা ওকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ওদের সঙ্গে করমর্দন সেরে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে চুপচাপ বিছানায় বসে থেকেছে ম্যাকমবার। যতোক্ষণ না তার বউ তাঁবুর ভেতরে ঢুকেছে।

তাঁবুতে ঢুকে ওর বউ ওর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। তাড়াতাড়ি তাঁবু ছেড়ে বাইরে গেছে ম্যাকমবার, ওয়াস-বেসিনের জলে হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেণ্টে ঢুকে গাছের ছায়ায় মৃদু মন্দ হাওয়ার মধ্যে আরাম দায়ক ক্যানভাস চেয়ারে বসেছে।

'তুমি তোমার সিংহ পেয়েছো', রবার্ট উইলসন সান্ত্বনা দেয়, সিংহটা দেখতে বেশ —

মিসেস ম্যাকমবার উইলসনের দিকে চকিত চোখে তাকায়। মহিলা খুবই সুন্দরী, অনেক বছর ধরে নিজের সৌন্দর্য বাঁচিয়ে রেখেছে। পাঁচ বছর আগে ওর সৌন্দর্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, যখন কসমেটিকের বিজ্ঞাপনে নিজের নাম ও ছবি ব্যবহার করতে দিয়ে ম্যাকমবারের বউ পাঁচ হাজার ডলার পায়। যদিও ওই বিশেষ ব্র্যাণ্ডের প্রসাধনী জীবনে কখনও ব্যবহার করেনি মিসেস মার্গারেট ম্যাকমবার।

এগারো বছর আগে ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবারকে বিয়ে করেছিল মার্গারেট। সিংহটা খুব সুন্দর, তাই না? ফ্র্যান্সিস বলে। ওর বউ ওর দিকে তাকায়। দুটো পুরুষের দিকেই এমন ভাবে তাকাচ্ছে মেয়েমানুষ, যেন দুজনের কাউকে সে আগে কখনও দেখেনি।

অবশ্য ওদের একজন, শ্বেতকায় শিকারী উইলসনকে সে আগে ঠিক

মত চেনেনি। মাঝারি উচ্চতা, চুলে বালির রং, খোঁচা গোঁফ, টকটকে লাল মুখ, বরফের মত ঠাণ্ডা নীল চোখ। হাসলে ঠোঁটের কোণ দুটোয় খুশীর ভাঁজ পড়ে। এখন উইলসন মার্গারেটের চোখ ওর মুখ ছুঁয়ে সরে যায়। ঢিলেঢালা পোষাকের আড়ালে চওড়া কাঁধ, টিউনিকের বুকের বাঁদিকে যেখানে পকেট থাকার কথা, সেখানে চারটে বড় কার্তুজ লুপে আঁটা। মার্গারেটের চোখ দেখছে ওর পেশী বহুল বাদামী দুটো হাত, পুরোণো স্ল্যাকস, নোংরা বুট, দেখতে দেখতে লাল মুখের কাছে ফিরে আসে। আগুনের আঁচের মত টকটকে লালের ওপরে টেট্‌সন হ্যাটের সাদা দাগ। টুপিটা এখন তাঁবুর পোলে আঁটা হুঁকে ঝুলছে।

'তোমার সিংহের উদ্দেশ্যে', মদের গ্লাস তুলে শুভেচ্ছা জানায় শিকারী উইলসন। সে মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসছে। মার্গারেট হাসে না, কৌতূহলী চোখে স্বামীর দিকে তাকায়।

ফ্রান্সিস খুব লম্বা। যদি লম্বা হাড়গুলো তোমার চোখে বেঢপ না লাগে, ওকে পুরুষ বলা চলে। শ্যামল রং। চুল গুলো নাবিকের মত ছোট করে ছাঁটা। ঠোঁট দুটো পাতলা। লোকে বলে, ও দেখতে সুন্দর। উইলসনের মতোই শিকারের সফরী পোষাক পরেছে ফ্রান্সিস। তফাতের মধ্যে, পোষাকটা নতুন।

ওর বয়স পঁয়ত্রিশ, নিয়মিত ব্যায়াম করে, টেনিস খেলে, বড়ো মাছ ধরায় অনেকগুলো রেকর্ড করেছে এবং আজ—

এক দঙ্গল লোকের সামনে ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবার প্রমাণ করেছে, সে ভীতু, কাপুরুষ!

'সিংহের উদ্দেশে। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো বলে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা আমার নেই'—

তার স্ত্রী মার্গারেট চোখ সরিয়ে নেয়। 'সিংহের কথা আর বোলো না, বোলো না'—

উইলসনের হাসি মুছে গেছে। এখন মার্গারেট তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। 'দিনটা কি রকম অদ্ভুত কেটে গেল? তুমি না বলেছিলে

দুপুরের রোদে তাঁবুর ক্যানভাসের নীচে বসলেও টুপি পরে থাকা উচিত? টুপি খুলে রেখেছো কেন?'

'পরলেই হয়।'

'মিস্টার উইলসন, তোমার মুখটা বড্ড লাল।'

'বেশী মদ খাইতো।'

'ফ্র্যান্সিসও খুব মদ খায় কিন্তু ওর মুখ কখনও লাল হয় না।'

'আজ নিশ্চয়ই লজ্জায় লাল হয়ে গেছে,' ম্যাকমবার রসিকতা করার চেষ্টা করে, 'না, লজ্জা পেয়েছি আমি, লাল হয়েছে আমার মুখ।'—মার্গারেট বলে—'কিন্তু মিষ্টার উইলসনের মুখ সব সময়ই লাল'।

'হয়তো আমি ব্রিটিশ বলেই। আমার মুখের রং নিয়ে রিসার্চ বন্ধ করলে কেমন হয়?'

'এই তো শুরু করলাম।'

'এবার বন্ধ করো।'

'কথা বলা কি যে শক্ত ব্যাপার।'

'মার্গারেট, বোকার মতো আজে বাজে কথা বোলো না ওর স্বামী বলে ওঠে। উইলসন বলে, 'সিংহটা সত্যিই সুন্দর।'

মার্গারেট ওর দিকে তাকায়। ওরা দেখে, মেয়েমানুষের চোখে জল, এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। অনেক্ষণ ধরে এই ভয়ই করছে উইলসন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মার্গারেটের স্বামী ম্যাকমবার আর স্ত্রীর কান্নাকে ভয় পায় না।

'এসব কিছু না ঘটলেই ভালো ছিল,' তাঁবুর ভেতরে চলে যাচ্ছে মার্গারেট।

ওর কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, তবে দুটো পুরুষই দেখেছে, সানপ্রুফ গোলাপী-রং শার্টের আড়ালে মেয়েমানুষের নরম কাঁধ দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'মেয়েমানুষ!'—লম্বা লোকটাকে উইলসন বোঝায়, 'মেয়েমানুষের মেজাজ খারাপ হলে কিছু যায় আসে? ওদের স্নায়ুর ওপরে একটু

চাপ পড়লে, একটু এদিক সেদিক হলে—'

'না, ম্যাকমবার বলে, 'এখন থেকে সারা জীবন ও আমাকে কথা শোনাবে'—

ননসেন্স। মদ খাও, ওসব ভুলে যাও'—

চেষ্টা করা যাক। অবশ্য তুমি আমার জন্যে যা করেছো আমি কোনদিন ভুলবো না।'

'কিছু না। অল ননসেন্স—'

··তাই পুরুষেরা ছায়ায় বসে থাকে।

ডালপালা ছড়ানো বাবলা গাছগুলো মাথার ওপরে ছায়া বিছিয়েছে। পেছনের টিপিতে এবড়ো খেবড়ো ঝামাপাথর ছড়ানো। সামনে ঘাসঢাকা জমির শেষে ঝামাপাথরের বুকে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট নদী। এইমাত্র ঠাণ্ডা-করা লাইমজুস মেশানো মদ খেতে খেতে দু'জন পুরুষ কেউ কারো চোখের দিকে তাকায় না। নিগ্রো বয়রা লাঞ্চের টেবিল সাজাচ্ছে। উইলসন জানে, ওরা শিকারের কেলেংকারীর কথা সব জেনে গেছে। টেবিলে ডিশ রাখতে রাখতে একটা বয় কৌতূহলী চোখে ম্যাকমবারকে দেখছিলো। সোয়াহিলি ভাষায় ঝাঁঝকারী দিয়ে ওঠে উইলসন। ন্যাকা মুখে পিছিয়ে যায় নিগ্রো বয়।

'ওকে কি বললে?' ম্যাকমবার জানতে চায়।

'কিছু না। বললাম, মন দিয়ে কাজ করো। নইলে পনেরো ঘা খাবে।'

'কি খাবে? চাবুক?' 'হ্যাঁ, ওদের চাবুক মারা অবশ্য বে আইনী। ওরা দোষ করলে জরিমানা আদায় করতে পারো।'

'তবু তুমি ওদের চাবুক মারো?'

'হ্যাঁ। ইচ্ছে করলে ওরা এই নিয়ে বাজেলা বাঁধাতে পারে। কিন্তু সচরাচর ওরা মেনে নেয়, জরিমানার বদলে ওরা মার খাওয়াই পছন্দ করে।'

'কি আশ্চর্য্য?'

'আশ্চর্য্য হবার কি আছে ? তুমি হলে কি চাইতে ? চাবুকের মার, না মাইনে কাটা যাওয়া ?'
কথাটা বলেই কেমন অস্বস্তি লাগে উইলসনের। 'দ্যাখো, আমরা প্রত্যেকেই তো কোন না কোনদিন মার খাই—
'হ্যাঁ, আমরা মার খাই, ম্যাকমবার ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না, 'সিংহ শিকারে যেয়ে যা কিছু হয়েছে, তার জন্যে আমি দুঃখিত।'
'কথাটা চাউর হবে না তো ? আর কেউ জানতে পারলে—
'তার মানে, আমি মাথাইগা ক্লাবে এই নিয়ে গল্প করবো না কি ?'
ঠাণ্ডা মেজাজে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে আছে উইলসন। তার মানে ম্যাকম্বার শুধু কাপুরুষ নয়, ও নোংরা স্বভাবের লোক। অথচ আজকের আগে অবধি ওকে পছন্দ করতো উইলসন। সত্যি, ইয়াংকিদের আসল চেহারা চেনা খুব শক্ত ব্যাপার—
'না, আমি পেশাদার শিকারী। আমরা কখনও আমাদের কোন ক্লায়েন্টের ব্যাপারে আজে বাজে গল্প করি না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। তবে আমাকে কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করা এখানকার আদবকায়দা অনুযায়ী অভদ্রতা—
উইলসসন মনে মনে ভাবছিল, এদের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ ভেঙে ফেলাই ভালো। সে একা একা লাঞ্চ খাবে, খেতে খেতে বই পড়বে। সফরির বাকি দিনগুলো সে ওদের সঙ্গে কথা বলবে বাইরের লোকের মত, আদব কায়দা মাফিক।
(সফরি—একটি আরব শব্দ থেকে অপভ্রংশ—আসল মানে সফর বা ভ্রমণ কিন্তু এখন শিকার যাত্রা অর্থেই ব্যবহার করা হয়)।
এদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি আবেগ-উত্তেজনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার চাইতে উইলসনের একা থাকাই পছন্দ। ছলছুতোয় সে ম্যাকমবারকে অপমান করবে, তারপর আলাদা আলাদা থাকবে। তখন সে লাঞ্চ খেতে খেতে বই পড়তে পারবে, আবার ওদের পয়সায় হুইস্কিও গিলবে।

শিকার-যাত্রায় বেরিয়ে যখন শিকারীর সঙ্গে ক্লায়েন্টের ঝগড়া হয়, তখন এমনই হয়। পেশাদার শ্বেতকায় শিকারীকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কেমন চলছে?' শিকারী বলবে, 'হ্যাঁ, আমি এখনও ক্লায়েন্টের পয়সায় হুইস্কি খাই।' তার মানে, শিকার যাত্রায় পরিবেশ আবহাওয়া সব নষ্ট হয়ে গেছে।

'আমি দুঃখিত,' ম্যাকম্বার ওর দিকে তাকিয়ে আছে। অ্যামেরিকানরা যতোক্ষণ না মাঝ বয়স পেরোয়, ওদের মুখ দেখলে মনে হয়, ওরা যেন বয়ঃসন্ধির সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে। উইলসন ফ্রান্সিসের ছোট্ট করে ছাঁটা চুল, সুন্দর চোখের ঈষৎ কাঁপন, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, সুঠাম চিবুক দেখে। ফ্র্যান্সিস বলছে—

'আমি দুঃখিত। কথাটা বলা অভদ্রতা হবে আমি আগে বুঝিনি। অনেক কিছুই আমি জানিনা, বুঝিনা।'

বেচারা কিইবা করতে পারে, উইলসন ভাবছিল। সে ম্যাকম্বারের সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যেতে চায়। অথচ ম্যাকম্বার বেচারা কিনা ক্ষমা চাইছে। আসলে উইলসনই তো ওকে অপমান করতে চেয়েছিল। তবু আর একবার চেষ্টা করে উইলসন।

আমি লোকের কাছে গল্প করবো ভেবে ঘাবড়িও না। আফ্রিকায় কোন মহিলা গুলি করলে সিংহ না মরেই পারে না এবং কোন সাদা মানুষ সিংহের ভয়ে কখনো পালায় না।'

'আমি তো ভয়পুক খরগোসের মত পালিয়েছিলাম'—ম্যাকমবার বলে। যে মানুষ এইভাবে কথা বলে, তাকে কি করে আঘাত দেওয়া যায়? উইলসন তার সমতল, নীল, মেসিনগান শ্যুটারের চোখে তাকিয়ে আছে।

ম্যাকম্বার হাসছে। হাসিটা মিষ্টি। তবে যদি কেউ ওকে আঘাত দেয়, ওর চোখ দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

'হয়তো আমি বুনো মোষ শিকার করতে পারবো, এরপরেই তো—'

'কাল সকালেই যাওয়া যেতে পারে', উইলসন বলে। আমি ম্যাকমবার

কে ভুল বুঝেছি, উইলসন ভাবছিল। সত্যি, অ্যামেরিকানদের বোঝা ভারী শক্ত। এখন উইলসন পুরোপুরি ম্যাকমবারের স্বপক্ষে। সকালের ঘটনাগুলোর কথা ভুলতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তাই কি কখনও ভোলা যায়। এতো খারাপ সকাল…

এই তো মেমসাহেব আসছেন, তাঁবু থেকে বেরিয়ে ওদের দিকেই আসছে ম্যাকমবারের বউ।
অ্যামেরিকান মেয়ে, উইলসন ভাবছে।
পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে নিষ্ঠুর, সবচেয়ে হিংস্র এবং সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েমানুষ। ওদের মেয়েমানুষেরা যতো শক্ত হয়ে উঠেছে, পুরুষেরা ততোই নরম, নয়তো স্নায়ুবিক চাপে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। নাকি এইসব মেয়ে ইচ্ছে করেই এমন পুরুষ বেছে নেয়, যাদের ওরা পুতুল নাচ নাচাতে পারবে? কিন্তু যে বয়সে ওদের বিয়ে হয়, সে বয়সেই ওরা কি এত ঝানু হয়ে যায়?
উইলসন ভাবছে, তার ভাগ্য ভালো, এই সুন্দরী মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে অ্যামেরিকান মহিলাদের ব্যাপারে যা কিছু জানার সে জেনে ফেলেছে।

'লালমুখ মিষ্টার উইলসন কেমন আছেন? হ্যালো ফ্র্যান্সিস, মাই পার্ল, তোমার এখন আগের থেকে ভালো লাগছে তো? আমি আগের কথা সব ভুলে যেতে চাই। ফ্র্যান্সিস সিংহ মারতে পারে না তো কি হয়েছে?'
সিংহ মারা তো ওর ব্যবসা নয়। ওটা মিঃ উইলসনের ব্যবসা। মিঃ উইলসন চমৎকার খুন করেন। আপনি যে কোন কাউকে খুন করতে পারেন, তাই না?'
'আমরা কাল সকালে বাফ্ শিকারে যাবো।' (বাফ্ অর্থে বুনো মোষ)।

'আমিও যাবো।'

'না, আপনি যাবেন না।'

'নিশ্চয়ই যাবো! তাই না, ফ্র্যান্সিস?'

'ক্যাম্পে থাকলেই ভালো করতে—'

'কিছুতেই না। তাহলে আজকার মত দারুন অভিজ্ঞতা, হবে কি, করে।'

···যখন ও কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে গিয়েছিল, ওকে ভালো লাগছিল। ও যেন সব বোঝে, স্বামীর যন্ত্রণা, নিজের কষ্ট, উইলসন কি ভাবছে, সব বোঝে। অথচ কুড়ি মিনিট পরে মুখের মেকআপের মত অ্যামেরিকান রমণীর নিষ্ঠুরতার নির্মোক পরে ও ফিরে এলো।

ইয়াংকি মেয়েগুলো সাক্ষাৎ শয়তান!

'কাল তোমাকে খুশী করার জন্যে আমরা আর একটা মজাদার খেল দেখবো।'

'না, আপনাকে যেতে হবে না।

'ভুল করেছেন। আমি আপনার শিকার করার দৃশ্যটা আবার দেখতে চাই। আজ সকালে সুন্দর লাগছিল। অবশ্য যদি গুলি করে কারো মাথা উড়িয়ে দেওয়াকে সুন্দর বলা চলে—'

'লাঞ্চ খেতে শুরু করুন। আপনাকে খুব হাসিখুশী লাগছে।'

'আমি এখানে মুখ গোমড়া করে থাকতে আসিনি।'

··উইলসন নদীর দিকে চেয়ে থাকে। ঝামাপাথরের বুকে জল ঝরছে।

উঁচু পাড়ের ওপারে বন। সকালের অভিজ্ঞতার কথা তার আবার মনে পড়ে।

'ইল্যাণ্ডের মাংস', প্লেটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে উইলসন।

'বড়ো বড়ো গরুর মত দেখতে সেই যে জন্তুগুলো খরগোসের মত লাফায়, তাই না?'

'মাংসটা খেতে বেশ।'
'ফ্র্যান্সিস, তুমিই মেরেছো বুঝি?'
'হ্যাঁ।'
'ওরা সিংহের মতো বিপজ্জনক নয়, তাই না?'
'মার্গট, কুন্তীর মতো পেছনে লাগা একটু থামবে?' মাংসের ওপরে সেদ্ধ আলু গ্রেভী আর গাজরের টুকরো ছড়াতে ছড়াতে বলে ফ্র্যান্সিস।
'তুমি এতো সুন্দর করে বললে থামাতেই হবে।' আজ রাতে সিংহ-শিকারের ঘটনাটা স্মরণীয় রাখতে আমরা শ্যাম্পেন খাবো', উইলসন বলে।
'ওঃ সিংহ, সিংহের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'
...মেয়েটা সমানে স্বামীর পেছনে লেগে আছে, উইলসন ভাবছিল। এই কি ভালো ব্যবহারের নমুনা? যদি কোন মেয়েমানুষ টের পায়, তার স্বামী কাপুরুষ, তার কাছে কেমন ব্যবহার আশা করা যায়? মেয়েটা দারুন নিষ্ঠুর। কিন্তু মার্কিন মেয়েমানুষেরাই নিষ্ঠুর। ওরা পুরুষদের শাসনে রাখে এবং শাসন করতে গেলে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হতেই হয়। আমি এদের কুৎসিৎ নিষ্ঠুরতা কতোবার দেখেছি?
'আর একটু মাংস খান', সে ভদ্রতা দেখিয়ে বলে।
শেষ বিকেলে উইলসন আর ম্যাকম্বার নিগ্রো ড্রাইভার আর বন্দুক বওয়া যাদের কাজ, এমন ড়ুজন কালো মানুষের সঙ্গে মোটরে বেরোলো। ম্যাকম্বার তাঁবুতেই রইলো। বড্ড গরম, ও বললো। তাছাড়া কাল সকালে ও তো শিকার দেখতে যাবেই।
ওরা যখন গাড়ী ছুটিয়ে যাচ্ছে, বড়ো গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারেট। এখন ওকে রূপসী মনে হয় না, বরং সুন্দর একটা পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। পরণে হাল্কা গোলাপী সার্ট, কালো চুল কপালে থেকে সরিয়ে পেছনে আঁট করে বাঁধা, মুখটা এমন তরতাজা যেন ইংল্যাণ্ডের কোন মেয়ে। মেয়েমানুষ হাত নাড়ছে। গাড়ীটা উঁচু ঘাসের বন ছাপিয়ে গাছের আড় বেঁকে ঝোপ ঢাকা ছোট্ট পাহাড়-

গুলোর ভেতরে মিলিয়ে গেল।

ঝোপ ঝাড়ের ভেতরে একপাল ইম্পালা। গাড়ী থেকে নেমে ওরা লম্বা শিংওলা একটা পুরুষ ইম্পালার পেছনে ধাওয়া করে। ম্যাকম্‌বার গুলি করলো।

টার্গেটে নিখুঁত শট্। ছ'শ গজ দূরে মদ্দা ইম্পালা উল্টে পড়লো। পালের বাকী জানোয়ারগুলো একে অন্যের ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে। লম্বা ঠ্যাংগুলো যেন ওদের হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নে যেমনটি দেখা যায়।

'গুড শট্! ছোট্ট টার্গেটে দূর থেকে গুলি করো। আর কোনো ঝামেলা হবে না।'

'কাল আমরা বুনো মোষ পাবো তো?'

'খুব সম্ভব। ওরা সকালে খেতে বেরোয়। ফাঁকা জায়গায় পাওয়া যাবে।'

'এই সিংহের ব্যাপারটা যদি মিটিয়ে দেওয়া যেতো', ম্যাকমবার বলে, 'তুমি সিংহের ভয়ে পালাচ্ছো, তোমার স্ত্রী দেখে ফেললে খুবই অপ্রীতিকর ব্যাপার, তাই না?'

কিন্তু সিংহের ভয়ে পালানোটাই বেশী অপ্রীতিকর নয় কি?— উইলসন ভাবছিল। কাপুরুষতাই অপ্রীতিকর; স্ত্রী দেখলো কি না দেখলো, তাতে কি যায় আসে? কাপুরুষতা দেখানোর পর তাই নিয়ে গল্প করা আরো অপ্রীতিকর। সে বলে।

'ওই নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই না। জীবনে প্রথম সিংহের মুখোমুখি হয়ে অনেকেই ঘাবড়ে যায়। ওসব কথা ভুলে যাও',

কিন্তু সে রাতে নৈশভোজন শেষ করে আগুনের ধারে হুইস্কি-সোডার-ককটেল খেয়ে মশারীর নীচে খাটিয়ায় শুয়ে রাত্রির অরণ্যের অচেনা শব্দ শুনতে শুনতে ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবারের মনে হয়, কোন কিছুই শেষ হয়নি। যা শুরুই হয়নি, তা শেষ হবে কি করে? ঠিক যে ভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল এবং ঘটনার কিছু অংশ তার বেশী মনে পড়ে, সে.

লজ্জা পায়।

কিন্তু লজ্জার থেকেও সে বেশী করে অনুভব করে ঠাণ্ডা ভয়ের শূন্যতা। আত্মবিশ্বাসের বদলে ভয় পিচ্ছিল শীতল শূন্যতা দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে। তার খারাপ লাগে।

আগের দিন ভোর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে সে শুনেছিল, নদীর ওপার থেকে ভেসে আসছে সিংহের গর্জন। ভারী গলার আওয়াজ শেষের দিকে কাশির মতো! শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, যেন সে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে ভয় পেয়েছিল।

সে তার স্ত্রীর ঘুমন্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছিল। সে কাকে বলবে যে সে ভয় পেয়েছে? কে তার সঙ্গে ভয় পাবে? সে একা। সোমালিদের বিখ্যাত প্রবাদ বলে; সাহসী মানুষ সিংহ দেখে তিনবার ভয় পায়। প্রথম, যখন সে বনের মধ্যে সিংহের পায়ের ছাপ দেখে। দ্বিতীয় বার, যখন সে সিংহের গর্জন শোনে। তৃতীয় বার, যখন সে সিংহের মুখোমুখি দাঁড়ায়। কিন্তু প্রবাদটা জানতো না ম্যাকমবার।

তারপর যখন ওরা ডাইনিং টেন্টে বসে লণ্ঠনের আলোয় ব্রেকফাষ্ট খাচ্ছে, সিংহটা আবার গর্জন করে উঠলো। ম্যাকমবারের মনে হল, সিংহ এখন খুব কাছে, তাদের ক্যাম্পের ধারেই এসে পৌঁছেছে।

'সিংহটা বুড়ো' রবার্ট উইলসন কফির কাপ থেকে মুখ তুলে বলছে, 'কাসির শব্দ শুনছো?

'খুব কাছে এসেছে নাকি?'

'না, নদীর ধার দিয়ে অন্তত মাইল খানেক দূরে—'

'আজ ওকে দেখতে পাবো?'

'চেষ্টা করবো।'

'সিংহের গর্জনের শব্দ এতো দূরে যায়?' নিগ্রো বয়রা বলছে, 'প্রকাণ্ড বড় সিংহ—'

'কোথায় গুলি করলে ওকে থামানো যায়?' 'ওর কাঁধে। ঘাড়ে

গুলি করলে আরো ভালো। ওর হাড় ভেঙে দিতে হবে—'
'আমি পারবো তো?'
'তোমার স্যুটিং এর হাত ভালো। সময় নিয়ে ভালো করে দেখে গুলি কোরো। প্রথম গুলির ওপরেই সব নির্ভর করে—'
'কত দূর থেকে গুলি করতে হবে?'
'বলতে পারছি না। এ ব্যাপারে সিংহেরও তো কিছু বক্তব্য আছে। কাছে না এলে গুলি কোরো না।'
'একশো গজেরও কম দূরত্বে?'
'একশো গজ, কখনো কখনো আরো কম। এই তো, মেমসাহেব এসে গেছেন,'
'গুডমর্ণিং,' মার্গারেট বলে, 'তোমরা ওই সিংহটাকে শিকার করবে? মার্ভেলাস।'
'আমি উঠি, সব ঠিকঠাক করতে হবে,' উইলসন চলে যেতেই সিংহটা আবার গর্জন করে ওঠে।
'বড্ডো চ্যাঁচায়,' উইলসন বলে, 'ওর চ্যাঁচামেচি বন্ধ করতে হবে,'
'ফ্র্যান্সিস, তোমার কি হয়েছে?' ম্যাকমবারের বউ জানতে চায়।
'কিছু না।'
'তুমি কাঁপছো কেন?'
'কিছু না।'
'তোমার শরীর ভালো তো?'
'সারারাত সিংহটা ডাকছে।'
'তুমি আমাকে ঘুম থেকে ওঠালেনা কেন? সিংহের ডাক শুনতে কি মজা লাগতো।'
'আমাকে সিংহটাকে মারতে হবে,' করুণ মুখে বলে ম্যাকমবার।
'তুমি তো সিংহ শিকারে এসেছো?' হ্যাঁ, কিন্তু আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি। সিংহটা চ্যাঁচালে আমার নার্ভ কেঁপে ওঠে।'
'বেশ তো, উইলসন যেমন বলছে, সিংহটাকে খুন করে ওর চ্যাঁচামেচি

থামিয়ে দাও।'

'ডার্লিং, কাজটা কি খুবই সোজা?' 'তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি?'

'না। কিন্তু আমার নার্ভাস লাগছে। সারারাত ওর গর্জন শুনতে শুনতে।'

'আমি জানি, তুমি সিংহটাকে মারবে। সিংহ-শিকার দেখবো বলে আমার কি যে আনন্দ।'

ঠিক তখনই সিংহ আবার গর্জে ওঠে। যেন সিংহের বুকের গভীর থেকে ভারী শব্দটা উঠে আসে, হাওয়ায় কাঁপন ধরায়।

তারপর আর্ত নিঃশ্বাসে, একটা চাপা ভারী কাশির মত সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে মিলিয়ে যায়।

'মনে হচ্ছে, সিংহটা খুব কাছে।'

ম্যাকমবারের বউ খুশী হয়ে বলে।

'মাই গড্, কি বিশ্রী আওয়াজ।'

চমক লাগানোর মতো। ভয় পাওয়ার মতো।'

তখনই হাসতে হাসতে ভেতরে আসে পেশাদার শিকারী রবার্ট উইলসন। তার হাতে বেঁটেখাটো কুৎসিৎ চওড়া বোরের পয়েন্ট পাঁচশো পাঁচ বন্দুক।

'চলো। বন্দুক-বওয়া নিগ্রো বয়দের কাছে তোমার স্প্রিংফিল্ড আর বড় বন্দুকটা আছে। তোমার কাছে সলিডগুলো আছে তো?'

(সলিড অর্থে ধাতুর জ্যাকেটে মোড়া বুলেট)

'ওর চেঁচামেচি বন্ধ করতে হবে। তুমি সামনের সীটে বসো, তোমার বউ আমার পাশে বসতে পারে।'

'মোটর গাড়ীতে উঠে প্রথম সকালের ম্লান, ধূসর আলোয় ওরা নদীর ধার দিয়ে গাছের আড়ালে গাড়ী ছোটায়।

রাইফেলের ব্রীচ খুলে ম্যাকমবার দেখে, ভেতরে ধাতুর জ্যাকেটে মোড়া বুলেটগুলো ঠিকই আছে।

তার আঙুলগুলো কাঁপছে। পকেটে, টিউনিকের সামনে লুপে বাঁধা

আরও কার্তুজ। মোটর-গাড়ীটা বাক্সের মতো, দরজা নেই, পেছনের সীটে তার স্ত্রীর পাশে বসে আছে উইলসন। দুজনেরই রক্তে শিকারের উত্তেজনা। দুজনেরই মুখে হাসি।

'ওই ছাখো, আকাশ থেকে মাংসাশী পাখীরা নামছে। তার মানে সিংহ যে জানোয়ারটাকে মেরেছে, সেটাকে ফেলে রেখে বুড়ো সিংহটা উঠে গেছে।'

দূরে নদীর ধারে গাছের মাথার ওপরে শকুনের পাল ঘুরে ঘুরে নামছে।

'গুহায় ফিরে যাওয়ার আগে খুব সম্ভব ও নদীতে জল খেতে আসবে। তুমি তৈরী থেকো।' ফিস ফিস করে বলে উইলসন।

নদীর উঁচু পাড়। খুব আস্তে আস্তে গাড়ী চলেছে। ঝামা-পাথরের ওপরে গভীর জল। গাছের ছায়ায় এঁকে বেঁকে চলেছে নদী। ম্যাকম্বার নদীর ওপারের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ উইলসন ওর হাতে হাত রাখে। গাড়ীটা থেমে যায়।

'ওই ছাখো', ম্যাকমবার উইলসনের চাপা গলার শব্দ শোনে, 'সামনে, নদীর ওপারে, ডানদিকে। তুমি গাড়ী থেকে নামো, এগিয়ে যাও, গুলি করো। সিংহটা কি সুন্দর।'

এখন ম্যাকম্বারও সিংহ দেখতে পেয়েছে। প্রায় আড়াআড়ি ভাবে নদীর ওপারে প্রকাণ্ড মাথা তুলে সিংহটা ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, প্রথম সকালের হাওয়া তার কালচে কেশরে কাঁপন ধরাচ্ছে। সকালের ম্লান ধূসর আলোয় নদীর ওপারে সিংহের বিশাল শিল্যুট, ভারী কাঁধ, রাইফেলের ব্যারেলের মতো শক্ত শরীরে মসৃণ গতির স্বাচ্ছন্দ্য।

'কতো দূর?' রাইফেল তুলে বলে ম্যাকমবার।

'প্রায় পঁচাত্তর গজ। গাড়ী থেকে নেমে যাও। এগিয়ে যাও। গুলি করো।'

'গাড়ীতে বসে গুলি করলে হয় না?' 'গাড়ীতে বসে গুলি করা নিয়ম নয়, ওর কানে কানে বলছে উইলসন, 'গাড়ী থেকে নামো। ও সারা-

দিন তোমার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না।' ···গাড়ী থেকে মাটিতে নামে ম্যাকম্বার।

এখনও নদীর ওপারে সিংহ তার আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীটা ওর চোখে এখনও অতিকায় একটা ছায়ার মতো। উল্টো দিক থেকে হাওয়া বইছে। মানুষের গন্ধ ওর নাকে যায়নি! প্রকাণ্ড মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে সামান্য নড়িয়ে অদ্ভুত জিনিষটা দেখছে সিংহ। সে ভয় জানে না। কিন্তু ওপারে ওই অদ্ভুত জিনিষটা? এখন জলে মুখ দিয়ে তেষ্টা মেটাতে সে একটু ইতস্তত করে। হঠাৎ সে দেখে, প্রকাণ্ড জিনিষটার ভেতর থেকে একটা মানুষ বেরিয়ে এলো। সে ভারী মাথা তুলিয়ে পিছু হটে। ঠিক তখনই ওর কানে আসে বিস্ফোরণের শব্দ। পয়েণ্ট থারটি ড্যাশ জিরো সিক্স ছ'শ কুড়ি গ্রেন ওজনের ধাতুর জ্যাকেট মোড়া বুলেট তার পাশে বেঁধে, মাংস ছিঁড়ে পেটের মধ্যে তপ্ত অঙ্গারের জ্বালা ধরায়, তার বমি আসে। সিংহটা লাফিয়ে ছোটে। ভারী শরীর, বড় পা, পেটে গুলি বেঁধা। গাছের ভেতর দিয়ে ছুটে ঘাসবনের আড়ালে সে আশ্রয় নিতে চায়। আবার বিস্ফোরণের আওয়াজ। তার পাশ দিয়ে হাওয়া ছিঁড়ে ছুটে যায় জ্বলন্ত অঙ্গার। আবার গুলির শব্দ। এবার গুলিটা তার পাঁজরায় লাগে, হাড় ভেঙে বুকের ভেতরে ঢোকে, তার মুখে তারই ফেনাওঠা গরম রক্তের স্বাদ। সে লাফাতে লাফাতে ঘাসের বনে ঢুকে যায়। ওখানে সে গুঁড়ি মেরে বসে থাকবে, অপেক্ষা করবে, যতোক্ষণ না বিশ্রী আওয়াজ তোলা ওই জিনিষটা কাছে আসে। তারপর সে হঠাৎ ছুটে যাবে, যে মানুষটা ওই জিনিষটা ধরে আছে, তাকে সে খুন করবে!

সিংহটা কি ভাবছে, ম্যাকমবার জানে না।, সে শুধু জানে তার হাত দুটো কাঁপছে, গাড়ী থেকে নামার পর তার পাদুটো নড়তে চাইছে

না। অনড় উরু কিন্তু পেশীগুলো কেঁপে-কেঁপে কাঁধের মাঝখানটা টার্গেট করে সে ট্রিগার টেপে। কিছুই হয় না। ট্রিগার টিপতে টিপতে আঙুলটা ভেঙে যাবার জোগাড়, তবু কিছু হয় না।

তখন তার খেয়াল হয়, সে রাইফেলের সেফ্‌টি ক্যাচ খুলতে ভুলে গেছে।

রাইফেলটা নামিয়ে সে যখন সেফটি ক্যাচ খুলছে, অনড় জমাট পা ছুটো আর একটু এগিয়ে গেছে, তখন গাড়ীর শিল্যুট থেকে মানুষের শিল্যুট আলাদা করে দেখতে পেয়েছে সিংহ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সিংহটা চলে যাচ্ছে। ম্যাকমবার গুলি করে।

'হোয়াংক্‌!'

তারমানে, বুলেট টার্গেটে বিঁধছে। তবু সিংহটা চলেছে। আবার গুলি করে ম্যাকমবার। বুলেট টার্গেটে না বিঁধে একটু দূরে ধুলোর ঝড় তোলে। রাইফেল নামিয়ে গুলি করে ম্যাকমবার।

'হোয়াংক!'

এবার গুলি টার্গেটে বেঁধে। তবু সিংহটা ছুটে ঘাসের আড়ালে মিলিয়ে যায়। ম্যাকমবারের মাথা ঘুরছে, বমি আসছে। তার হাতের স্প্রিংফিল্ড রাইফেল কাঁপছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বউ আর পেশাদার শিকারী উইলসন। বন্দুক বওয়া যাদের কাজ, সেই ছুটো নিগ্রো ওয়াকাম্বা ভাষায় কি যেন বলাবলি করছে।

'আমার ছুটো গুলি ওর গায়ে বিঁধেছে।' 'একটা পেটে, একটা গায়ের অন্য কোথাও', নিরুৎসাহ গলায় বলে উইলসন। বন্দুক বওয়া যাদের কাজ, সেই নিগ্রো দুজন চুপচাপ, খুব গম্ভীর।

'হয়তো তুমি ওকে মেরেছো', উইলসন বলে, 'একটু অপেক্ষা করে আমরা ঘাসের বনে ঢুকবো।'

'তার মানে ?'

'ওর শরীর কাহিল হতে দাও। তারপর ওকে তাড়া করবো।'

'ওঃ।'

'সিংহটা খুব সাহসী', উইলসন বোঝায়, 'তবে এখন ও বাজে জায়গায় ঢুকেছে।'

'বাজে কেন?'

'এখন সিংহের মুখোমুখি হওয়ার আগে তুমি ওকে দেখতে পাবে না।'

'ওঃ!'

'চলো। মেমসাহেব, গাড়ীতে বসে থাকো! রক্তের দাগ দেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

'মার্গট, তুমি এখানেই থাকো।'

'কেন?'

'উইলসন বলছে।'

'আমরা আহত সিংহকে খুঁজতে যাচ্ছি।' 'তুমি এপার থেকেও শিকার দেখতে পাবে।'

উইলসন বোঝায়।

সোয়াহিলি ভাষায় ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে উইলসন। ঠিক আছে, বোয়ানা, লোকটা মাথা নাড়ে। (বোয়ানা সোয়াহিলি ভাষায় সম্মানিত কোন মানুষের উদ্দেশ্যে প্রচলিত সম্বোধন।)

...ওরা উঁচুপাড় থেকে নামে। ঝামাপাথরের ওপর পা রেখে ওপারের গাছগুলোর ঝুলন্ত শেকড় বেয়ে ওরা ওপারে ওঠে। ম্যাকম্বারের গুলি যেখানে প্রথম সিংহের পেটে বিঁধেছিল, সেখানে ঘাসের ওপরে রক্তের দাগ। রক্তের দাগগুলো ঘাসের ওপর দিয়ে গাছের ছায়ার নীচে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে।

'আমরা কি করবো?' ম্যাকমবার জানতে চায়। 'আর কোন উপায় নেই।' উঁচুপাড়, গাড়ী এখানে আনা যাবে না। সিংহটাকে আর একটু ঘায়েল হতে দাও, তারপর আমরা ওকে তাড়া করবো।'

'ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিলে হয় না?' 'সবুজ ঘাস। আগুন ধরবে

কেন?'

বীটার পাঠিয়ে বাজনা বাজিয়ে ওটাকে তাড়ালে হয় না?'

'হয়, কিন্তু সেটা মানুষ খুন করার মতোই হবে। ছাখো, সিংহটা আহত। আহত না হলে বীটারদের আওয়াজ শুনলে সিংহ পালায়। কিন্তু আহত সিংহ পালাবে না, মানুষের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমি একেবারে ওর মুখোমুখি আসার আগে পর্যন্ত ওকে দেখতে পাবে না। ও গুঁড়িমেরে এমন জায়গায় লুকোবে, যেখানে একটা খরগোসও লুকিয়ে থাকার কথা নয়। তুমি যদি নিগ্রো বয়দের পাঠাও ওদের কেউ না কেউ সিংহের থাবার ঘায়ে মরবে।'

তাহলে এই নিগ্রো ছুটো, বন্দুক বওয়া যাদের কাজ, এদের কি হবে?'

'ওঃ, ওরা আমাদের সঙ্গে যাবে। এটা ওদের শউরি।' (শউরি আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত আফ্রিকান শব্দ। কথাটার আসল মানে আরবী ভাষায় 'আলোচনা'। কিন্তু আফ্রিকান ভাষায় 'কাজ' কিম্বা 'পরীক্ষা'।)

'আমি ওখানে যেতে চাই না', ম্যাকমবার বলে। মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যায়।

'আমিও চাইনা। তবু যেতে হবে। অবশ্য তুমি না গেলেও পারো। এই জন্যেই অতো টাকা দিতে হয়েছে আমাকে।'

'তার মানে? তুমি একা যাবে? সিংহটা ওখানেই থাকনা?'

রবার্ট উইলসন এতোক্ষণ শুধু সিংহের কথা ভাবছিলো। ম্যাকমবারেব কথা একবারও ভাবেনি, এখন ওর মনে হয় ও যেন হঠাৎ হোটেলের ভুল ঘরের দরজা খুলে ঢুকে নরনারীর যৌন সঙ্গমের দৃশ্য দেখে ফেলেছে।

'তার মানে?'

'সিংহটা ওখানেই থাক।

'তার মানে, আমরা ভান করবো যে ওর গায়ে গুলি লাগেনি?'

'না, ওকে ছেড়ে দাও।'

'তা হয় না।'

'কেন হয় না?'

'প্রথমতঃ, সিংহটা কষ্ট পাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ আর কোন মানুষ যদি ওর মুখোমুখি পড়ে, সিংহটা তাকে খুন করবে।'

'বুঝেছি।'

'তোমাকে যেতে হবে না।'

'আমি যেতে চাই। কিন্তু আমার ভয় লাগছে।

'ঘাসের বনে ঢুকে রক্তের দাগ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে আমাদের বয় কন্‌গোনি। তার পেছনে আমি। তুমি আমার পেছনে এক—পাশে থাকবে। সিংহটাকে দেখতে পেলে আমরা দুজনেই গুলি করবো। তুমি ঘাবড়িও না, তোমার বুলেটে সিংহ না মরলে আমার গুলিতে মরবে। আমি বলি কি তোমার যেয়েই কাজ নেই। তুমি বরং মেমসাহেবের পাশে গাড়ীতে বসে থাকো। আমি সিংহটাকে খতম করে আসি।' 'না, আমি যেতে চাই।'

'ঠিক আছে। তবে ইচ্ছে না হলে যেওনা। তুমি তো জানো, এটা এখন আমারও 'শউরী।'

'আমি যেতে চাই।'

'আমরা অপেক্ষা করছি। তুমি ততোক্ষণ মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলে এসো।'

'না।'

'তাহলে আমিই কথা বলে আসছি।'

'বেশ।'

গাছের ছায়ায় বসে থাকে ম্যাকমবার। ঘামে তার হাত দুটো ভিজে উঠেছে, গলা শুকনো। কিন্তু সে সাহস করে উইলসনকে বলতে পারছে না, তুমি একা সিংহ শিকারে যাও।

সে জানেনা যে উইলসন তার মনের অবস্থা না বুঝে তাকে সঙ্গে এনেছে বলে নিজের ওপরে চটে উঠেছে।

তোমার বড় বন্দুকটা এনেছি। এই নাও। সিংহটা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে খানিকটা ঘায়েল হয়েছে। আমার পেছনে, আড়াই হাত মতন ডানদিকে থাকো। আমি যা বলবো, ঠিক তাই করবে, বন্দুক বওয়া যাদের কাজ, সেই নিগ্রো দুটোর সঙ্গে সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলে উইলসন। নিগ্রো দুটোর মুখ দুশ্চিন্তায় আরো কালো হয়ে গেছে।

'চলো—'

'আমি একটু জল খাবো, ম্যাকমবার বলে। উইলসন সঙ্গের দুটো বয়ের মধ্যে যার বয়স বেশী, তাকে কি বললো। বেল্টে আটকানো জলের বোতলটার ক্যাপ খুলে ও ম্যাকমবারের হাতে তুলে দেয়। জলের পাত্রটা অসম্ভব ভারী, ফেল্টের ঢাকনাটা বিশ্রী নোংরা মনে হয়। বোতল তুলে গলায় জল ঢালতে ঢালতে সে দেখে, সামনে উঁচু ঘাস, পেছনে মহীরুহের সমতল চূড়োগুলো। হাওয়া ওর চোখে মুখে লাগে, ঘাসের বনে কাঁপন জাগে। বন্দুক বওয়া যাদের কাজ, তাদের দেখলেও বোঝা যায় না, ওরাও ভয় পেয়েছে।

পঁয়ত্রিশ গজ দূরে ঘাসের মধ্যে গুঁড়িমেরে প্রকাণ্ড সিংহটা শুয়েছিল। ওর কানগুলো পেছনের দিকে ঝুঁকে আছে, কালো লোমের ঝালবওলা ছোট লেজটা এক একবার কাঁপছে, সমস্ত শরীরটা কিন্তু নিথর। ঘাসের বনের আড়ালে ঢুকেই ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ভরা পেটে গুলি লেগেছে, অসহ্য বমির ভাব, ফুসফুসে বুলেট বেঁধার পর থেকে প্রত্যেকবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে রক্তে মেশানো পাৎলা লাল ফেনা মুখে উঠে আসছে। পেটের পাশটা ভিজে, গরম, কপিস রঙের চামড়া ফুটো করে যেখানে ধাতুর জ্যাকেটে মোড়া বুলেট ঢুকেছে, সেই ছোট ক্ষতস্থান গুলোতে এখন মাছি বসছে। সিংহের বড় বড় হলুদ চোখ-দুটো ঘেন্নায় ছোট হয়ে গেছে। ও সামনে তাকিয়ে আছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখনও চোখ পিটপিট

করে থাবার নখ দিয়ে নরম মাটি আঁচড়ায়। তার সমস্ত অস্তিত্ব, যন্ত্রণা অসুখ, ঘেন্না এবং তার প্রচণ্ড শক্তির যেটুকু এখনও অনবসিত, সব কিছু নিয়ে সে একমনে প্রতি-আক্রমনের জন্যে তৈরী হচ্ছে। সে মানুষের কথাবার্তার শব্দ শুনছে। সে অপেক্ষা করছে। ঘাসের বনে মানুষ ঢুকলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওদের গলার শব্দ শুনতে শুনতে তার লেজটা শক্ত হয়ে ওপরে নীচে দোলে। ওরা যখন ঘাসের বনের ধারে এসে দাঁড়ায়, সে চাপা কাশির মত গরগর আওয়াজ করে ছুটে যায়।

সামনে কনগোনি, বন্দুক বওয়া যার কাজ সিংহের রক্তের দাগে চোখ রেখে এগিয়ে আসছে। উইলসনের চোখ খুঁজছে, ঘাসের বনে কোথাও কোনো গতির স্পন্দন জেগেছে কিনা। ওর হাতে বড় রাইফেলটা টার্গেট খুঁজছে।

উইলসনের কাছেই ম্যাকমবার। তারও হাতে উদ্যত রাইফেল। ওরা ঘাসের বনে ঢুকতেই ম্যাকমবার শুনতে পেলো আহত সিংহের বুজে-আসা গলার চাপা গরগর আওয়াজ। তারপর ঘাসের বন কেঁপে উঠলো।

তারপর কি হয়েছিল, সে জানে না। সে ছুটছিল, অন্ধ সন্ত্রাস তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, পাগলের মত সে নদীর দিকে ছুটতে থাকে।

ক্যা—রা—ওয়াং!

উইলসনের বড় রাইফেলের গর্জন।

ক্যা—রা—ওয়াং!

উইলসনের রাইফেল আবার শব্দ তোলে।

ম্যাকমবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে, সিংহটা, এখন আরও ভয়ংকর—আধখানা মাথা বুলেটে উড়ে গেছে, তবু সিংহটা ঘাসবনের ধার দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে সেই লালমুখো মানুষটার দিকে, যে

বেঁটে মোটা কুৎসিং রাইফেলের বোল্ট নাড়াচাড়া করে একমনে টার্গেট ঠিক করছে।

ক্যা—রা—ওয়াং !

রাইফেলের ব্যারেল থেকে আবার বিস্ফোরণ সিংহের ভারী, হলুদ শরীরে শক্ত হয়ে সামনে গড়িয়ে পড়ে।

এবং ম্যাকম্বার, ফাঁকা জায়গায়, দাঁড়িয়ে দেখে, হাতে লোডেড রাইফেল থাকা সত্বেও যে লোকটা পালিয়ে এসেছে, তার দিকে ঘেন্নার চোখে তাকিয়ে আছে দুটো কালো, একটা সাদা মানুষ।

সে উইলসনের দিকে এগিয়ে যায়। লোকটার চেহারার লম্বা কাঠামোটা এখন উলঙ্গ ভৎর্সনার মতো !

'ফটো তুলবে ?'—উইলসন বলে।

'না।'

মোটর গাড়ীতে ওঠার আগে তারা আর কোন কথা বলেনি।

তারপর উইলসন বলেছে : 'সুন্দর সিংহ। বয়রা ওর চামড়া ছাড়াচ্ছে। আমরা ততোক্ষণে ছায়ায় বসি।

ম্যাকমবারের বউ পেছনের সীটে স্বামীর পাশে বসে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেনা।

সেও তার স্ত্রীর দিকে তাকাতে পারছে না। সামনের সীটে উইলসন। একবার ম্যাকমবার তার স্ত্রীর হাতে হাত রাখতে চেয়েছিল, মার্গারেট হাত সরিয়ে নিয়েছে।

নদীর ওপারে যেখানে নিগ্রোরা সিংহের চামড়া ছাড়াচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে ম্যাকমবার বুঝতে পারে, তার স্ত্রী সব কিছুই স্পষ্ট দেখছে। বসে থাকতে থাকতে মার্গারেট হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ে, উইলসনের কাঁধে হাত রাখে। সামনের সীটে বসা উইলসন পেছন ফিরে তাকাতেই পেছনের সীট থেকে ঝুঁকে ওর ঠোঁটে চুমু খায় মার্গারেট।

'ওঃ, একি ?' উইলসনের মুখ স্বাভাবিক আগুন-রাঙা লালের থেকে আরও লাল। লজ্জার লাল।

'মিষ্টার রবার্ট উইলসন,' মার্গারেট বলে, 'সুন্দর লাল-মুখো রবার্ট উইলসন।'

তারপর ম্যাকমবারের বউ তার পাসে বসে নদীর ওপারের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেখানে সিংহটা শুয়ে আছে। সামনের থাবা ছুটো উঁচু, সাদা মাংসে পেশীবন্ধের দাগ, চামড়া-ছাড়ানো ভারী পেটের সাদা রং। কালো মানুষেরা ওর মাংস থেকে চামড়া ছাড়াচ্ছে। এক সময় রক্তে ভেজা ভারী চামড়াটা বয়ে নিয়ে ওরা এপারে আসে, চামড়াটা ভাঁজ করে গাড়ীতে উঠে বসে। ক্যাম্পে ফেরার পথে কেউ কোন কথা বলেনি।

···এই হল ম্যাককবারের সিংহ-শিকারের গল্প।

সিংহটা ছুটতে শুরু করার আগে কি ভেবে ছিল, মানুষ জানে না। ছুটতে ছুটতে যখন দু'টনের প্রচল মাজল ভেলোসিটি নিয়ে পয়েন্ট ফাইভ হাণ্ড্রেড ফাইভ বুলেট তার খোলা মুখে বিঁধেছিল, তখন কি ভেবেছিল সিংহটা? কেন সে তবুওও ছুটে এসেছিল? দ্বিতীয় বুলেটটা যখন তার শরীরের পেছনের দিকে বিঁধে হাড় ভেঙে দিয়ে ছিল, তখনো কেন সে হামাগুড়ি দিয়ে সেই বিস্ফোরণের উৎসের কাছে পৌঁছতে চেয়েছে, যা তাকে ধ্বংস করছে? উইলসন কিছুটা বুঝছিল, তাই সে বলেছিল, সুন্দর সিংহ। কিন্তু উইলসন কি ভাবছে, ম্যাকমবার তাও জানেনা যদিও সে জানে, তার স্ত্রী আর তাকে সহ্য করতে পারছে না।

এর আগেও তার স্ত্রী তার ওপর বিগড়ে গেছে। কিন্তু পরে সব মিটে যায়।

তার অনেক টাকা আছে, পরে আরও টাকা হবে এবং সে জানে, তার স্ত্রী এখন আর তাকে ছেড়ে যাবে না। যে সামান্য কয়েকটা ব্যাপার সে সঠিক জানে, এটা তারই একটা। যেমন মোটর সাইকেল চালানো; বালি হাঁস শিকার, মাছ ধরা, ট্রাউট, স্যামন, সমুদ্রের বড়ো

মাছ, বইয়ের পাতায় সেক্স, অনেক বই, বড্ড বেশী বই পড়া টেনিস খেলা, কুকুর পোষা, ঘোড়ায় চড়া, নিজের পয়সাকড়ি সামলে চলা এবং স্ত্রী যেন তাকে ছেড়ে না যায়, তাই দেখা। তার স্ত্রী সুন্দরী ছিল, আফ্রিকায় এখনও লোকে তার স্ত্রীকে সুন্দরীই বলবে। কিন্তু মার্কিন মুলুকে ওকে আর আগের মতো সুন্দরী মনে হবে না। তার স্ত্রী এখন আর তাকে ছেড়ে আরও ধনী, আরও সুপুরুষ স্বামী জোটাতে পারবে না। এ কথা মার্গারেট জানে, ম্যাকমবারও জানে। সে ম্যাকমবারকে ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছে। এ কথাও ম্যাকমবার বোঝে।

মেয়েদের কব্জা করার ব্যাপারে ফ্যান্সিস ম্যাকমবারের যদি সত্যিকারের এলেম থাকতো, মার্গারেট দুশ্চিন্তা হতো, তার স্বামী হয়তো তাকে ছেড়ে নতুন সুন্দরী জোগাড় করার চেষ্টা করবে। কিন্তু ফ্র্যান্সিসকে চেনে বলেই দুশ্চিন্তা করে না মার্গট। ফ্যান্সিস ম্যাকমবারের সহনশীলতা, আপাতদৃষ্টিতে যেটা তার সবচেয়ে বড় গুণ মনে হয়, সেটাই তার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

সব মিলিয়ে তুলনামূলক বিচারে তারা সুখী দম্পতি। সেই সব সুখী দম্পতির অন্যতম, যাদের সম্ভাব্য বিচ্ছেদ গুজবে রটে, কিন্তু ঘটনায় ঘটে না। তাদের শিকার-যাত্রার অন্তহীন রোমান্স লোকের মনে ঈর্ষা জাগায়। আফ্রিকার সেই অন্ধকার মহাদেশে তারা সফরিতে বেড়িয়েছে, যে মহাদেশ মার্টিন জনসন দম্পতি সিনেমার রূপোলী পর্দায় বার বার ফুটিয়ে তোলার আগে মার্কিন জনতার কাছে ছিল এক অন্ধকার রহস্যময় জগত।

(কুড়ির দশকে লেখক শিকারী, ও অ্যাডভেনচারার মার্টিন ই জনসন আফ্রিকান বন্য জীবন সম্বন্ধে বই লিখেও ফিল্ম তুলে নাম কেনেন। তাঁর ফিল্মে তাঁর স্ত্রীকে সব সময় তাঁর আশে পাশে দেখা যেতো)।

মার্টিন জনসন দম্পতি ওল্ড সিম্বা নামের সিংহ কিংবা বুনো মোষ কিম্বা

টেম্বো নামের হাতি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ন্যাচারল হিস্ট্রি মিউজিয়মের জন্যে স্পেসিমেন জোগাড় করেছে মার্টিন জনসন দম্পতি—ফিল্মে বরাবর দেখা গেছে। এবং কোন এক খবরের কাগজের 'সোসাইটি-কলম', লেখা সাংবাদিক লিখেছেন, জনসন দম্পতির মতোই ম্যাকম-বার দম্পতি এখন অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ নিচ্ছেন আফ্রিকার গহন অরণ্যে। ওই একই সাংবাদিক এর আগে অন্ততঃ তিনবার খবরের কাগজের সোসাইটি কলমে ম্যাকমবার দম্পতির সম্ভাব্য ডিভোর্সের ইঙ্গিত দিয়েছে।

কিন্তু প্রত্যেকবারই মিটমাট হয়ে গেছে। ওদের মিলনের ভিত্তিটাই শক্ত। মার্গট সুন্দরী, অতএব ফ্রান্সিস তাকে ডিভোর্স করতে পারে না। ম্যাকমবারের এত টাকা পয়সা আছে যে মারগট তাকে ছেড়ে যেতে পারে না।

সিংহের কথা ভাবতে ভাবতেই এক সময় ম্যাকমবারের চোখে ঘুম নেমেছে। ভোর তিনটেয় দুঃস্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে স্বপ্ন দেখছিল, রক্তাক্ত মাথা নিয়ে সিংহটা তার মুখের ওপরে ছায়া ফেলেছে, তার হৃৎপিণ্ড দুলে উঠেছিল। ঘুম ভেঙে সে বুঝলো, তার স্ত্রী তাঁবুর অন্য খাটিয়ায় শুয়ে নেই। দু'ঘণ্টা জেগে রইলো ম্যাকমবার।

দু'ঘণ্টা পরে তাঁবুতে ফিরে এলো ম্যাকমবারের বউ, মশারীটা তুলে আরামে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' অন্ধকারে ফ্রান্সিস ম্যাকমবার জানতে চায়।

'হ্যালো, তুমি জেগে আছো?'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'হাওয়া খেতে।'

'জাহান্নামে?'

'আমি কি বললে তুমি খুশী হও, ডার্লিং ?'

'কোথায় গিয়েছিলে ?'

'হাওয়া খেতে !

'হাওয়া খাওয়া বুঝি অন্য পুরুষের সঙ্গে শুতে যাওয়ার নতুন নাম ? তুমি একটা কুত্তী ।'

'তুমি ডরপুক, কাপুরুষ ।'

'বেশ, তাতে হয়েছেটা কি ?'

'আমার ঘুম আসছে, বকবক করো না প্লীজ ।'

'তোমার ধারণা, আমি সব কিছু সহ্য করবো ?' 'সুইট, আমি জানি, সহ্য করাই ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবারের স্বভাব ।'

'না, আমি সহ্য করবো না ।'

'প্লীজ, ডার্লিং, বক্‌বক্‌ করোনা, আমার দারুণ ঘুম পেয়েছে ।'

'তুমি কথা দিয়েছিলে, তুমি অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে নষ্টামি করবে না ।'

'হ্যাঁ, ডার্লিং, তাইতো ভেবেছিলাম। কিন্তু কালকের ব্যাপারে মেজাজটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওই নিয়ে আবার কথা বলি, তুমি নিশ্চয়ই চাও না ।'

'আমি যখনই প্যাঁচে পড়ি, সুবিধেটা তুমি কাজে লাগাও ।'

'প্লীজ, কথা বলো না । ডার্লিং, আমি ঘুমোব ।'

'আমি কথা বলবো ।'

'বেশ, তুমি কথা বলো, আমি ঘুমুচ্ছি ।'

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবারের মনে হল, জীবনে তার স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী যে সব পুরুষকে ঘেন্না করেছে ম্যাকমবার, তাদের মধ্যে রবার্ট উইলসনকেই সে সব চেয়ে বেশী ঘেন্না করে ।

'ভালো ঘুম হল ?'

'তোমার ?'

'দারুণ।'

'বেজন্মা', ম্যাকমবার মনে মনে বলছিল, 'ব্ল্যু ব্যাস্টার্ড!'

রাত্তিরে আমার বিছানা থেকে উঠে যেয়ে কুত্তীটা আবার স্বামীরও ঘুম ভাঙিয়েছে। ঠাণ্ডা চোখে ওদের দুজনকে দেখতে দেখতে উইলসন ভাবছে।

লোকটা মেয়ে মানুষটাকে জুতোর তলায় রাখতে পারে না কেন? মেয়েমানুষকে যে ভাবে রাখা উচিত, সেইভাবে? ও আমাকে কি ভাবছে? আমি কি সন্ত, প্লাষ্টারের পুতুল, যে মেয়েমানুষ আমার সঙ্গে শুতে এলে উঠে যেতে বলবো? ও বৌকে সামলায় না কেন? এসব ওরই দোষ।

'তোমার কি মনে হয়, আমরা বুনো মোষ খুঁজে পাবো? খোবানি ভর্তি ডিস থেকে মুখে তুলে মার্গট বলে।

'চান্স আছে', উইলসন হাসে, 'তুমি ক্যাম্পেই থাকো।'

'না, কিছুতেই না।'

ওকে ক্যাম্পে থাকতে অর্ডার দাও, উইলসন ম্যাকমবারকে বলে।

'তুমি অর্ডার দাও', ঠাণ্ডায় গলায় বলে ম্যাকমবার। 'আমি কারও অর্ডার মানিনা', মার্গট ম্যাকমবারের দিকে ঘুরে বলে. 'কারও বোকামিও বরদাস্ত করি না।'

'রেডী?' ম্যাকমবার জানতে চায়।

'যখন বলবে তখনই। মেমসাহেব সঙ্গে যাবে না এখানে থাকবে? তুমি কি চাও?'

'আমি কি চাই, তাতে কিছু যায় আসে?'

জাহান্নামে যাক, রবার্ট উইলসন ভাবছিল। এখন থেকে এই রকমই চলবে।

'কিছু যায় আসে না।'

'তুমি নিজে কি চাও? তুমি মার্গারেটের সঙ্গে থাকো, আমি বাইরে বুনো মোষ শিকারে চলে যাই?'

তা হয় না। তোমার জায়গায় আমি হলে আজে বাজে কথা বলতাম না।'

'আমি আজে বাজে কথা বলছিনা। আমার ঘেন্না লাগছে।'

'ঘেন্না একটা খারাপ কথা।'

'ফ্রান্সিস, খোকার মত কথা বলা বন্ধ করো', ম্যাকমবারের বউ বলে।

'আমি দীর্ঘদিন বড্ড বেশী যুক্তি যুক্ত কথা বলেছি। এতো বাজে খাবার কেউ কখনও খেয়েছে?'

'খাবারটা খারাপ?' উইলসন ঠাণ্ডা গলায় বলে।

'অন্য সব কিছুর মতই খারাপ।'

'সামলে কথা বলো। টেবিলে যে বয়টা রয়েছে, ও একটু আধটু ইংরাজী বোঝে।'

'ও জাহান্নামে যাক।'

উইলসন উঠে দাঁড়িয়ে পাইপে টান দিতে দিতে বন্দুক বওয়া যাদের কাজ, সেই নিগ্রোদের একজনকে সোয়াহিলি ভাষায় কিছু বলে। ম্যাকমবার এবং তার স্ত্রী টেবিলে বসে থাকে। ম্যাকমবার কফির কাপের দিকে চেয়ে আছে।

'ডার্লিং, তুমি যদি এরকম নাটক করো, আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো।'

'না, তুমি যাবে না—'

'তুমি নাটক করার চেষ্টা করে দেখো, কি হয়—'

'না, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না।'

'না, আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না, তুমিও আমার কথামত চলবে, ভদ্র ব্যবহার করবে।'

'ভদ্র ব্যবহার? তুমি ভদ্র হতে পারো না?'

'অনেককাল চেষ্টা করেছি।'

'ওই লাল মুখো শুয়োরটাকে দেখলে আমার ঘেন্না হয়।'

'লোকটা খুব ভালো।'

'ওঃ, শাট আপ', ম্যাকম্‌বার প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। ঠিক তখনই গাড়ীটা

সামনে এসে দাঁড়ায়। ড্রাইভার এবং বন্দুক বওয়া বয়হুটো এগিয়ে আসে।

উইলসন টেবিলে বসে থাকা স্বামী-স্ত্রীর কাছে এগিয়ে আসে।

'শিকারে যাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'একটা সোয়েটার সঙ্গে নিও। গাড়ীতে ঠাণ্ডা লাগবে।'

'আমার চামড়ার জ্যাকেটদা নিয়ে আসি,' মার্গট বলে।

'বয়টা নিয়ে এসেছে,' উইলসন জানায়। ও সামনের সীটে উঠে বসেছে।

পেছনের সীটে বউয়ের পাশে ম্যাকমবার, কেউ কথা বলছে না।

উজবুকটা চটে যেয়ে গুলি করে আমার মাথার পেছনটা উড়িয়ে দেবে না তো?

উইলসন আপন মনে ভাবে। সফরিতে মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকা মানেই ঝামেলা।

গাড়ীটা ঘরঘর করতে করতে নুড়িভর্তি অগভীর খাঁড়ি দিয়ে নদী পেরোয়।

প্রথম সকালের ধূসর আলো। উঁচু পার বেয়ে গাড়ী উঠছে। উইলসনের অর্ডার মাফিক কোদাল দিয়ে নুড়ি সরিয়ে রাস্তা সাফ-করা হয়েছে। দু'পাশে গাছের ছায়া, মধ্যে পার্কের মত ফাঁকা মাঠ।

চমৎকার সকাল, উইলসন ভাবছে, সারারাত শিশির ঝরেছে, গাড়ীর চাকা যখন ঘাস আর নীচু ঝোপের মধ্যে চলেছে, চাকায় পেশা ফার্ণের গন্ধ ভারবেনা ফুলের গন্ধের মতো। সকালের শিশির, মোটরের চাকায় পেশা ফার্ণ, প্রথম সকালের কুয়াশার আড়ালে গাছের কালো গুঁড়ি—গাড়ী যখন ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে, এইসব দৃশ্য ও গন্ধ উইলসনের ভালো লাগছে। পেছনের দুটো মেয়ে পুরুষের কথা ভুলেই গেছে উইলসন। ও এখন বুনো মোষের কথা ভাবছে। দিনের বেলা বুনো মোষগুলো জলার কাদায় ডুবে থাকে, সেখানে

ওদের গুলি করা শক্ত। কিন্তু রাত্রের দিকে ওরা ফাঁকামাঠে ঘাস খেতে বেরোয়। যদি গাড়ীটা জলাভূমি ও ফাঁকা মাঠের মাঝখানে নিয়ে যাওয়া যায়, ম্যাকমবার বুনো মোষ শিকারের একটা ভালো সুযোগ পাবে। এখন ম্যাকমবারের সঙ্গে জঙ্গলের ভেতরে শিকারে যেতে চায়না উইলসন। সে এখন ম্যাকমবারের সঙ্গে আদৌ শিকারে যেতে চায় না। তবে সে পেশাদার শিকারী এবং এর আগেও অনেক অদ্ভুৎ ধরনের লোকের সঙ্গে শিকার করেছে।

যদি আজ বুনো মোষ শিকার করা যায়, বাকী থাকবে শুধু গণ্ডার, আর কোন বিপজ্জনক জন্তু শিকার করতে হবে না বেচারাকে। তখন হয়তো ঝামেলাটা মিটে যাবে। ওর মেয়ে মানুষটার সঙ্গে আর শোবেনা উইলসন। হয়তো ম্যাকমবার এই ব্যাপারটাও ভুলে যাবে। বেচারা! বিবাহিত জীবনে কতোবার হয়তো ওকে এ ধরনের ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বেচারা! এতোদিন ও নিশ্চয় স্ত্রীর ব্যাভিচারের ব্যাপারগুলো ভোলার কোন রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। যাইহোক, হতভাগার নিজেরই দোষ।

সে, রবার্ট উইলসন, সফরিতে বেরোলে একটা ডবল সাইজ খাটিয়া সঙ্গে রাখে। হাওয়ায় ঝরে-পড়া ফুল-পাতার মত যদি কোন মেয়ে-মানুষ এসে শুতে চায়, সে আপত্তি করে না। যে ক্লায়েন্টরা পয়সা দিয়ে তাকে পেশাদার শিকারী হিসেবে ভাড়া করে—আন্তর্জাতিক, অনিয়ন্ত্রিত জীবনে অভ্যস্ত, খেলাধূলোয় উৎসাহী—ওদের,মেয়েমানুষদের ধারা, শ্বেতকায় শিকারীর খাটিয়ায় শুয়ে সহবাস না করলে তারা তাদের পয়সার পুরো দাম পাচ্ছে না। এই রকম মেয়ে মানুষের থেকে যে যখন সে দূরে যায়, ওদের কথা ভাবলে তার ঘেন্না হয়। অথচ ওদের কারো কারো সঙ্গে শুতে তার ভালোই লেগেছে।, কিন্তু ওদের পয়সাতেই তার জীবিকা চলে এবং যতোক্ষণ ওরা তাকে শিকারী হিসেবে ভাড়া দিতে তৈরী, ওদের জীবনের মানই তারও জীবনের মান।

সব ব্যাপারেই তাই। শুধু শিকারের ব্যাপার ছাড়া। শিকারের ব্যাপার উইলসনের একটা নিজস্ব মান আছে, যারা সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী চলতে রাজী, তারা উইলসনের সঙ্গে শিকার করতে পারে। যারা পারবে না, তারা যেন অন্য পেশাদার শিকারী বেছে নেয়। সে জানে শুধু এইজন্যেই লোকে তাকে সম্মান দেখায়।

এই ম্যাকমবার লোকটা কিন্তু অদ্ভুৎ ধরণের। কিন্তু, ওর বউ? তাই তো, ওর বউ? ওর কথা তুলেই গিয়েছিল উইলসন। সে পেছনে তাকাতেই মারগট হাসলো। ওর স্বামী গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মেয়ে মানুষটার বয়স যেন এক রাতে কমে গেছে।

নিস্পাপ, তরতাজা মনে হচ্ছে। কালকের মতো এখন আর পেশাদার সুন্দরী নয়। ওর মনে কি আছে, ঈশ্বরই জানেন। গত রাতে মেয়ে মানুষটা বেশী কথা বলেনি। যে মেয়ে মানুষ কথা কম বলে, তার সঙ্গে শুতে ভালোই লাগে উইলসনের।

মোটর গাড়ী চড়াই বেয়ে ওঠে। গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে ঘাসে ঢাকা প্রেয়ারির মতো ফাঁকা জায়গায় আসে, গাছের ছায়ার তলায় ঘাস ঢাকা জমির একধার দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে ড্রাইভার। গাড়ী থামিয়ে দূরবীনে চোখ রাখে উইলসন। তারপর সে হাত নেড়ে আবার ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে বলে। শুয়োর-খোঁড়া গর্ত এড়িয়ে প্রকাণ্ড উই টিপিগুলোর পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ী চলে। সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে উইলসন বলে, 'বাই গড, ওই তো।'

এবং গাড়ীটা লাফাতে লাফাতে চলে, সোয়াহিলি ভাষায় ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে উইলসন, ম্যাকমবার দেখছে, তিনটে প্রকাণ্ড কালো জানোয়ার, দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রকাণ্ড রোলারের মতো—যেন তিনটে কালো সাঁজোয়া গাড়ী, তৃণভূমির দূর প্রান্ত থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে। শক্ত ঘাড়, নিরেট শরীর, একই সঙ্গে সামনের পেছনের পা তুলে ছুটছে বুনো মোষ।

ওদের মাথার প্রকাণ্ড চওড়া কালো বাঁকা শিংগুলো মাথা থেকে উঁচিয়ে আছে। লাফাবার সময় ওরা মাথা নাড়ছে।

'তিনটেই মদ্দা মোষ। ওরা জল জঙ্গলে নামার আগেই গুলি করতে হবে।'

খোলা মাঠ দিয়ে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল স্পীডে এবড়ো খেবড়ো মাটির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে গাড়ী ছুটছে। ম্যাকমবারের চোখে বুনো মোষ তিনটে ক্রমশঃ বিশাল। প্রকাণ্ড একটা মদ্দা মোষের ঘাড়ের লোমহীন ধূসর চামড়া, শিংএর চকচকে কালো দেখা যাচ্ছে। অন্য মোষগুলোর একটু পেছনে বুড়ো মদ্দাটা লাফিয়ে চলেছে। গাড়ীটা রাস্তা পার হতে যেয়ে আবার লাফালো, ওরা মোষটার আরও কাছে এল, দ্রুতগামী সেই বিশালতা কাছ থেকে দেখতে পেলো ম্যাকমবার, লোমহীন ধূসর চামড়ায় ধুলো, শিংএর চাওড়া বাইরের দিকটা ও নাকের চাওড়া ফুটো ফুটো দেখতে দেখতে রাইফেল তুলছিল ম্যাকমবার।

'ইউ ফুল, গাড়ী থেকে গুলি করে কেউ শিকার করে না,' উইলসন চেঁচায়।

এবং এখন আর উইলসনকে ভয় পায় না ম্যাকমবার, শুধু ঘেন্না করে। এবং যখন গাড়ী ব্রেক কষছে, চাকা স্কিড করছে, গাড়ীর একদিক থেকে লাফিয়ে পড়েছে উইলসন, আর একদিক থেকে ম্যাকমবার। গুঁড়িয়ে যাওয়া মাটিতে হোঁচট খেতে খেতে বুনো মোষটাকে গুলি করে ম্যাকমবার। এবং বুনো মোষ পালাতে চায়। ছুটতে ছুটতে গুলি করে চলেছে, ম্যাকমবার, শেষ পর্যন্ত তার মনে পড়ে, কাঁধে গুলি করার কথা, রাইফেলে আবার গুলি ভরতে যেয়ে সে দেখে, বুড়ো মোষটা মাটিতে পড়ে গেছে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেছে পালের গোদা, পালের অন্য দুটো সাদা মোষ পালাচ্ছে, সামনের মোষটাকে গুলি করে ম্যাকমবার। সে আবার গুলি করে, গুলি মোষের গায়ে বেঁধেনি।

ক্যারাওয়াং! উইলসন স্যুট করছে। সামনের ষাঁড়টা নাক গুঁজে মাটিতে পড়েছে।

'তিন নম্বর মোষটাকে গুলি করো', উইলসন চেঁচাচ্ছে, 'সাবাস, তুমি শিকার শিখেছো।'

কিন্তু অন্য মোষটা লাফিয়ে ছুটছে, ম্যাকমবারের গুলি টার্গেট ফসকায়, বুলেটের ঘায়ে ধুলোর ঝড় ওঠে উইলসন গুলি করে, ফসকায়, ধুলো মেঘের মত আসে। উইলসন চেঁচায়, 'গাড়ীতে ওঠো। ও দূরে চলে যাচ্ছে। এবং উইলসনের হাত চেপে ধরে গাড়ীতে লাফিয়ে ওঠে ম্যাকমবার। এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপরে গাড়ী চলছে, উইলসন আর ম্যাকমবার গাড়ীর দরজা থেকে ঝুলছে, ভারী-ঘাড় ভারী-শরীর বুনো মোষ সামনে ছুটছে।

ম্যাকমবার রাইফেলে গুলি ভরছে, ফাঁকা শেল মাটিতে ছুঁড়ছে। রাইফেল জ্যামড, জ্যাম সাফ। গাড়ী এখন মোষের পেছনে থামাও, উইলসন চেঁচাচ্ছে। গাড়ী প্রায় উল্টে যায়, চাকা স্কিড করে, সামনে উল্টে পড়ে ম্যাকমবার প্রকাণ্ড কালো মোষটার পেছনে গুলি করে, আবার গুলি করে, আবার, আবার!

মোষটা তবু থামে না। তারপর উইলসন গুলি করে, রাইফেলের শব্দে কানে তালা লাগে, মোষটা একদিকে হেলে পড়ে। সাবধানে টার্গেটে চোখ রেখে এবার গুলি করে ম্যাকমবার। মোষটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

'চমৎকার', উইলসন বলে, 'তিনটেই খতম'। ম্যাকমবারের রক্তে মাতাল উল্লাস।

'তুমি কবার গুলি করেছো?

'তিনবার', উইলসন বলে, 'প্রথম মদ্দাটাকে তুমি মেরেছো। আর ছুটোকে মারতে আমি তোমাকে শুধু সাহায্য করেছি। আমার ভয় ছিল, ওরা জলজঙ্গলে ঢুকে পড়বে। তুমি শিকার করেছো, আমি সাহায্য করেছি। তুমি চমৎকার গুলি করছিলে।'

'গাড়ীতে চলো। মদ খাবো।'

'আগে ওই মোষটাকে খতম করো।'

হাঁটু গেড়ে বসেছে আহত বুনো মোষ, প্রকাণ্ড মাথার শিং দুটো দোলাচ্ছে, ওদের দেখে শূয়োরের মত কুৎসিৎ চোখে তাকায়, প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে ওঠে।

'ও যেন উঠতে না পারে', উইলসন বলছে, 'ঘাড়ে, কানের ঠিক পেছনে গুলি করো।'

সাবধানে আবার টার্গেট ঠিক করে রাখে দুলে ওঠা প্রকাণ্ড ঘাড়টার ঠিক মাঝখানে গুলি করে ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবার। গুলির শব্দের সঙ্গে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

'খতম'—উইলসন বলে ওঠে, 'গুলিতে ওর মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। এগুলো দেখতে কি ভয়ংকর, তাই না?'

'চলো, মদ খাওয়া যাক', ম্যাকমবার বলে। 'জীবনে এতো আনন্দ কোনদিন পাইনি।'

গাড়ীতে ফ্যাকাসে মুখে বসে আছে ফ্যান্সিস ম্যাকমবারের বউ। 'ডার্লিং, মারভেলাস', মেয়েমানুষ বলছে, 'উঃ, গাড়ীটা আর একটু হলে—'

'কষ্ট হয়েছে?' উইলসন জানতে চায়। 'ভয় পেয়েছি, জীবনে এতো ভয় কখনও পাইনি।'

'মদ খাওয়া যাক', ম্যাকমবার বলে।

'প্রথমে মেমসাহেবকে দাও।'

ফ্ল্যাস্ক থেকে গলায় নির্জলা হুইস্কি ঢেলে একটু কেঁপে ওঠে মার্গট। ফ্ল্যাস্কটা ওর হাত থেকে ম্যাকমবারের হাতে, তারপর উইলসনের হাতে।

'ভয় আর উত্তেজনায় আমার মাথা ধরে গেছে', মেয়েমানুষ বলছে, 'গাড়ী চড়ে শিকার করা চলে, আমি আগে জানতাম না।'

'গাড়ী থেকে কেউ গুলি করেনি', ঠাণ্ডা গলায় বলে উইলসন।

'গাড়ী চড়ে তাড়া করেছো।'

'সাধারণতঃ করিনা। কিন্তু পায়ে হেঁটে শিকার করার চাইতে এই এবড়ো খেবড়ো জমিতে গাড়ী চালিয়ে শিকার করতে যেয়ে বেশী ঝুঁকি নিয়েছি আমরা। আমরা যতোবার গুলি করেছি, ঠিক ততোবার মোষ আমাদের দিকে ছুটে আসতে পারতো। মোষকে আমরা লড়বার সুযোগ দিয়েছি। তবে কাজটা বে-আইনী।'

'কাজটা অন্যায়। নিরীহ জন্তুগুলোকে গাড়ীতে তাড়া করে খুন করা।'

'তাই নাকি?'

'নাইরোবিতে ওরা শুনলে কি বলবে?'

'আমার লাইসেন্স কেড়ে নেবে', গলায় আরও খানিকটা নির্জলা মদ ঢালে উইলসন।

'আমার ব্যবসা বন্ধ হবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

বাঃ, এই প্রথম হাসে ম্যাকমবার, 'এবার মার্গট। তোমাকে ব্ল্যাকমেল করার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছে।'

'ফ্র্যান্সিস, তুমি এতো সুন্দর কথা বলো', মার্গট ম্যাক ার বলে।

'আমাদের বন্দুক-বওয়া নিগ্রো বয়দের একজন পেছনে পড়ে আছে', উইলসন প্রসঙ্গ বদলায়, 'ওই তো আসছে। প্রথম মোষটা শিকারের সময় ও বোধহয় পেছনে রয়ে গিয়েছিল।'

বন্দুক বওয়া নিগ্রো লোকটা মাঝবয়সী, টিউনিক, খাকী শার্টস, পায়ে রবারের চপ্পল। লোকটার মুখে বিষণ্নতা আর বিরক্তি। কাছে এসে সোয়াহিলিতে কথা বলে নিগ্রো গান বেয়ারার।

শ্বেতকায় পেশাদার শিকারীর মুখের ভাব বদলে যায়।

'ও কি বললো?' মার্গট জানতে চায়। 'ও বলছে, প্রথম যে মদ্দা মোষটাকে আমরা গুলি করেছি, সে মরেনি, আহত ঝোপে ঢুকেছে।

'ওঃ', ম্যাকমবারের মুখে অনুভূতির রেখা জাগে।

'তুমি সিংহের মুখোমুখি হতে যা ঘটেছিল, তাই আবার ঘটবে', জঘন্য মেয়েমানুষটা প্রত্যাশার আনন্দে খুশী।

'সিংহের মুখোমুখি যা ঘটেছিল, তা আর ঘটবে না', উইলসন মেয়েমানুষটাকে বলে, তারপর ফ্রান্সিসের দিকে ঘুরে বলে, 'আর একটু মদ খাবে?'

'থ্যাঙ্কস।' ম্যাকমবার ভেবেছিল, সিংহের মুখোমুখি হতে হবে শুনে যেমন ভয় পেয়েছিল, তেমনি ভয় পাবে সে। কিন্তু না। জীবনে এই প্রথম, ভয় তাকে ছেড়ে গেছে।

শুধু উত্তেজনার আনন্দ।

ওরা তিনজন হেঁটে যায়। যেখানে খোলা মাঠে প্রকাণ্ড কালো শরীর বিছিয়ে চওড়া শিং মেলে ভুঁদস্কর মোষটা মরে পড়ে আছে।

'মাথাটা বাঁধালে চমৎকার দেখাবে', উইলসন বলে, 'দুটো শিংএর ডগার মধ্যে দূরত্ব পঞ্চাশ ইঞ্চির কম নয়।'

খুশী হয়ে, মোষটাকে দেখছে ফ্রান্সিস। 'বিচ্ছিরি দেখতে, মার্গট বলছে, 'ছায়ায় চলো।'

'হ্যা নিশ্চয়ই। ম্যাকমবার, ওই ঝোপটা দেখছো?' গান বেয়ারার বলছে, প্রথম মোষটাকে গুলি করে আমরা যখন গাড়ী ছোটাই, ও গাড়ী থেকে পড়ে যায়। তারপর ও দেখে, প্রথমে মোষটা মরেনি, উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ও প্রাণ ভয়ে পালায়। মোষটা আস্তে আস্তে ওই ঝোপের ভেতর ঢুকেছে।'

'চলো না ওকে খতম করবো,' উৎসুক হয়ে বলে ম্যাকমবার।

উইলসন খুশী হয়ে ওর দিকে তাকায়। অদ্ভুত মানুষ। কাল এই লোকটা সিংহের ভয়ে কাঁপছিল। আজ লোকটা আগুন গিলে খেতে পারে।

'একটু দাঁড়াও।'

'প্লীজ, ছায়ায় চলো,' মেয়ে মানুষটার মুখ ফ্যাকাশে। ওকে অসুস্থ

'দেখাচ্ছে।

প্রকাণ্ড ছায়া ছড়ানো মহীরুহের নীচে দাঁড় করানো গাড়ীতে তিনজনে উঠে বসে।

''হয়তো মোষটা মরেই গেছে। একটু পরে আমরা ঝোপে ঢুকে দেখবো।'

ম্যাকমবার অনুভব করে এক বন্য অহেতুক সুখের শিহরণ, যা আগে কোনদিন তাকে ছুঁতে পারেনি।

'বাই গড, ওদের তাড়া করতে করতে এতো ভালো লাগছিলো, এতো আনন্দ আমি কোনদিন পাইনি। মারভেলাস, তাই না মার্গট?'

'আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

'কেন?'

'আমাব অসহ্য লাগছে।'

'আমি আর কোনদিন কিছুকে ভয় পাবো না, উইলসনকে বোঝাচ্ছে ম্যাকমবার, 'প্রথম মোষটা দেখার পর থেকে আমার ভেতরে কি যেন একটা হল। যেন একটা নদীর বাঁধ ভেঙে গেল। শুধু বিশুদ্ধ উত্তেজনার প্রবাহ'।

'লিভার সাফ করার মতো'—উইলসন বলে, 'লোকের জীবনে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।' ম্যাকমবারের মুখ চকচক করছে। সে বলে, 'জানো, আমার ভেতরে কিছু একটা হয়েছে, আমি বদলে গেছি।'

তার স্ত্রী কিছু বলছে না, আশ্চর্য্য চোখে তাকে দেখছে।

'জানো উইলসন, আমি আবার একটা সিংহ শিকার করবো। আর আমি ওদের ভয় পাবো না। ধরো, সিংহ আমার কিইবা করতে পারে?'

''ঠিক বলেছো, উইলসন বলে, 'সিংহ তোমাকে বড় জোর মেরে ফেলতে পারে। শেক্সপীয়ার কি যেন বলেছিল? এক কালে আমি কোটেশনটা প্রায়ই আওড়াতাম: 'আমি ভয় করি না, কেন না

একজন মানুষ জীবনে একবারই মরতে পারে। মৃত্যু ঈশ্বরের কাছে মানুষের ঋণশোধ এবং যা ঘটছে, ঘটছে দাও, কেন না এ'বছরে, যে মানুষ মরেছে আগামী বছরে সে মরবে না।' জাম ফাইন···'

···অনেকগুলো কথা, যে বিশ্বাস নিয়ে সে বেঁচে আছে, সেই বিশ্বাসের কথা বলে ফেলে উইলসন এখন দারুণ লজ্জিত। পুরুষ কেমন করে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে, সে আগেও দেখেছে। দৃশ্যটা তাকে অভিভূত করে। কেননা সে জানে একুশ বছর বয়স হলেই মানুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় না।

অদ্ভুত একটা চান্স, শিকার, আগে থেকে ভয় পাওয়ার সুযোগ না পেয়েই উত্তেজনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, ম্যাকমবারের মধ্যে এই পরিবর্তন এনেছে।

'কিন্তু যে ভাবেই ঘটুক, ও বদলে গেছে। এখন বেচারার দিকে তাকিয়ে দেখো ?'

এই মার্কিন পুরুষগুলো অনেকে সারাটা জীবনই বাচ্চা ছেলের মত থেকে যায়।

পঞ্চাশ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত ওদের বাচ্চা ছেলের মতো দেখায়। মহান অ্যামেরিকান বালকপুরুষ। কিন্তু আজকের ম্যাকমবারকে তার ভালো লাগছে। ব্যাভিচারিণী স্ত্রী ওকে আর তাঁবুতে রাখতে পারবে না। ভালোই হবে। সারা জীবন বেচারা শুধু ভয় পেয়েছে। কি ভাবে শুরু হয়েছিল ভয়, কে জানে। কিন্তু আজ ভয়ের শেষ। পৌরুষের শুরু। জীবনের প্রথম যৌন সঙ্গমের চেয়েও বড় অভিজ্ঞতা। যেন সার্জিক্যাল অপারেশন করে ভয়কে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভয়ের বদলে নতুন কিছু। পুরুষের সম্বল। পৌরুষ। পৌরুষ ছাড়া পুরুষের কি আছে ? পৌরুষই পুরুষকে পুরুষ হতে শেখায়।

ম্যাকমবার নিজেও বুঝতে পেরেছে। আর ভয় নেই।

সীটের কোণে বসে মার্গারেট ম্যাকমবার দুটো পুরুষকে দেখছে। উইলসন বদলায়নি। আগের দিন, যখন সে প্রথম বুঝেছিল,

উইলসনের মহান প্রতিভার উৎস কি, তেমনই আছে উইলসন। কিন্তু তার স্বামী ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবার বদলে গেছে।

'কি ঘটতে চলেছে ভেবে তুমি সুখ পাচ্ছো না?' ম্যাকমবার তার নতুন অস্তিত্বকে চিনতে চায়।

'কাউকে বলতে নেই। বরং ভান করতে হয় যেন তুমি ভয় পেয়েছো। সেটাই ফ্যাশনেবল। অবশ্য মাঝে মাঝে তুমি সত্যিই ভয় পাবে'।

'কিন্তু বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তুমি সুখ পাও?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এই নিয়ে কথা বলতে নেই।'

'তোমরা দুজনেই আজে বাজে বকছো। গাড়ীতে চড়ে অসহায় জন্তুদের তাড়া করে মেরেছো বলে কি তোমরা হীরো হয়ে গেছো?' মেয়ে মানুষটা খিঁচিয়ে ওঠে।

'সরি, আমরা গ্যাস দিচ্ছিলাম', উইলসন বলে।

'যা বোঝোনা, তাই নিয়ে কথা বলতে এসো কেন?'—ফ্যান্সিস ম্যাকমবার তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি হঠাৎ যেন খুব সাহসী হয়ে উঠেছো।' বিদ্রূপের ভান করছে মেয়ে মানুষ। আসলে সে ভয় পেয়েছে।

'হ্যাঁ, আমি আমার সাহস খুঁজে পেয়েছি।' ম্যাকমবার হেসে ওঠে।

'বড়ো দেরীতে নয়?' তেতো গলায় বলে মার্গট। কেননা অনেক বছর আগে সেও চেষ্টা করেছিল, তার স্বামী সাহসী হোক। আজ তাদের সম্বন্ধটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা তার একার দোষ নয়।

'না, আমার পক্ষে দেরী হয়নি।,

সোয়াহিলি ভাষায় গান বেয়ারারদের ডাকছে উইলসন। মোষের মাথার চামড়া ছাড়াতে ছাড়াতে উঠে দাঁড়ায় মাঝ বয়সী গান বেয়ারার, পকেট থেকে এক বাক্স ধাতুর জ্যাকেটে মোড়া কার্তুজ বার করে ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবারের হাতে সে তুলে দেয়। রাইফেলের ম্যাগাজিনে গুলি ভরে বাকী শেলগুলো পকেটে রাখে ম্যাকমবার।

"তুমি স্প্রীংফিল্ড থেকেই গুলি করো, তুমি ওতেই অভ্যস্ত। ম্যান-ফিচারটা গাড়ীতে মেমসাহেবের সঙ্গে থাক। তোমার গান বেয়ারার ভারী বন্দুকটা বইবে। আমার কাছে থাকবে এই হতচ্ছাড়া কামানটা। এবার আহত মোষ শিকারের ব্যাপারে তোমাকে কিছু বললো।—শেষ মুহূর্তের আগে কথাগুলো বলেনি উইলসন কেননা ম্যাকমবার ঘাবড়ে যাক, সে চায়নি।

যখন আহত মোষ ছুটে আসে, ওর মাথাটা উঁচু হয়ে থাকে, শিংএর ধাক্কা বাইরের দিকে লাগবে। সোজা নাকে গুলি বেঁধাতে পারলে মোষ মরবে। আর একটা জায়গা ওর বুক। যদি পাশে ঘুরে যেতে পারো, ঘাড় কিম্বা কাঁধ। গুলি লাগার পরেও ওরা সহজে মরে না। কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নেবে না, যেখানে গুলি বেঁধানো সবচেয়ে সোজা সেখানেই মারবে

ফাঁকা জায়গা দিয়ে গাড়ীটা চলেছে ঝোপের দিকে। একটা শুকনো নালার ধারে একসারি ঝোপঝাড়ের পাতা জিভের মত লকলক করছে, ম্যাকমবারের হৃৎপিণ্ড ধক ধক্ করছে, ওর গলা শুকনো কিন্তু ওবার আর ভয় নয়, খুবই উত্তেজনা।

'ওইখানে মোষটা ঝোপের ভেতরে ঢুকেছে,'—উইলসন বোঝায়। তারপর বন্দুকবাহক কোংগানির দিকে ঘুরে সোয়াহিলি ভাষায় বলে, রক্তের দাগ খোঁজো।

ঝোপের সমান্তরাল দাঁড়িয়ে আছে গাড়ীটা। ম্যাকমবার, উইলসন ও কোংগানি নেমেছে। ম্যাকমবার একবার পেছনে ফিরে দেখেছে, তার স্ত্রী, পাশে রাইফেল, গাড়ীতে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে স্ত্রীর দিকে হাত নাড়ে। জবাবে মার্গারেট কোন সাড়া দেয় না।

ঝোপঝাড়, ঘন বন, শুকনো মাটি। মাঝবয়সী বন্দুকবাহকের ঘাম ঝরছে। চোখের ওপরে হ্যাটটা টেনে নামিয়েছে ম্যাকমবার। ওর সামনে উইলসনের লালচে ঘাড়। হঠাৎ সোয়াহিলি ভাষায় কি যেন বলে ছুটে গেল নিগ্রো গানবেয়ারার কোংগনি।

মোষটা মরে পড়ে আছে, উইলসন বললো, 'গুডওয়ার্ক! ও ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাকমবারের হাতে হাত রাখে। দুজনে হাসতে হাসতে হ্যাণ্ডসেক করছে। হঠাৎ প্রচণ্ড চীৎকার করে ওঠে বন্দুকবাহক।

'বুনো মোষটা মরেনি।'

আহত মোষ নাক উচিয়ে মুখ বন্ধ করে কাঁকড়ার মতো দ্রুত ছুটে আসছে। বন্ধ মুখের ধার থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, প্রকাণ্ড মাথাটা উঁচু হয়ে আছে।

বুনো মোষ ছুটে আসছে, ছোট চোখ দুটোয় ওদের দেখছে, চোখ দুটো রক্তের মত লাল।

সামনে ছিল উইলসন। সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি ছুঁড়ছে। ম্যাকমবারও গুলি করছে, কিন্তু উইলসনের রাইফেলের গর্জনে সে নিজের বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় না। কালো চওড়া শিংএর কয়েকটা টুকরো শ্লেট পাথরের মত ভেঙে পড়ে, সে মোষের নাকের চওড়া ফুটো দুটো টার্গেট করে গুলি করে, আবার শিংএ লাগে, আবার শ্লেটের মত শিংএর টুকরো ওড়ে এবং এবার সে আর উইলসনকে দেখতে পায় না। টার্গেটে চোখ রেখে সে সাবধানে গুলি করে, মোষটা তার প্রায় গায়ের ওপরে এসে পড়েছে, তার রাইফেলের নল প্রকাণ্ড শিঙের মাথাটার একেবারে সোজাসুজি। সে কুৎসিত চোখ দুটো দেখতে পায়, সামনের প্রকাণ্ড মাথাটা নীচু হতে শুরু হয়। ঠিক তখনই ·

ফ্র্যান্সিস ম্যাকমবারের মাথার মধ্যে হঠাৎ আগুনে ঝলসানো সাদা উত্তপ্ত কিছু একটা ফেটে যায়। আর কিছু সে কোনদিন বুঝতে পারেনি।

ঘটনা কি ঘটেছে?

উইলসন পাশে সরে যেয়ে মোষের কাঁধে গুলি করেছে। ম্যাকমবার তার নিজের জায়গা ছেড়ে এক ইঞ্চি সরেনি, প্রত্যেকবার গুলি বিঁধছে মোষের শিংএ, শ্লেটের ছাদে গুলি বিঁধলে যেমন হয়, শিংএর টুকরো-

গুলো গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে ছিটকে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মিসেস ম্যাকমবার...

গাড়ীতে বসে মিসেস ম্যাকমবারের নাকি মনে হয়েছিলো, মোষটা তাঁর স্বামীকে গুঁতিয়ে দেবে, তাই তিনি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ম্যানলিচার রাইফেল থেকে মোষকে গুলি করেছিলেন। গুলিটা তাঁর স্বামীর মাথার পেছনে বিঁধেছে।

মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ফ্রান্সিস ম্যাকমবার। চার হাত দূরে বুনো মোষ একধারে হেলে পড়ে আছে। ম্যাকমবারের বউ তার স্বামীর শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। মেয়েমানুষটা হিস্টিরিয়া রোগীর মত কাঁদছে।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে উইলসন, পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে ফ্রান্সিস ম্যাকমবারের ক্রু-কাট চুলে ঢাকা মাথাটা ঢেকে দেয়। শুকনো মাটির ওপরে গড়িয়ে যায় মানুষের রক্ত।

তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে মরা মোষটার দিকে তাকায়। ওর পা দুটো ছড়ানো, পেটে লোম নেই, অনেক এঁটুলি পোকা চলে বেড়াচ্ছে। সুন্দর মোষ, ওর মনে হয়, দুটো শিং-এর দূরত্ব পঞ্চাশ ইঞ্চি? না তারও বেশী?

সে ড্রাইভারকে বলে, ফ্যান্সিসের শরীরের ওপরে একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে ওর পাশে থাকতে। তারপর সে মোটর গাড়ীতে যে মেয়ে-মানুষটা এক কোণে বসে কাঁদছে তার পাশে উঠে বসে।

'তোমার কাজের প্রশংসা করতে হয়।'

'বেঁচে থাকলেও তোমাকেও ছেড়ে যেতো।'

'স্টপ ইট।'

'লোকে জানবে, এটা অ্যাক্সিডেন্ট। একটু ঝামেলা হবে। তবে আমি কয়েকটা ফটো তুলবো, যেগুলো প্রমাণ করবে, তুমি নির্দোষ। ড্রাইভার এবং গানবেয়ারারাও বলবে, এটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'তোমার কোন ভয় নেই।'

'ষ্টপ ইট।'

'অনেক ঝামেলা। ওয়্যারলেস্ মেসেজ পাঠিয়ে প্লেন আনাতে হবে, নাইরোবি যেতে হবে। গুলি করে খুন না করে তুমি ওকে বিষ দিয়ে খুন করলে ঝামেলা কম হতো। ইংল্যাণ্ডের মেয়েমানুষরা তাই করে।'

'ষ্টপ ইট! ষ্টপ ইট!' মেয়েমানুষ কাঁদে।

পুরুষ উইলসন সমতল নীল চোখে ওকে দেখে। বলে—'আমি আর কিছু বলবো না। আমার একটু রাগ হয়েছিল। তোমার স্বামীকে আমি পছন্দ করতে শুরু করেছিলাম।'

'ওঃ, প্লীজ, প্লীজ ষ্টপ ইট—'

'আগের চেয়ে ভালো,' উইলসন বলে, 'প্লীজ বলা অনেক ভালো। এবার আমি থামবো।'

* * *

লুইজি পিরানদেল্লো

১৯৩৪-এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ইতালিয়ান লেখক লুইজি পিরানদেল্লো। ১৮৯৪ ও ১৯১২র অন্তবর্তী সময়ে লেখা পিরানদেল্লোর অধিকাংশ ছোট গল্পের বিষয় ইতালীর মধ্যবিত্ত জীবন। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ নাটকে। শ্রেষ্ঠ নাটক 'দ্য ম্যান উইথ দ্য ফ্লাওয়ার ইন হিজ মাউথ' এবং 'হেনরী ফোর।' আর একটি প্রসিদ্ধ নাটক 'নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র' বাংলা রূপান্তরে অভিনীত ও সমাদৃত হয়েছে।

বন্ধু

লুইজি পিরানদেল্লো



হাতাবিহীন পুরোনো ঢিলে জামাটা গলা অবধি জড়ালো গিগি মীয়ার। বয়স যখন চল্লিশ পেরোয়, তখন উত্তুরে হাওয়া নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে না। নাক অবধি রুমালে ঢাকা, হাতে দস্তানা, ভালো খাওয়ার দরুণ মসৃণ ও মোটাসোটা চেহারা—গিগি মীয়ার লানগো তেভেরে দ্য মেলিনির রাস্তায় ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছে। ট্রাম থেকে সে নামবে কোর্তে দ্য কোনতি-র সামনে। সেখানে সে চাকরী করে।

জন্মসূত্রে সে কাউন্ট। কিন্তু কাউন্টিও নেই টাকা পয়সাও নেই। ছোটবেলায় সে যখন তার বাবাকে সরকারী চাকরীতে ঢোকার উচ্চাশার কথা বলতো, সে জানতোনা যে কোর্তে দ্য কোনতি আসলে কাউন্টদেরই কোর্ট, যেখানে প্রত্যেক কাউন্টই ঢুকতে পারে।

সবাই তো জানে যে ট্রামের জন্যে তুমি যখন দাঁড়িয়ে আছো, ঠিক তখনই ট্রাম কখখনো আসেনা। হয় কারেন্ট নেই, লাইনে বিজলী আসছেনা বলে ট্রাম থেমে গেছে। নয়তো ঠেলাগাড়ীর সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট বাঁধিয়েছে। নয়তো কোন বেচারাকে চাপা দিয়েছে। তবু সব দিক থেকে ভেবে দেখতে গেলে ট্রামের অনেক গুণ।

সেদিন সকালবেলা বরফঠাণ্ডা ধারালো উত্তুরে হাওয়া বইছে। পা টুকতে টুকতে নদীর দিকে তাকাচ্ছে গিগি মীয়ার। নদীর রং ধূসর। যেন বেচারা নদীরও ঠাণ্ডা লাগছে। যেন নদী স্রেফ সার্ট পরে আছে। নতুন বাঁধের রঙচুট দেয়ালের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শীতের ধূসর নদী।

অবশেষে ডিং-ডং করতে করতে ট্রাম এলো। থামলোনা। লাফিয়ে ট্রামে উঠতে যাবে গিগি। ঠিক এমন সময় কে যেন ডাকলো।

'গিগি, ওল্ড ম্যান! গিগি!'

পেছনে তাকিয়ে গিগি দেখে, এক ভদ্রলোক ছুটে আসছে! হাত দুটো দোলাচ্ছে টেলিগ্রাফের পোষ্টের মত। ট্রামটা চলে গেলো। সান্ত্বনা এইটুকু যে অচেনা সেই ভদ্রলোক গিগিকে জড়িয়ে ধরেছে এবং একজোরে ওর মুখে ঢাকা সিল্কের রুমালে দু দুবার চুমু খেয়েছে যে মনে হচ্ছে, খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু।

'গিগি, ওল্ড ম্যান, দেখেই চিনেছি। কিন্তু এ কে? এরই মধ্যে বুড়ো হয়ে যাচ্ছো? চুল সব পেকে গেছে যে? ছি ছি? গিগিওন, ওল্ড ম্যান, চুমু খাও। আমি তো ভাবলাম, তুমি আমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছো। তুমি ট্রামে উঠতে যাচ্ছো দেখে ভাবছিলাম, এ কি বিশ্বাসঘাতকতা!'

'হাঁ, মানে, আমি অফিসে যাচ্ছিলাম।'

'অফিস? ওসব যাচ্ছেতাই কথা বোলোনা।'

'তার মানে?'

'আমি কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছি। তোমার ভাই ভালো আছে। আমাকে একটা পরিচয়পত্র দিচ্ছিলো, বুঝলে? আমি বললাম, মাথা খারাপ? গিগিওন আমাকে চিনবেনা? য়ুনিভারসিটিতে আমরা একসঙ্গে পড়েছি। বিখ্যাত প্রাচীন পাডুয়া য়ুনিভার্সিটি। কি বলো, গিগিওন? সেই প্রকাণ্ড ঘণ্টাটার কথা মনে আছে তো? তুমি শূয়রের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুমুতে। ঘণ্টা বাজলে তুমি ভাবতে,

বুঝি আগুন লেগেছে। পুরোনো দিন কতো ভালো ছিল, তাই না? তোমার ভাই ভালো আছে, আমার সঙ্গে ব্যবসা করছে, ব্যবসার কাজেই এখানে এসেছি। কিন্তু তোমাকে এমন মরা মরা দেখাচ্ছে কেন? তুমি বিয়ে করছো নাকি?

'না, মাই ডীয়ার।'

'করবে?'

'পাগল নাকি? চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেল। এখন বিয়ে? চিন্তা করা যায় না।'

'চল্লিশ, নাঃ, পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই তোমার এক অদ্ভুৎ স্বভাব, গিগিওন—ঘন্টার শব্দ বা বয়স—তুমি সময়ে খেয়াল করোনা। পঞ্চাশ, বুঝলে হে, পঞ্চাশ। তোমার জন্ম ···দাঁড়াও, ভেবে দেখি···১৮৫২র এপ্রিল, হ্যাঁ কি না? বারোই এপ্রিল।'

'নাঃ, ১৮৫২র বারোই মে। তার মানে আমার মাত্র উনপঞ্চাশ বছর কয়েক মাস বয়স হয়েছে।'

এখনো বিয়ে করোনি? ভালো করেছো। আমার বউ আছে। ট্র্যাজেডী। লাঞ্চ খাওয়াবে তো? কোথায় খাও? বারবায়?'

'বার্বার কথাও জানো? তুমি গিয়েছো নাকি?'

'আমি যাবো কি করে। আমি তো পাডুয়ায় ছিলাম। আমি তো শুনেছি তুমি ওখানে ফূর্তি-টূর্তি ···'

'দেখো, ওখানে যেতে গেলে ঝিকে বলে যাওয়া ভালো যে বাড়ীতে লাঞ্চ খাবোনা।'

'ঝি? অল্পবয়সী বুঝি?'

'আরে না না, বুড়ী। আমি বছর তিনেক হলো বার্বায় যাইনি। ফূর্তি-টূর্তি সব ছেড়ে দিয়েছি। চল্লিশ বছর বয়স হলো। এখন আর···'

'বেশ, বেশ, এই তোমার বাড়ী? করেছো কি, গিগি? তুমি তাহলে বিশ্বাস কর যে মানুষ একটা ছ'পাওলা জন্তু? গিগিওন, বোলোনা,

বোলোনা, দুপায়ে দাঁড়াতে এক একসময় আমার এতো কষ্ট হয়। প্রকৃতির নিয়ম মানলে আমরা সব চার পেয়ে হয়ে যাবো। তাই সব থেকে ভালো। খুব আরামদায়ক, চমৎকার ব্যালান্স থাকবে। এই ধরো, আমি যদি এখন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটি! এই হতচ্ছাড়া সভ্যতাই তো আমাদের সর্বনাশ করছে। তা নাহলে তুমি জঘণ্য কথা বললে আমি তোমায় লাথি মারতে পারতাম। আমার বউ থাকতোনা, ধার থাকতোনা, ঝামেলা থাকতোনা। নাঃ, মনে হচ্ছে।
'আমি এক্ষুনি কেঁদে ফেলবো...'

এতোক্ষণ ধরে মজাদার ও অদ্ভুত কথাগুলো শুনতে শুনতে মীয়ার ভাবছে, এই যে বন্ধু হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে উদয় হলো, এর নামটা কি? একে কখন থেকে চিনতাম? একেবারে ছোটবেলা থেকে? না, য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে যেয়ে?
সে আমলের পরিচিত ইয়ারদোস্তের কথা মনে করার চেষ্টা করছে গিগি। কিন্তু এই লোকটার চেহারার সঙ্গে মিলছেনা। অথচ লোকটা এতোই বেশী অন্তরঙ্গ যে সরাসরি বলাও যাচ্ছে না, তোমার নামটা কি? নাম জানতে চাইলে অভদ্রতা করা হবে, কি করা যায়? দেখা যাক, চালাকি করে নামটা জানা যায় কিনা।
ঝি অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলতে গিগি বললো—
'গুড গার্ল', আবার ফিরে এলাম। দুজনে লাঞ্চ খাবে, তাড়াতাড়ি রান্না করো। সাবধানে, আমার এই বন্ধু খাওয়ার ব্যাপারে বড্ড পরিপাটী। ওর নামটা খুব অদ্ভুত-
আনখেলোপোফেগাস্ ড্যাগানের দার্ডুর্নিশ পা। ব্যাঙ্ক ডিরেক্টররা আমার নাম শুনলে মুখ বাঁকায়। যারা টাকা ধার দেয়, তারা সহজে মনে রাখতে পারেনা। ফকাৎ শুধু আমার বউ। আমাকে বিয়ে করার ফলে আমার নামটা সে পেয়েছে। তবে শুধু নামটাই, আমাকে নয়। গুড গার্ল, তাহলে জানোয়ারদের জন্যে খড় ভুবি নিয়ে এসো।'

ম্যান্টেলপিসের ফটো দেখতে দেখতে লোকটা বলে—

'গিগিওন, আমার শালা যদি তোমার মতো হতো, খুব ভালো হত। আমার শালা একটা রাস্কেল।'

'কেন, সে কি তোমার বোনার সংগে খারাপ ব্যবহার করে।'

'না হে, আমার সংগে খারাপ ব্যবহার করে।'

তোমার ভাই আমাকে সাহায্য করতে চাইলো। বললো, বিলে আমার শালা সই করলেই চলবে। শালা রাজী হলো না। তোমার ভাই বন্ধু হলেও বাইরের লোক। সে চটে গেলো। এখন অবশ্য সব মিটে গেছে। শালা কেন সই করলো না জানো? দেখতে তো আমি খারাপ নই, তুমি অস্বীকার করবে না নিশ্চয়ই, মেয়েরা আমাকে ...মানে আমার শালার বউ আমাকে ভালবেসে ফেললো। ওর রুচি আছে, তবে বুদ্ধি কম। মানে, ভালোবাসার ব্যথা পেয়ে আমার শালার বউ বিষ খেলো।'

'মরে গেলো?'

'নাঃ। বমি করলো, সেরে গেলো। কিন্তু এই ট্র্যাজেডীর পরে শালার বাড়ী তো আর যেতে পারি না।

উঃ, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে···'

•

খাওয়ার টেবিলে পাড়ুয়ার নানা লোকের প্রসঙ্গ তুলে গিগি ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে, যদি কথার ফাঁকে নিজের নামটা বলে ফেলে তার বন্ধু।

'ভালো কথা, একটা খবর দাও তো। ব্যাঙ্ক অফ ইতালীর ডাইরেক্টর ভ্যালভার্দে—যার বউটা খুব সুন্দর কিন্তু বোনটার চোখ ট্যারা—ওরা কি এখনো পাড়ুয়ায় আছে?'

গিগির প্রশ্নের জবাবে ওর বন্ধু হো হো করে হেসে ওঠে।

'হাসছো কেন? ওর বোনটা ট্যারা না?'

'শুধু ট্যারা ? মহিলার নাকের ফুটোদুটো এত বড় যে মগজ অবধি দেখা যায়। আমি ওকে বিয়ে করছি।'
যেন শক খেয়ে চুপ করে যায় পিপি। বন্ধু হেসেই চলেছে।
'ভাখো, মানুষ জীবনে এমন সব বীরত্বের কাজ করে, কবিরা যা কল্পনায় করতে পারে না।'
'হ্যাঁ মানে, আমি বুঝেছি'।
'না:, কিছু বোঝনি। আমি তো বলির পাঁঠা, আমি বীর হতে যাবো কেন ? বীরত্ব দেখিয়েছিলেন আমার বর্ত্তমান শালার বউ। অর্থাৎ লুসিও ভ্যালভার্দের বউ। নির্বোধ, নির্বোধ !'
'কে, আমি ?'
'না, আমি। আমি নির্বোধের মত ভেবেছিলাম যে লুসিও ভ্যাল-ভার্দের বউ আমাকে এতোই ভালোবাসে যে সে 'লুসিওকে বিয়ে করেছে। অবশ্য এ শাস্তি লুসিওর প্রাপ্য।
কিন্তু পরে কি হলো ? নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একদিন ভ্যালভার্দে বাইরে যাওয়ার ভান করলে। ওর বউ নিশ্চয়ই সব জানতো।
বউটা আমাকে ঘরে ঢোকালো। যখন ভ্যালভার্দের কাছে ওর ও আমার ধরা পড়ার ট্র্যাজিক মুহূর্তটা এলো, ও আমাকে ওর ননদের ঘরে লুকোতে বললো। সেই ট্যারা চোখের মহিলা, লুসিওর বোন সতীসাধ্বী রমণীর মতো কাঁপতে কাঁপতে আমাকে গ্রহণ করে এমন ভাব দেখালেন যেন ভাইয়ের শান্তি ও সম্মানের খাতিরে তিনি আত্মোৎসর্গ করছেন। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—
মাই ডীয়ার লেডী, লুসিও কি করে বিশ্বাস করবে যে আমি আপনার সঙ্গে ··· ব্যাস, কথা শেষ করার আগেই লুসিও লম্ফঝম্প করতে এসে হাজির। তারপর বুঝতেই পারছো।'
'তোমার এতো বুদ্ধি থাকতে—'
'কিন্তু টাকা থায় চাই যে ? ক্রেডিট নোটগুলো বউয়ের কথমেতো

রিনিউ করে দিচ্ছিল লুসিও। আমি রাজী না হলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিত, সই করবেনা। নোংরা চালাকি। মানে, সত্যি কথা বলতে কি, আমার নিজের তো একটা পয়সাও নেই। তাছাড়া বিয়ে করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

'সে কি? তুমি তো লুসিও ভ্যালভার্দের বোনকে বিয়ে করেছো?'

'না, ও আমাকে বিয়ে করেছে। আমি তো বলেছিলাম, 'ইয়ং লেডী, তুমি আমার নামটা চাও, নাও। ওটা নিয়ে কি করতে হবে, আমি নিজেও জানিনা।'

'তাহলে ওর নাম ছিল ভ্যালভার্দে, এখন হয়েছে—'

'ঠিক ধরেছো।'

লোকটা উঠে দাঁড়ায়।

'শোনো, সকালটা চমৎকার কাটলো। একটা উপকার করো।'

'আমার বউকে চাও? ধার হিসেবে?'

'না, ধন্যবাদ। তোমার নামটা বলে যাও।'

'আমি? আমার নাম? তুমি জানোনা? তোমার মনে নেই?

'না, আমি দুঃখিত, ভুলে গেছি, তোমাকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছেনা।'

'ওঃ? ভালো, খুব ভালো। তোমার লাঞ্চ, আমাকে সংগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু নামটা আমি বলবোনা।'

'ড্যাম ইউ। সারা সকালটা ধরে ভাবছি। নামটা বলে যাও।'

'আমাকে মেরে ফেলো, কেটে টুকরো করে ফেলো, বলবোনা।'

'দ্যাখো, আমি আগে কখনো এভাবে কিছু ভুলে যাইনি। অভিজ্ঞতাটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক! ভগবানের দোহাই, তোমার নামটা বলে যাও। দ্যাখো, আমি তোমার নাম মনে না রাখলেও তোমাকে লাঞ্চ খাইয়েছি। তুমি আমার অচেনা হলেও এখন তোমাকে আমার নিজের ভায়ের মতো লাগতো। আমি তোমাকে পছন্দ করি। তোমার নামটা বলে যাও।'

'নাঃ, তুমি তোমার অতিথির নাম জানলেনা। এই মজাটা থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাইনা।'

'তাহলে এক্ষুনি চলে যাও। আমি আর এক মুহূর্ত তোমাকে দেখতে চাইনা।'

'বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু আগে একটা চুমু দাও, গিগি। কালই এখান থেকে চলে যাবো।'

'নাঃ, যদি তুমি নাম না বলো—'

'না, না, গুড বাই!'

হাসতে হাসতে লোকটা চলে যায়। যেতে যেতে সিঁড়ির মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চুমু খাওয়ার ভঙ্গী করে।

* * *



মোসবীর স্মৃতিকাহিনী

সল বেলো

পাখী ডাকছিল। ফুইট, ফুইট, বুটী—ফুইট। এবং পাখীরা যে সব কাজ করে বলে প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেই সব কাজই করছিল। পাখীদের ডাকে আক্রমণাত্মক মনোভাবের চূড়ান্ত খারাপ ধরণটাই ফুটে ওঠে। কিন্তু মানুষ, বোকা মানুষ পাখির ডাকে শোনে নিষ্পাপ নির্মল কিছু। মানুষ সবকিছুকেই ভাবে নিষ্পাপ। কারণ মানুষের পাপ বড়ো ভয়ংকর। হ্যাঁ, খুবই ভয়ংকর!

দুপুরের ঘুম থেকে উঠে মিঃ উইলিস মোসবী পাহাড়ের চূড়া থেকে ওয়াক্সাকা সহরের দৃশ্য দেখছে। সবাই ঘুমুচ্ছে। মানুষের মুখ এবং মানুষের পশ্চাদ্দেশ, মেক্সিকোর ইণ্ডিয়ানদের লম্বা কালো চুল এবং যে চিরায়ত সৌন্দর্য্য সিনেমানির্দেশক আইজেনষ্টাইন তাঁর 'থানডার ওভার মেক্সিকো' নামের চলচ্চিত্রে ফটোগ্রাফির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। মিঃ মোসবী—আসলে ডক্টর মোসবী; বিদ্বান, হয়তো পণ্ডিত; জীবনে অনেক কিছু ভেবেছে, অনেক কিছু করেছে; এবং

বিংশ শতকের মানুষ যে সব ভুল করে, তার মধ্যে অনেকগুলো ভুলই করেছে মিঃ মোসবী। সে ওয়াস্কাকায় এসেছে নিজের স্মৃতিকাহিনী লিখতে। এইজন্যে গুগেনহেইম ফাউণ্ডেশান তাঁকে টাকা দিয়েছে। কেনই বা দেবেনা?

পাহাড়ের ধারে বুগেনভিলিয়ার ফুল ফুটেছিল। হামিংবার্ড পাখীরা উড়ছিলো। এইসব ওড়াউড়ি, ঘোরাঘুরি; এইসব রঙ, গন্ধ মোসবীর ভালো লাগছিলনা। সৌন্দর্য্য খুবই বিপজ্জনক। প্রাণঘাতী। হয়তো লাঞ্চের সময় বড্ড বেশী মেসক্যাল গেলা হয়েছে। সংগে বীয়ারও ছিল। এখন মনে হচ্ছে প্রকৃতির এই লাল ও সবুজের পেছনে যেন বিষাদের কালো রং। আয়নার কাঁচের পেছনে যেমন পারদের পুরু আস্তরণ।

মোসবীর খুব একটা ভালো লাগছেনা। দাঁতে দাঁত চেপে থাকায় রোদের আঁচলাগা, তামাটে, প্রৌঢ় অথচ সুন্দর মুখে চোয়ালের পেশী-গুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। ওর চোখ দুটো সুন্দর, রং নীল, চোখে আলো পড়লে ওর কষ্ট হয়, ওর চোখের দৃষ্টি সোজাসুজি, তাতে বুদ্ধি এবং অবিশ্বাস ফুটে ওঠে। মাথায় এখনও অনেক চুল। মাঝখানে সিঁথি কাটা। দুই ভুরুর মাঝখানে, নাকের নীচে এবং ঘাড়ের পেছনে লম্বা ও গভীর ভাঁজ পড়েছে।

স্মৃতিকাহিনীতে এবার কিছুটা রঙ্গরসিকতা যোগ করার সময় এসেছে। এ পর্য্যন্ত যা লেখা হয়েছে—মিসৌরীর ফানডামেনড্যালিষ্ট পরিবার—বাবা সফল স্থপতি—স্কুল—ষ্টেট য়ুনিভার্সিটি—রোডস্ স্কলারসিপ—বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব—প্রোফেসর কলিংউডের কাছে আমি কি শিখেছিলাম—বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং বৃটিশ বুদ্ধিজীবির মানসিক শক্তি—জন লকের প্রচলিত রীতিবিরোধী মূল্যায়নে আমার ভূমিকা—স্পেনে আমি উইলিয়ম র‍্যানডলফ হার্স্ট-এর হয়ে কাজ করেছি—জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ব্যক্তিত্ব—ন্যুইয়র্কে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে বন্ধুত্ব—ও, এস, এস, এ যুদ্ধকালীন চাকরি—ফ্র্যাংকলিন ডি, রুজভেল্টের দৃষ্টির

সীমাবদ্ধতা—গ্রন্থ ও মার্ক্স-এর নবমূল্যায়ন—স্ত ভকিভীর ভবে আবার ফিরে আসা।

কিন্তু মজার কিছু নেই। অথচ হাজার হাজার ছাত্র ও অন্যান্যেরা বলবে—'মোসবীর রসবোধ ছিল।'

তাদের সন্তানদের তারা বলবে—'ও, এস, এস্-এর সেই মোসবী' কিম্বা 'অ্যালকাজারের পতনের সময় টোলেডোয় আমার সঙ্গে ছিল উইলিস মোসবী, লোকটার কথা শুনে হাসতে হাসতে মরে যাওয়ার জোগাড়' কিম্বা 'হ্যারল্ড ল্যাস্কির সম্বন্ধে' বা 'সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে' বা 'রাশিয়ার বিরোধীদের বিচারের প্রহসন করে ষ্ট্যালিন যেভাবে তাদের খতম করতেন, সে বিষয়ে' বা 'হিটলার প্রসঙ্গে উইলিস মোসবী যা বলেছিল, আমি কখনও ভুলবোনা।'

কিছু একটা করা দরকার। এ ব্যাপারে সে কিছুটা ভেবেছে। সে হোটেলের মেইন্ বিলডিং-এর নীচে ফুলে-ঢাকা কটেজে রয়েছে এবং সিয়েরা মাদ্রের রুক্ষ পাহাড়ের দিকে তাকালে তার হিংসে হয়। একটু পরে ওরা হোটেল-বার থেকে বরফ পাঠাবে। মেসক্যাল ঠাণ্ডা হবে। গরম মেসক্যাল বিশ্রী লাগে। সে লিখবে যে ১৯৪৭ এ যখন সে প্যারীতে ছিল, সে অনেক অদ্ভুৎ লোকের সংস্পর্শে এসেছে। গ্যারী ডেভিস যখন নিজের পাসপোর্ট পুড়িয়ে নিজেকে 'পৃথিবীর নাগরিক' বলে ঘোষণা করলো, তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন কাউন্ট দ্য লা মাইন্-ক্রেইডে। কাউন্টকে চিনতো মোসবী। ইউনেস্কোয় মিষ্টার জুলিয়ান্ হাক্সলীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। মিষ্টার লেভি-ষ্ট্রস্ তার সঙ্গে সামাজিক তত্ব আলোচনা করেছিলেন কিন্তু ডিনারে নিমন্ত্রণ করেননি। জ্যাঁ পল সার্ত্র তার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হননি। সে আসলে ভাবতো, নিগ্রো ছাড়া সব অ্যামেরিকানরাই সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। অন্যদিকে মোসবী সন্দেহ করতো, সব প্রবাসী রাশিয়ানই জি, পি, ইউ-এর স্পাই। মোসবী ফরাসী ও স্পেনিস ভাষা ভালো জানে, জার্মান ভাষাও ভালোই বলে। কিন্তু

ফরাসীরা বিদেশীদের মধ্যে মৌলিকত্ব চিনতে পারে না। প্রাচীন সভ্যতার এই এক অভিশাপ। যেন ওরা এক বেশী ভারী গ্রহের অধিবাসী। যে গ্রহের প্রচলিত সংস্কারের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান থেকে মুক্তি পেতে ওদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের মনের হর্স পাওয়ার বাড়াতে হয়। ওদের মধ্যে খুব কম লোকই বাতাসে ভাসতে পারে। ভাসতে ভাসতে দেকার্তের প্রথাসিদ্ধ ভাবনা থেকে দূরে যেতে পারে। কিম্বা ১৭৮৯ থেকে প্রচলিত বাম, দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের অন্তর্লীন অযৌক্তিকতা থেকে দূরে যেতে পারে। ফরাসীদের পছন্দ করেনি মোসবী। ফরাসীদের চোখে সে রোগা আঁটসাঁট চেহারার মানুষ, সেরা দরজীর হাতে তৈরী স্যুট পরে, ফিটফাট থাকে, পশ্চিমী চামড়ায় সুস্থতার ছাপ, চোখের রং হাল্কা, নাকটা জোরালো, মুখটা সুন্দর, মুখের ভাঁজে পৌরুষের ছাপ। অ্যামেরিকানরা যেমন হয়, তেমনি।

হয়তো দুপক্ষই—মোসবী এবং ফরাসীরা—দুপক্ষই আগে থেকে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণার বশবর্তী হয়েছিল। এবং ইদানীং মোসবী বুঝতে পারছে, দুপক্ষেরই ভুল হয়েছিল। সত্য থেকে দুপক্ষই ছিল সমান দূরত্বে। কিন্তু দুপক্ষের ভুল দু'ধরণের। ফরাসীদের ভুলটাই বেশী খারাপ। কারণ ওরা সম্মিলিতভাবে ভুল করেছিল। মোসবীর নিজের ভুলের মধ্যে বৈশিষ্ট ছিল।

জার্মান আক্রমণে প্যারীর পতন, সামরিক শক্তিনিয়োগে ফরাসীদের ইচ্ছাশক্তির অভাব, জার্মান প্রশাসনের সঙ্গে ব্যাপক সহযোগিতা, ইহুদীদের নির্বাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করা (ডেনমার্কের লোকেরা, এমন কি বুলগেরিয়ানরাও ইহুদীদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল) এবং অবশেষে বৃটিশ-মার্কিন মিত্রশক্তির সাহায্যে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার লজ্জা—এইসব নিয়ে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত ছিল ফরাসীরা। ও, এস, এস সংগঠনে কাজ করার দরুণ যেসব খবর পেত মোসবী, তাতেও এই মনোভাবের সমর্থন ছিল।

ষ্টেট ডিপার্টমেন্টে য়ুনিভার্সিটির প্রাক্তন সহকর্মী, প্রাক্তন ছাত্র এবং পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে কাজ করেছে মোসবী। সে আশা করেছিল, মহাযুদ্ধের পরে তাকে উঁচু কোনো 'পোষ্টে প্রমোশন দেওয়া হবে। ল্যাতিন অ্যামেরিকায় মার্কিণ কাউন্টার এস্পিয়নেজ সংস্থার প্রধান হিসেবে এধরণের পদের জন্যে তার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু ডিন অ্যাকিসন ব্যক্তিগতভাবে তাকে অপছন্দ করতেন। এবং ডালেসও তাকে পছন্দ করতেন না। আইডিয়া নিয়ে বড্ড বেশী মাথা ঘামাতো মোসবী। তাই সরকারী সংস্থার ভদ্রলোকেরা তাকে পছন্দ করতো না। মোসবী বলেছিল, ফরেন সারভিস অপদার্থ লোকে ভরে যাচ্ছে। পুবের ষ্টেটগুলোর বিভিন্ন কলেজ থেকে পাশ করা যেসব যুবক 'ভদ্রলোক' ওয়াল ষ্ট্রীটে আইন ব্যবসায় সুবিধা করতে পারছেনা, ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের শ্রেণীস্বার্থ বাঁচানোর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাসে তারা কান্ট্রি ক্লাবেও আজকাল ও ধরণের মনোভাব চলে না। তাছাড়া, আধুনিক ব্যবসা পরিচালনায় ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে বারনহ্যামের মতবাদের সঙ্গে মোসবীর সহানুভূতি আছে। মহাযুদ্ধের সময় সে বলেছিল যে নাৎসীরা প্রথমে নিজের দেশে আধুনিক ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত বিপ্লব সমাপ্ত করেছে বলেই তারা জিতছে। পক্ষান্তরে মিত্র পক্ষের কোন দেশই মান্ধাতার আমলের শিল্পনীতি নিয়ে জার্মান জাতিকে হারাতে সমর্থ নয়। কারণ জার্মানীরা ইতিহাসের এক নতুন পর্য্যায়ে উপনীত এবং যা অনিবার্য্য, সেই উৎস থেকেই তাদের ক্ষমতা ক্ষয়িত হচ্ছে। এবং মোসবী, ওয়াশিংটনে স্কচ হুইস্কি পানে অভ্যস্ত ভদ্রলোকদের সমাজে বলেছে যে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলির অস্তিত্ব যতোই দুঃখদায়ক হোক, এগুলি জার্মান রাজনৈতিক ধারণার কার্য্য-কারণ সঙ্গতি ও যৌক্তিকতার সাক্ষ্য দেয়। অ্যামেরিকানদের এরকম কোন আইডিয়া নেই। তারা কি করছে, তারা নিজেরাই জানেনা। তাদের নির্দিষ্ট কোন প্ল্যান নেই। ব্রিটিশরাও কাজের নয়। স্বয়ং-

কথনভিত্তিক ষ্টাইলে অথচ বর্ণনাধর্মী বাকভঙ্গীতে মোসবী তর্ক করে বোঝাতে চেয়েছে পশ্চিমী দেশগুলির নেতৃত্বের চিন্তার দৈন্য ও শূন্যতা। অবশেষে সে বলেছে যে ডীন অ্যাকিসন নাক ঝাড়লে তার রুমালে এক গাদা পোকা থাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ফরাসীদের মধ্যে সে যখন ছিল, মোসবী নিজেই স্বীকার করে যে তার মনোভাবে কিছুটা তিক্ততা ছিল। যদিও তার ঠাট্টাইয়ার্কিগুলো মন্দ ছিল না। এবং সে সময় সে বড্ড বেশী মদ খেতো। সে মার্ক্স ও তকিভী নিয়ে রিসার্চ করতো এবং মদ খেতো। তার মানসিক সংঘাত থামতে চাইতোনা। কাউন্ট দ্য লা মাইন-ক্রেইভে (এক প্রাচীন অভিজাত পরিবারের নাম ইচ্ছে করে স্মৃতিকথার বদলে দিয়েছে মোসবী) তাকে মদ জোগাতো এবং ব্লাক মার্কেটে তার টাকা ভাঙিয়ে দিতো।

স্যার হ্যারল্ড নিকলসন বা সান্তায়ানা বা বার্টাণ্ড রাসেল প্রমুখ লেখকদের রচনার ভক্ত মোসবী এবং তাঁদেরই ষ্টাইল অনুসরণ করে সে লিখতে চায় যে ১৯৪৭র প্যারী ছিল বাইবেলকথিত নোয়ার আর্কের আধখানার মত, যেখানে প্রতিটি প্রাণী একই ধরনের দ্বিতীয় প্রাণী আসবে বলে অপেক্ষা করছে। সেখানে প্রত্যেক ধরণের একটা জিনিষ ছিল। বিশেষতঃ অ্যামেরিকানদের মধ্যে। নগরীর আবহ ছিল তিক্ত ও গম্ভীর। সেইন নদীর দুর্গন্ধ ছিল তরল ওষুধের মত। একটা পার্টিতে মিনেসোটায় ফরাসী ভাষা শিখতো, এমন একজন প্রাক্তন ছাত্র এসেছিল। সে এখন একা একটা ফুনম্বরী কারবার চালায়। অর্থাৎ, এমন একটা এজেন্সী চালায়, যেটা ঘুষ দেওয়া, প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজ করা এবং জি, আই, পি-দের কলগার্ল সাপ্লাই করার ব্যাপারে স্পেশ্যালিষ্ট। পার্টিতে ভদ্রলোক আবেগজড়ানো গলায় সমগ্র মানবজাতির এই মহানগরী, অ্যামেরিকানদের কাছে য়ুরোপের তাৎপর্য্য এবং মানবিক মানদণ্ড বজায় রাখায় অ্যামেরিকানদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বললো। র‍্যানডালের লেখা আধুনিক মনের গঠনপ্রক্রিয়া কিম্বা য়ুরোপের বুদ্ধিবিকাশের ইতিহাস থেকে

উক্তি দিলো। আমার ইচ্ছে করছিলো—মোসবী লিখবে, (চিমটে সমেত বরফ এতোক্ষণে কাচের জারে ভরা অবস্থায় এসেছে এবং মেক্সিকোর নেটিভরা এখন আর আগের মত নোংরা সাদা হাফপ্যান্ট পরে না)—ইচ্ছে করছিলো, প্রবাদবাক্য ও অসার নীতিকথা আওড়াতে 'ওস্তাদ ওই মাতাল ক্লিপ্-আর্টিষ্ট, যে এককালে মিন্নেসোটা য়ুনিভার্সিটিতে মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী ছিল এবং এখন সুন্দর বেন্টলী গাড়ী চড়ে ট্যুর দ্য আর্জেং-এ ডাক অ্যা লরাঞ্জ খেতে এসেছে—ইচ্ছে করছিল, ওকে বলি—হ্যাঁ, কিন্তু আমরা অতলান্তিক পেরিয়ে এখানে আসি অতীতের বুকে বিশ্রাম নেবো এবং আমোদ পাবো বলে ; এজরা পাউণ্ড যেমন বলেছিল, স্রেফ মজা দেখার জন্যে আমরা ন্যু জার্সির জলাভূমিতে নতুন একটা ভেনিস তৈরী করতে পারি, স্রেফ ছেলেখেলার জন্যে ; শুধু মজার জন্যে আমরা যা ইচ্ছে তাই তৈরী করতে পারি ; ইচ্ছে করলে ট্রেনিং-পাওয়া বেবুনরা দাঁড়-টানা গণ্ডোলায় আমাদের নিয়ে যাবে, ইচ্ছে করলে আমরা জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা শুনবো ; কিম্বা যেখানে এখন লোকে নোংরা পোড়ায়, শূয়র পোষে বা পুরোনো যন্ত্রপাতির লোহালক্কর ফেলে রাখে, ইচ্ছে করলে আমরা যেখানে গণ্ডোলা থেকে নেমে কনসার্ট শুনবো।

বুদ্ধিজীবী মোসবী অন্য অনেক ব্যস্ত মানুষের মতনই গান শোনার অবকাশ পায়নি। কবিতা পড়ারও নয়। কংগ্রেস সদস্য, ক্যাবিনেট অফিসার, সংগঠনের লোক, পেন্টাগনের পরিকল্পনাবিদ, পার্টির নেতা বা প্রেসিডেন্টদের এসবে উৎসাহ নেই। তারা যা, তার থেকে অন্য-রকম হতে পারেন।। তারা টি, এস, এলিয়টের কবিতা পড়ে না। তারা ভিভালডি বা সিমারোসার গান শোনে না। কিন্তু তাদের প্ল্যানিংএর ফলে অন্য মানুষ এইসব উপভোগ করার সুযোগ পায়। মোসবীর সঙ্গে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতা, প্রধান আমলা ও প্রেসিডেন্টদেরই বেশী মিল। অন্ততঃ এলিয়ট বা সিমারোসার চেয়ে ওদের নিয়েই সে বেশী ভাবতো। ঘৃণার সঙ্গে সে ওদের ভুল, ওদের

চিন্তায় গভীরতার অভাবের কথা বলতো। লকের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে সে ওদের আসল রূপটা দেখাতে চাইতো। বলতে চাইতো, জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন না করে, তাহলে কোন ক্ষমতাসীন শক্তিই আইনসংগত নয়। উইলিস মোসবী অ্যামেরিকার একমাত্র মানুষ, যার গণতন্ত্রে চূড়ান্ত বিশ্বাস আছে (হয়তো সারা পৃথিবীতেই সে এই ধরণের একমাত্র মানুষ—যদিও পৃথিবীতে, লক্ষ লক্ষ মানবাত্মা ও লক্ষ লক্ষ মানবহৃদয়ের মধ্যে কোথায় কি আছে, কে বলতে পারে)। তার স্বল্পকথনভিত্তিক, শুষ্ক ও পরমতসহিষ্ণুতার অভাবে চিহ্নিত কথাবার্তার ধরণ (বা সংক্ষেপে বললে পরীক্ষা), তার লম্বা ও নমনীয় চেহারার মর্যাদার ছাপ এবং তার হাড়ে হাড়ে আভিজাত্যের ইঙ্গিত—এ সব সত্ত্বেও সে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তার নাকের গভীর ও দীঘল ফুটো দুটো এমন সব যন্ত্রণার ইঙ্গিত দেয়, যা সহ্য করতে হলে শক্তি থাকা দরকার এবং তার শক্ত চোয়ালে সেই শক্তির প্রকাশ তুমি দেখতে পাবে। সবশেষে চোখদুটো, যে চোখে আলো আনে যন্ত্রণা।

একটা খুবই অদ্ভুত, বুদ্ধিমান, ক্ষুধার্ত, উচ্চাশাসম্পন্ন এবং ভগ্নহৃদয় প্রাণী—যে নিজেকে মানুষ বলে অভিহিত করে সে আসলে যে একটা জন্তু এই সত্যটা থেকে দূরে যেতে চায়। শেষ বিচারে সংস্কার থেকে তার অস্তিত্বই বড় কথা। সে যা ইচ্ছে বলুক।

'রাজার রাজত্বও আসলে কাদামাটি
যে সারমাটি পশুর মত মানুষকেও দেয় খাদ্য—
জীবনের এখানেই মহত্ব'।

—এভাবে প্রকাশ হয় প্রেম। কিম্বা অন্য কোন মহান প্রেরণা। (মোসবী শেক্সপীয়র জানে। এখানেই অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার তফাৎ। এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে মোসবী বলেছে: ওকে ওষুধের পিল তৈরী করতে দিতে আমার বিশ্বাস হবেনা, কারণ অতীতে ও ওষুধের দোকান চালাতো।)

গম্ভীর মুখে মেসক্যালের পাত্রে চুমুক দেয় মোসবী। ধাতুর বোতাম লাগানো কমলারং-এর রুক্ষ সার্ট পরা মেক্সিকান ভৃত্য মনে করিয়ে দেয়, বেলা চারটেয় গাড়ী আসবে, মিটলায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

ইয়ো মিসমো সয় উনা রুইনা।

মোসবী রসিকতা করার চেষ্টা করে।

মোটাসোটা চেহারার ইণ্ডিয়ান সামান্য একটু হেসে ভদ্রতা দেখিয়ে চলে যায়। আমি কি জলে ঢিপ ফেলছিলাম? মোসবী ভাবছে। আমি চাইছিলাম, লোকটা বলুক, আমি ধ্বংসাবশেষ নই। কিন্তু কি করে বলবে? ও তো দেখতেই পাচ্ছে যে আমি একটা ধ্বংসাবশেষ। হয়তো রসিকতা মোসবীর ধাতে নেই। কিন্তু তার ধারণা, বিশেষ ধরণের কমেডী দেখার মত চোখ তার আছে এবং এই স্মৃতিকথার কাঠিন্য কমাতে, তার মানসিক সংগ্রামের বর্ণনার কঠোরতা কমাতে রসিকতা দরকার। তাছাড়া তার সত্যিই মনে আছে যে প্যারীতে যে প্যারীতে যেসময় একের পর এক লোকের চরিত্রের কমিক দিকটা দেখা যেতো। সে নিজেই দেখতে শিখেছিল। রু জ্যাকব, রু বোনাপার্ত, রু দী বাক, রু দ্য ভার্নী, হোটেল দ্য লা য়ুনিভার্সিটী— ছিল মজার লোকে ভরা।

একটা নাম লিখে সে শুরু করে। লান্টগার্টেন। হ্যাঁ, ওই লোক-টাকেই দরকার। হাইমেন্ লান্টগার্টেন। মার্ক্সিষ্ট কিম্বা ভূতপূর্ব মার্ক্সিষ্ট। এসেছিল ন্যু জার্সি থেকে। নাঃ, বোধহয় ন্যু ইয়র্ক থেকে। এককালে জুতোর সেলসম্যান ছিল!

অদ্ভুত বিশ্বাস ও গোঁড়ামি যেসব বলশেভিক গ্রুপের চরিত্র ছিল, সেইরকম অনেক দলে মিশেছে। লেনিনবাদী ছিল, পরে ট্রটস্কিপন্থী, তারপর হুগো ওহ্লার ও টমাস ষ্ট্যামের অনুগামী, শেষ পর্যন্ত সালেমে নামক এক ইতালিয়ানের ভক্ত, যে রাজনীতি ছেড়ে প্রতীকধর্মী ছবি আঁকতো। লান্টগার্টেনও রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিল। সে ব্যবসা

করে বড়লোক হতে চাইছিল। ভেবেছিল, রাতের পর রাত 'ক্যাপিট্যাল' ও লেনিনের 'ষ্টেট অ্যাণ্ড রেভল্যুশন' পড়ার দরুণ ব্যবসায়ে তার বিশেষ সুবিধে হবে। ও আর ওর বউ প্যারীতে কি করছে, আমি দেরীতে বুঝেছিলাম। ব্ল্যাক মার্কেট। সেটা ঘেন্না করার মত কিছু নয়। যুদ্ধোত্তর ইউরোপ এই রকমই। উদ্বাস্তু, অ্যাডভেঞ্চারার, প্রাক্তন সৈনিক।

এমনকি কাউন্ট দ্য লা এম, সি। তখনও যুদ্ধের ঘায়ে কাঁপছে ইউরোপ। নতুন নড়বড়ে, উদ্দেশ্যহীন গভর্ণমেন্ট। গভর্ণমেন্টকে সম্মান করার কোন কারণ নেই। পথ দেখাচ্ছিল মার্কিন সৈনিকরা, ব্যবসার তালেবড় পরিকল্পনা। ফ্যাক্টরীশুদ্ধ মেসিন চুরি করে পাওয়া দামী জিনিষ সব জাহাজে অ্যামেরিকা পাঠানো হচ্ছে। কাঠের ব্যবসা করতো এমন একজন অ্যামেরিকান কর্ণেল ব্ল্যাক ফরেষ্ট-এর কাঠ দিয়ে উইসকনসিন পাঠাতে শুরু করছিল। এবং, বলা বাহুল্য, কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে পাওয়া দামী জিনিষ লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত নাৎসীরা। অস্ট্রিয়ার হ্রদে ইহুদীদের ডুবিয়ে মারা হয়েছে। দামী শিল্পসম্ভার চুরি করা হয়েছে। ইহুদীদের খুন করার আগে তাদের সোনাবাঁধানো দাঁত খুলে নিয়ে সোনা গলিয়ে ইঁট বানিয়ে দেয়াল গেঁথে রাখা হয়েছে। হাওয়ায় উড়ছে টাকা এবং কিছু টাকা লুটবে লাষ্টগার্টেন। দুঃখের বিষয়, লোকটা কাজের লোক ছিল না।

দেখলেই বোঝা যেত, লোকটা খারাপ নয়। বিভিন্ন উগ্র বামপন্থী বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও এবং মতবাদের দিক থেকে উগ্র হলেও, তত্ত্বমত দিক থেকে শ্রেণীশত্রুদের খুন করাতে রাজী থাকলেও লাষ্টগার্টেন প্রস্রাবখানায় যেতে ভিড়ে অন্য লোকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে পেরে উঠতোনা। খুব বিনীত, মোটাসোটা, দয়ালু, ঠোঁটে হাসি, মুখটা ঈষৎ বাঁকা, হাসলে কান আর মুখের মাঝখানে মাছের কানকোর মত ভাঁজ পড়ে। এবং হয়তো মেক্সিকোয় আসার পর মোসম্বীর ওকে মনে পড়ার কারণ, ওর টোলটেক মিক্সটেক

জ্যাপোটেক চেহারা, মোটাসোটা, মাথায় কালো চুল, নাকের ডগাটা নীচের দিকে বাঁকা এবং তার বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি কারও পছন্দ হলে নাকের কালো ফুটো দুটো সলজ্জভাবে একটু বড় হ'ত। জীবনের ভয়ংকর দিকটা, জীবনের খারাপ দিকটা দেখে একটু অসুস্থ। কিন্তু বিনীত-ভাবে ও একাগ্রভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে যেন লাভের কড়ি তারও হাতে আসে। ওর ষ্টাইলটা দক্ষতা ও যোগ্যতার—কাজ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—কিন্তু আড়ালে কাঁপতো বিশ্বাসঘাতকের মতো এক অযোগ্যতা। ভুল জীবিকা। বেছে নেওয়ার ভুল। শোচনীয় ভুল। কিন্তু লোকটা হাল ছাড়তোনা—'

ভাইঁানংক্রমে লোকটার কথাবার্তা শুনে আমার মজা লাগতো। অতীত বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ নিয়ে লোকটার গর্ব ছিল। অসংখ্য বুলেটিন ছাপানোই সেই ক্রিয়াকলাপের অংশ। মেম্বারসিপ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন নিয়ে হাজার হাজার পাতার যুক্তিতর্ক। যেহেতু স্পেনের লয়্যালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যালিনপন্থীদের কবলিত এবং শ্রেণীশত্রু ও বিশ্বাস-ঘাতকদের প্রভাবাধীন, ওদের মালমসলা দিয়ে সাহায্য করা কি অ্যামেরিকান শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উচিৎ হবে? ফ্র্যাংকোর সঙ্গে যেমন যুদ্ধ করতে হবে, তেমনি ষ্ট্যালিনের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে। বলা বাহুল্য, দেওয়ার মত মালমসলা ওদের কিছু ছিলনা। কিন্তু যদি থাকতো, সেগুলো দেওয়া কি উচিৎ হতো? এই সম্পূর্ণ তত্ত্বগত প্রশ্ন নিয়ে পার্টি ভাঙাভাঙী হয়েছে, পার্টি সদস্যেরা বহিষ্কৃত হয়েছে। এই ধরণের উগ্রবামপন্থী দলবাজীর অদ্ভুত যন্ত্রণার সম্বন্ধে আমি খবর রাখার চেষ্টা করতাম, মোসবী লিখেছে। স্পেনিশ রিপাবলিকানরা একবারই অ্যামেরিকায় অস্ত্র কেনার চেষ্টা করেছিল এবং তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করেছিল মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ফ্রাংকলিন দেল্যানো রুজভেল্ট, যাকে লোকে বলে স্বাধীনতার পথিকৃৎ। যার ক্যানট্যাব্রিকো নামের সেই জাহাজে অস্ত্র বোঝাই হতে বাধা দেওয়া হলোনা কিন্তু কোষ্টগার্ডদের হুকুমে জাহাজটা বন্দরে ফিরে আসতে বাধ্য হলো। এ সব নাকি

মিষ্টার করডেল হাল-এর ডিপ্লোমেটিক প্রতিভার নজির। কিন্তু নামটা হল এফ, ডি, আর-এর। যার সম্বন্ধে ছ্যা লং ঠাট্টা করে বলেছিলেন ফ্র্যাংকলিন ছ্য লা নো। কিন্তু উগ্রবামপন্থীদের সেইবকার আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে উঁচুদরের ব্যাপার ছিল ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা। এখানে যে বেদনাদায়ক ঘটনাটা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, তা হলো সোভিয়েৎ ইউনিয়ন শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র হয়ে কিভাবে ফিনল্যাণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ চালাতে পারে? যদিও রাশিয়ায় অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, ১৯১৭র মহান প্রোলেতারিয়ান বিপ্লবের শেষে ষ্টালিনের প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, সোভিয়েৎ রাশিয়াকে তো সাম্রাজ্যবাদী বলা চলেনা। কেননা বুর্জোয়ারাই তো সাম্রাজ্যবাদী হয়। অন্ততঃ সংজ্ঞার দিক থেকে। তাহলে সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীদের কি বলবে? রাশিয়ানদের বাধা দাও না দিওনা? রাশিয়ানরা অমানুষ। কিন্তু ওরা যদি ভূস্বামী কুলাকদের জমি বাজেয়াপ্ত করে যন্ত্রণাদায়ক হলেও সঠিক ঐতিহাসিক পথে চলে? উগ্রবামপন্থীদের এই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখতে আমার খুব মজা লাগতো। কিন্তু বিদেশের ব্যাপার নিয়ে এইসব ভাবনা অনেক অ্যামেরিকানদের পক্ষেই জটিল ব্যাপার ছিল। আসলে বেশীর ভাগ অ্যামেরিকানই মনে মনে বিশ্বাস করে যে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করেই কোন তত্ত্বের সত্যতা জানা যায়। লাঙ্গগার্টেনও ধৈর্য্য হারালো। যুদ্ধের পর ও ঠিক করলে, ওকে বড় লোক হতে হবে। নিজের ও মায়ের জমানো টাকা পয়সা নিয়ে ও বিদেশে এসেছে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবে বলে।

এক বছরের মধ্যে টাকা পয়সা সব গেল। ওর জার্মান পার্টনার ওকে ঠকালো। বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ স্মাগলিংএর সময় ওকে ধরে ফেলেছিল।

মোসবী যখন ওর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয় (মোসবী নিজেকে তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকায় রেখে লিখছে, যেমন লিখেছিলেন হেনরী অ্যাডামস

নিবন্ধে)—তখন লাষ্টগার্টেন গ্রেভস রেজিস্ট্রেশন মারফৎ চাকরী পেয়ে অ্যামেরিকান আর্মিতে কবরের জন্যে ক্রশ জোগাড় করা বা ঘাসঢাকা লনের দেখাশোনা করা বা ওই ধরণের কিছু একটা করছে? অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীতে চাকরী করার সুবিধেটা থাকায় সে সিগারেটের বেআইনী ব্যবসা চালাচ্ছে এবং গ্যাস-রেশন কুপনের চোরাকারবারে নেমেছে! তখন ফরাসী সরকারের অ্যামেরিকান ডলার দরকার। ডলার সরকারী হারে ভাঙাতে রাজী থাকলে ফরাসী সরকার গ্যাস রেশন কুপন দিতে রাজী। সেগুলো চলে যেতো কালোবাজারে। একবার লাষ্টগার্টেন দম্পতি মোসবীকে গ্যাস রেশন কুপন জোগাড় করে দিতে অনুরোধ করেছিল। ওদের অনুরোধে সেবার মোসবী কাউন্টের কাছে ডলার না ভাঙিয়ে ব্যাঙ্কে ডলার ভাঙিয়েছিল। ব্যাপারটির গুরুত্ব ছিল। মোসবী জানতো যে লাষ্টগার্টেনকে এখনি মিউনিখ যেতে হবে। সেখানে এক জার্মান ডেন্টিষ্টের পার্টনারশিপে ও ব্যবসা করে। কিন্তু ডেন্টাল সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় ওরা পার্টনার ছিল, এটা মানতেই এখন রাজী নয় জার্মান ডেন্টিষ্ট।

সুতরাং উগ্রবামপন্থী ষড়যন্ত্রকারীর উপযুক্ত পোষাক ট্রেঞ্চকোট পরা লাষ্টগার্টেন—কোটটা ঠিকমত ফিট করেনি, মাথা, কাঁধ ও ঘাড় পেছনে উঁচিয়ে আছে ব্যাঙের মতন—লাষ্ট গার্টেন তার বউয়ের সঙ্গে অনেক কিছু পরামর্শ করে—বউয়ের বয়স কম, লেসের ব্লাউজ, কালো ভেলভেটের রিবন বাঁধা—ব্যাঙ্কের গোলাকার মেঝেয় কিছুটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ওরা আলোচনা করে। এবং বউ ট্রুডিকে যুক্তি দিয়ে সব বোঝাতে বোঝাতে লোকটার ঘামে যেন রক্ত ঝরে, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আস্তে হাত ছুঁড়ে ও বোঝাতে চায়। মেয়েলী ধরণের প্রশ্ন বা আপত্তির উত্তরে যুক্তি দিয়ে সব বোঝাতে চাইছে লাষ্টগার্টেন। কিন্তু ব্যাপারটার প্রথম থেকেই যুক্তির প্রশ্ন ওঠেনা। কেননা জার্মান ডেন্টিষ্টের সঙ্গে পার্টনারশিপ ব্যবসা করার আইনগত অধিকার

লাষ্টগার্টেনের নেই। আইনতঃ ব্যবসা করতে গেলে মিলিটারী প্রশাসনের অনুমতি থাকা চাই। ব্যবসাটা কালোবাজারের এবং লাভ হতে সুরু হতেই জার্মান পার্টনার লাষ্টগার্টেনকে গলা ধাক্কা দিয়েছে। তাতে পার্টনারের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। দেশ ও জাতি হিসেবে জার্মানী বুঝেছে যে সভ্য সমাজে শাস্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে কিন্তু ক্রাইম ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা এখানে প্রায় সীমাহীন। প্যারীর যে ব্যাঙ্কে লাষ্টগার্টেন আর ট্রুডির তর্ক চলছিল, তার ভেতরটা লাল পরফিরি-র রঙে রাঙানো। কাঁচা মাংসের রং।

এমন একটা রঙ, যার মধ্যে ফরাসী বুর্জোয়ারা খুঁজে পায় পৌরুষ ও আভিজাত্যবোধ। পাথরের তৈরী যে আধারে নেপোলিয়ঁর মৃতদেহ সংরক্ষিত ছিল, যেটা পালিশকরা লাল পাথরে তৈরী। যেন মস্ত একটা পালিশকরা দোলনায় শুয়ে আছে সবুজ রঙের ছোট্ট একটা মৃতদেহ। (বোনপার্ট-এর সময়ের ঐতিহাসিক মসিয়ঁ রিছ্যা পাথরের রঙের কথা লিখে গেছেন)। জীবিত নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের সম্বন্ধে মোসবীর ধারণা অন্যরকম এবং এই ব্যাপারে সে দার্শনিক আগস্ত কঁৎ-এর সঙ্গে একমত যে লোকটা খাপছাড়া। ফরাসী বিপ্লবের একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। সামাজিক দিক থেকেও বিপ্লবের যুক্তি ছিল। অর্থনীতি এবং রাজনীতির দিক থেকে ফরাসী বিপ্লব ছিল শিল্পবিপ্লব ও গণতন্ত্রের দিকে একটি পদক্ষেপ। কিন্তু নেপোলিয়ঁর অভ্যুত্থান সংক্রান্ত নাটকীয় ঘটনা ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও যুদ্ধসংক্রান্ত সামন্তবাদী ধ্যান ধারণার প্রাচীন পর্য্যায়ে পরে। হয়তো সামন্ততন্ত্রের চেয়েও প্রাচীন। রোমের চেয়েও পুরোনো। সেনাবাহিনী একেবারে সামনে থাকবে সেনানায়ক। এর মধ্যে যুক্তির কোন স্থান নেই। যে সমাজ সংগঠনের দিক থেকে ক্রমশঃ যুক্তিবাদী হয়ে উঠছে, সেই সমাজের নেপোলিয়ঁকে কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ তাই চেয়েছিল। যুদ্ধ ব্যয়বহুল ব্যাপার এবং যুদ্ধে আনন্দ আছে। আধুনিক চিন্তাধারার যুক্তিবাদী ভিত্তি গ্রহণ করে মানুষ আগের চেয়ে

আরও বন্য অযৌক্তিকতার বোমারু বিমান সেই ভিত্তি থেকে ওড়ায়।

মোসবী তার ভাবনাগুলো লিখে রাখছে নীলাভ সবুজ কালিতে, যার সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের রঙের মিল আছে। যেমন তার লিকর সংগৃহীত হয়েছে মাঠের, গাঢ় সবুজ রঙের উদ্ভিদের ধারালো সবুজ কাঁটা থেকে— যে উদ্ভিদের নাম মেসক্যাল, ডলার, ফাঁ, গ্যাস-রেশন, ব্যাঙ্ক, প্যারীর নোংরা রাস্তায় ছোট্ট গাড়ীতে উঠছে শুকনো চেহারার নাছোড়-বান্দা লাষ্টগার্টেন। প্যারীর রাস্তায় গাড়ী তখন খুব কম, পার্কিং স্পেস অনেক। রাস্তাগুলো বিশ্রী হলুদ, ধূসর, ভাঁজধরা, বিষণ্ণ। কিন্তু ফরাসীরা উত্তেজিত হয়ে পৃথিবীকে বোঝাচ্ছে তারা আনন্দিত, খুশী মেজাজে আছে। প্রোটেষ্টাণ্টে মূল্যবোধে বিশ্বাসী মার্কিনীরা শুনছে। ফরাসীরা বলছে—বোসো, মদের গ্লাসে ঠোঁট রাখো, পনীরের স্বাদ নাও, রুটি ছেঁড়ো, গান শোনো, ভালোবাসো, ছোটাছুটি বন্ধ করো এবং জীবন সম্বন্ধে য়ুরোপের প্রাচীন জ্ঞান আহরণ করো।

এবং লাষ্টগার্টেন ট্রেঞ্চকোটের বেল্ট বাঁধছে। ওর মাথায় গুণ্ডাদের টুপির মত যে মস্ত বড় ফেডোরা হ্যাটটা ছিল, সেটা সে চেপে নামাচ্ছে মাথার ওপর। সে সীটে জড়োসড়ো হয়ে বসেছে। বাদামী রঙের ছোট্ট দুটো হাত সিমকা হুইট গাড়ী ড্রাইভিং হুইল ধরে আছে। হতাশামেশানো দেঁতো হাসি হেসেও হাত নাড়ছে।

'যাত্রা শুভ হোক, লাষ্টগার্টেন।'

মেক্সিকান গড়নের নাম। দাঁতগুলো পমিগ্রেনেট বীজের মত। গীয়ারের শব্দ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার শব্দের মত। লাষ্টগার্টেন বিধ্বস্ত জার্মানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

বিধ্বস্ত দেশের পুনর্নির্মাণ মানেই বিরাট ব্যবসা। যখন তুমি কোন সমাজকে ধ্বংস করো, তুমি সমাজের জনসংখ্যা কমাও। তারপর পুনর্নির্মাণ মানেই বেশ কিছু লোক বড়লোক। লাষ্টগার্টেন ইহুদী বলেই হয়ত তার বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধোত্তর জার্মানীর এই ব্যবসায়িক প্রসারে তার ধনী হওয়ার অধিকার আছে। যে রাইন নদীর ওপারে

সব ইহুদীরই স্বাভাবিক কিছু দাবী আছে। কারণ ওই জমি মৃত ইহুদীদের ভস্মাবশেষে পুষ্য। এবং সোফায় বসলে নিশ্চিত হওয়া যায় না সে সোফার ভেতরটা নিহত ইহুদীদের চুলে ভরা কিনা। ইহুদীদের চর্বি দিয়ে নাৎসীরা সাবান তৈরী করতো বলে জার্মাণ ব্রাণ্ডের সাবান ব্যবহার করতে ভরসাই পায় না লাষ্টগার্টেন। তার বউ ট্রুডি বলেছে, লাষ্টগার্টেন আমি ষ্টোর থেকে লাইফবয় সাবান কিনে তাই দিয়ে হাত ধোয়।

ট্রুডি ন্যু জারসির মণ্টক্লেয়ার টীচার্স কলেজের গ্র্যাজুয়েট, সে ফরাসী ভাষা জানে। যেন নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে এমন এমন একটা কান্না-কান্না ভাব করে বৃষ্টিভেজা রাস্তায় গাড়ী ড্রাইভ করে চলে গেল লাষ্টগার্টেন, ট্রুডি মোসবীকে নিয়ে গেল সল প্লেয়েল—সেখানে এক চেক পিয়ানোবাদক শোনবার্গের সুরে বাজনা বাজাচ্ছে, পিয়ানোবাদকের চেহারাটা মাংসল, মাথার টাক, পিয়ানোর রীডে জোরে আঙ্গুল ঠুকছে। সে কতো কঠিন কাজ করার চেষ্টা করছে সেটুকুই বোঝা যাচ্ছে। সংস্কৃতি এক শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ট্র্যাজিক য়ুরোপে মিলিটারী ড্রিলের মত নিয়মানুবর্তী অনুশীলনে শিল্পকে বাঁচিয়া রাখা খুবই কষ্টকর।

কনসার্ট শোনার সময় ট্রুডির মুখটা সুন্দর দেখায়। তার শরীরের গন্ধটাও সুন্দর। ওর মুখটা চকচক করে। মুখের বাঁ চোখটা উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘোরে। পাষাণ হৃদয় মোসবী, রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে যে ঠাট্টা করে, ছোট ছোট মানবিক ব্যাপারগুলো যা ভালো বা খারাপ আখ্যা পায় সেগুলো নিয়ে রসিকতা করে। এবং হতভাগ্য সেই চেক পিয়ানোবাদক-যার কপালের মাংসপেশীগুলো কনসার্টের সময় শক্ত হয়ে ওঠে, যার মাথাভর্তি টাক।

এমনি একটা মুহূর্তে বাস্তব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতো মোসবী। পিয়ানোর শব্দ সে শুনতে পেতোনা। দার্শনিক কঁৎ-এর কথা ভাবতো। দূরে যাও, বৃদ্ধ যাজক এবং সামন্ততন্ত্রের পতাকাবাহী

সৈনিক! দূরে যাও, ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা! সদর্থক এই যুগে জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্তা মহিলারা তাদের নিজস্ব ভূমিকায় প্রহরা দেবে এবং নতুন সমাজের পুরুষেরা যেন একালের একক ঈশ্বর শ্রমশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, তাই দেখবে।

এদিকে গাছে গাছে এমব্রয়ডারার মতো মেক্সিকোর পাখিরা সেসবার দিকে চেয়ে আছে। হামিংবার্ড তার দেহজ কামনার প্রকাশের ব্যাপারেও পরিচ্ছন্ন। তাদের মৃদু গলা হাওয়ায় কাঁপন ধরাচ্ছে। মাটিতে ছোট্ট সরীসৃপ। মাটিতে পেট ঠেকিয়ে মাটি থেকে শুষে নিচ্ছে উষ্ণতা। ছোট ছোট এইসব প্রাণীদের আশীর্বাদ করা নাকি সত্যিই ভালো।

হ্যাঁ, মজার লোক ছিল এই লাষ্টগার্টেন। জার্মানীতে পার্টনার ঠকিয়েছে, গেভস রেজিস্ট্রেশনের কাজে তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া যাচ্ছেনা। সে ঠিক করলো, সে এবার ক্যাডিলাক গাড়ী আমদানী করবে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে লক্ষপতিদের মধ্যে ক্যাডিলাক গাড়ীর চাহিদা ছিল। ফরাসী সরকার ধীরে সুস্থে কাজ করে। তাড়াতাড়ি বিক্রীর উদ্দেশ্যে এই ধরণের আমদানীর বিরুদ্ধে তারা এখনও কিছু করেনি। ১৯৪৭-এ এই ধরণের গাড়ী আমদানীর জন্যে ট্যাক্স লাগতোনা। নতুন ক্যাডিলাক জাহাজে আনাবে বলে নিজের পরিবারকে নাইয়র্কে পাঠালো লাষ্টগার্টেন। ওর ভাই, মা আর মামা তিনজনে মিলে চার হাজার ডলার জোগাড় করে দিল। গাড়ী পাঠানো হল। ক্রেতা আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। সে অগ্রিম দিয়েছে। ডবল লাভের আশা ছিল। কিন্তু যেদিন গাড়ী লে হাভর বন্দরে নামলো, সেদিনই নতুন আইন চালু হল! ক্যাডিলাক বিক্রী করা গেল না। লাষ্টগার্টেন এখন গাড়ী নিয়ে কি করবে? তার গাড়ীর গ্যাস কেনার পয়সাও নেই। একদিন দেখা গেল, হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছে লাষ্টগার্টেন দম্পতি। মিসেস লাষ্টগার্টেনের যে সব বন্ধুবান্ধবীরা কনসার্ট শোনায়, তাদের কাছেই ও রইলো? স্নান করা,

দাড়ি কামানো ও কাপড় জামা কাচার জন্যে নিজের ঘরের কল-বেসিন লাষ্টগার্টেনকে ব্যবহার করতে দিচ্ছে মোসবী। ক্লান্ত লাষ্টগার্টেন, পরাজিত, বিধ্বস্ত, নিজের পতনে অবশেষে আতঙ্কিত, ঝিঁঝি পোকার শব্দের মত-মৃদু কণ্ঠে 'গুড মর্ণিং' বলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওতে, টাকা, মায়ের জমানো টাকা, ভাইয়ের পেন্সন। ওর চোখের পাতাগুলো নীল হয়ে উঠেছে, এবং দীর্ঘদিন অব্যবহারে আইবুড়ো মেয়েদের ছোট্ট থলিতে রাখা গুঁড়ো থেকে যেমন সুগন্ধ উবে যায়, ওর হাসিটাও তেমনি। তবু ঠোঁট দুটো হাসবার চেষ্টা করছে।

মোসবী বুঝতো সে ও করুণার পাত্র। কিন্তু রাতে বন্ধ নাকনাকে গাড়ীর ভেতরে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাক, লাষ্টগার্টেন—দুটো কোটে শরীর ঢাকা, প্রকাণ্ড সীটটার ওপরে ঘুমুচ্ছে—যেন লেভিয়াথানের ভেতরে জোনাহ। মোসবীর সহানুভূতি জাগেনা। ও ভাবে, এই জাতের সেলস-ম্যান, যে অ্যামেরিকার য়ুরোপকে বিদেশী রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক ছিল। যে নয়া দুনিয়া থেকে ছাড়াতে পারেনি, সে এখন প্যারীতে অ্যামেরিকান ক্যাডিলাক গাড়ীর ভেতরে ঘুমুচ্ছে, যে গাড়ীটা ডেট্রয়েটে তৈরী হয়েছিল। অ্যামেরিকায় সে বিদেশী, য়ুরোপে সে ইয়াংকি। সময় ও পরিস্থিতি ও মেলাতে পারেনা। নাজুক অথচ জোরালো গলায় লোকটা বলে, ফরাসীরা সদা-সর্বদা মার্ক্সিজম শিখেছে। অনেক বছর আগেই এসব জেনেছে লাষ্টগার্টেন। ওদের শ্যাখটি ইনজিনীয়ার্স কিম্বা লেনিন-কথিত ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রায়ত্ত কিম্বা ষ্টালিনের আমলে মস্কো বিচারপ্রহসন কিম্বা 'সমাজতন্ত্রিক ফ্যাসিবাদ' সম্বন্ধে প্রশ্ন করো। ওরা কিছু বলতে পারবেনা। রুশ বিপ্লবের সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার পর যখন সমাপ্ত, তখন ফরাসীরা হঠাৎ মার্ক্স ও লেনিনকে আবিষ্কার করলো। 'ইউরেকা!' ইউরোপীয়ানরা চেঁচালো। এবং যবনিকার আড়ালে শীতল যুদ্ধের পটভূমি। কারণ অ্যামেরিকা হারলে ফরাসী বুদ্ধিজীবিরা রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত। এবং অ্যামেরিকা জিতলে ওরা অ্যামেরিকান প্রতিরক্ষার

ছায়ায় স্বাধীন, বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী ক্যাডিকালদের ভূমিকায় থাকতে পারবে।

'তোমার কথা শুনলে মনে হয়, তুমি দেশপ্রেমিক'—মোসবী বলেছে।

ল্যাষ্টগার্টেন জবাব দেয়—

'এক হিসেবে তাই। কিন্তু আমি বাস্তববাদী হয়ে উঠেছি। কখনো কখনো আমি নিজেকে বোঝাই—ল্যাষ্টগার্টেন, তুমি যদি এই পৃথিবীর বাইরের কোন বাসিন্দা হতে, তুমি যদি মানুষ না হতে, তাহলে এটা বা সেটার সম্বন্ধে তোমার মত কি হতো?'

'দেহভ্রষ্ট অশরীরি সত্তা?'

'হয়তো তাই।'

'ক্যাডিলাকটা নিয়ে কি করবে?'

'স্পেনে পাঠাচ্ছি। বারসিলোনায় বিক্রী হবে গাড়ীটা।'

'কিন্তু গাড়ীটা ওখানে পৌঁছনো চাইতো?'

অ্যানডোরা হয়ে যাবে। কোনস্কি ড্রাইভ করবে। ক্রোনস্কি এই হোটেলেই থাকে। পোল্যাণ্ডনিবাসী বেলজিয়ান। ল্যাষ্টগার্টেনের সঙ্গে খুব মেলামেশা। ক্রোনস্কি জন্মসূত্রেই অসৎ, মোসবী জানে। কোঁকড়ানো চুল, গ্রীসদেশের জলপাইয়ের মতো চোখের কোণে ভাঁজ, নাক ও ঠোঁট দুটো বেড়ালের মত। লোকটা রাশিয়ান মেকের বুটজুতো পরে।

কিন্তু ক্রোনস্কি অ্যানডোরার উদ্দেশ্যে গাড়ী নিয়ে যাত্রা করার পরেই গাড়ী বেচার চমৎকার একটা সুযোগ পেলো ল্যাষ্টগার্টেন। উত্রেখৎ-এর এক পাঁজিপাতি এখনি ক্যাডিল্যাক গাড়ী কিনতে চায়। ট্যাক্সের ঝামেলা সে বুঝবে। তার সরকারী নানা বিভাগে প্রভাব আছে। টেলিগ্রাম করে ক্রোনস্কিকে অ্যানডোরায় থামতে বললো ল্যাষ্টগার্টেন। রাতের ট্রেনে যেয়ে ক্যাডিল্যাক নিয়ে ড্রাইভ করে ফিরছিল ল্যাষ্ট-গার্টেন। সময় বড্ড কম। কিন্তু সারারাত ট্রেনে জেগে কাটানোর ফলে ল্যাষ্টগার্টেন গাড়ী চালাতে চালাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরে

ও বলেছিল, ওর ভাগ্য ভালো। কারণ গাড়ীটা পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল এবং নীচের পাথরের দেয়ালটা আর একটু হলে ফসকাতো। লাষ্টগার্টেন যখন নিশ্চিত মৃত্যু থেকে এক বা দু'ফুট দূরে, তখন প্রচণ্ড শব্দে তার ঘুম ভাঙে। গাড়ীটা চুরমার হয়ে গেলো। ওটা ইনসিওর করা ছিল না।

তখনও ঠোঁটে হাসি, ভাঙা হাত ব্যাণ্ডেজে ঝুলছে, হাতে ছড়ি—বুলেভার্দ সাঁ-জারমেইনের কাফেতে মোসরার টেবিলের সামনে এসে বসে লাষ্টগার্টেন। চকচকে চুল থেকে মাথার টুপি সরিয়ে আহত পাটা চেয়ারে তোলার অনুমতি নেয় লোকটা। তারপর বলে—'প্রাইভেট কথাবার্তা হচ্ছে নাকি ?

মোসরা গল্প করছিল অ্যালফ্রেড রাস্কিন নামের এক অ্যামেরিক্যান কবির সঙ্গে। রাস্কিনের সামনের কয়েকটা দাঁত নেই কিন্তু লোকটা পরিষ্কারভাবে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে। খুবই চমৎকার লোক। সব ব্যাপারেই তত্ত্ববাগীশ। সে বলছিল, যুদ্ধের সময় যে সব ফরাসী কবি জার্মান নাৎসীদের সমর্থন করেছিল, যুদ্ধের পর ফরাসী সরকার তাদের গুলি করে মেরেছে। অ্যামেরিকার খুন করার মত যথেষ্ট সংখ্যক কবি না থাকায় ওরা কবি এজরা পাউণ্ডকে পাগলাগারদে পাঠালো। তারপর লাষ্টগার্টেনের দিকে বিশেষ নজর না দিয়েই রাস্কিন বলে চলে—অ্যামেরিকার কোন ইতিহাস নেই, অ্যামেরিকান সমাজের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। দার্শনিক হেগেল-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের বক্তব্য প্রমাণ করে অ্যালফ্রেড রাস্কিন। হেগেলের মতে ইতিহাস মানেই যুদ্ধ ও বিপ্লবের ইতিহাস। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একটি মাত্র বিপ্লব হয়েছে এবং যুদ্ধের সংখ্যাও কম। সুতরাং ইতিহাসের দিক থেকে সেখানে শূন্যতা রয়ে গেছে।

মোসরার বাথরুম, কল ইত্যাদি রাস্কিনও ব্যবহার করে। নদীর বাঁ-দিকে অ্যালজেরিয়ান অধ্যুষিত যে এলাকায় ও থাকে, সেখানে নোংরা পায়খানা ব্যবহার করতে ওর রুচিতে বাঁধে। এবং বাথরুম থেকে

বেরোবার সময় ও সচরাচর একটা উঁচুদরের মন্তব্য করে। যেমন—

'অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কির্কেগার্দ-এর বড় ভুলটা কোথায়, আমি আবিষ্কার করেছি।'

কিম্বা—

'সর্বব্যাপী শূন্যতায় ভয় পেয়েছিলেন প্যাসকাল। কিন্তু কবি ভ্যালেরী বলেছেন, মহাকাশের শূন্যতা ও একটা বোতলের ভেতরের শূন্যতার পার্থক্য শুধু পরিমাণগত। তোমার কি মনে হয়?'

'আমরা তো বোতলের মধ্যে থাকিনা'।

মোসবী জবাব দিয়েছে।

রাস্কিন চলে যেতে লাষ্টগার্টেন বলে।

'ওই যে লোকটা তোমার পয়সায় কফি খেলো, ওর নাম কি?

'রাস্কিন।'

'ওই রাস্কিন?'

'হ্যাঁ, কেন বলোতো?'

'আমি যখন হাসপাতালে ছিলাম, আমার বউ ওই লোকটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতো।'

'গুজবে কান না দেওয়াই ভালো। হয় তো দুজনে এক সঙ্গে কোথাও কফি খেলো বা—'

'পুরুষের যখন ভাগ্য বিরূপ হয়, তখন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনা, এমন মেয়েমানুষ কচিৎ দেখা যায়।'

'শুনে দুঃখ পেলাম'।

মোসবী জানিয়েছে।

...এবং এখন মোরক্কোর তপ্ত রোদের ঝাঁজ থেকে বসার জায়গাটা সরিয়ে মোসবী ভাবছে—তার মুখটা এরই মধ্যে রোদের আঁচে লাল হয়ে উঠেছে এবং তার মুখ, হাড় ও চোখ দুটো তৃষ্ণার্ত মনে হচ্ছে—মোসবীর মনে পড়ছে, লাষ্টগার্টেন বলেছিল।

'এবারের অভিজ্ঞতাটা ভয়ংকর।'

'কোন সন্দেহ নেই। খুবই ভয়ানক।'

'গাড়ীটা চুরমার হওয়ার সঙ্গে বাজির শেষ দানটা আমি হেরে গেলাম। গোটা পরিবারের ব্যাপার। এর চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভালো ছিল। অন্ততঃ আমার ইনস্যুরেন্সের টাকায় আমার মা, মামা, ও ছোট ভাইয়েব ক্ষতিপূরণ হতো।

পুরুষমানুষ কাঁদছে, এই দৃশ্যটা মোসবীর পছন্দ নয়। ওর যন্ত্রণার মুহূর্তগুলো বসে দেখার ইচ্ছেও তার নেই। দুঃখ যদি গোপন না থাকে, আবেগ ও উচ্ছ্বল যদি মুখোসের আড়ালে ঢাকা না থাকে, এই ধরণের আবেগ শুধু নিরতিশয় ঘৃণাই জাগায়। নিজের ঘৃণাব প্রচণ্ডতা থেকে নিজের নৈতিক স্বভাব সম্বন্ধে কিছু বুঝতে পারে মোসবী। রুচির দিক থেকে সে দার্শনিক সেনেকার অনুগামী। অন্ততঃ পৌরুষ সংক্রান্ত স্পেনিস চিন্তাধারা তার পছন্দ। স্পেনিস কবি লোরকার ভ্যারোনিল। পুরুষালী লাল কার্নেশন ফুল। সম্মানজনক নিয়ন্ত্রণের কঠিন, ক্লাসিক ও স্পষ্ট প্রতীক।

'তুমি নিশ্চয়ই ভাঙা গাড়ীটা লোহা লক্করের দামে বিক্রী করেছো?'

'ক্রোনস্কি ওসবেব ব্যবস্থা করেছে। দ্যাখো মোসবী, হাসপাতালে থাকার সময় আমি ভাবছিলাম, গোল্ড-রাশের নায়কের মত বড় লোক হবার হঠাৎ খেয়ালে আমি এখানে এসেছিলাম। যুদ্ধে আমি বা ট্রুডি কোন সক্রিয় অংশ নিইনি। কেননা আমার যে বয়স, তাতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া যায় না। আমরা দুজনেই সক্রিয় হতে চাইছিলাম। আমার স্ত্রী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। কিম্বা জীবন ও উত্তেজনার সন্ধানে। তুমি তো বোঝো, মণ্টক্লেয়ার টীচার্স কলেজে বসে বিরাট কিছু করার বা মস্ত বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে কেমন লাগে। আমি চেয়েছিলাম, ওর স্বপ্নটা সত্যি হোক। পৃথিবীর আর সবাই-য়ের সঙ্গে তাল রেখে আমিও বড়লোক হব। কিন্তু হাসপাতালের বেডে শুয়ে আমি বুঝলাম, আমি প্রথম জীবনে যা করেছি, তাই ঠিক। আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমি আদর্শবাদী। ব্রিটিশ লেবর

পার্টির নেতা ক্লিমেন্ট রিচার্ড এটলীর সম্বন্ধে পড়তে আমার ভালো লাগছিল। আমি বুঝেছি, আমি এমন একটা প্রাণী যে রাজনীতি ছাড়া বাঁচতে পারে না।'

মোসবী বলতে চেয়েছিল—

'না, লাষ্টগার্টেন। তুমি মোটাসোটা ছোট্ট বাচ্চাদের আদর করার উপযুক্ত। তুমি মিষ্টি স্বভাবের বুড়ো ইহুদী বাপ।'

কিন্তু এসব কিছুই সে মুখে বলেনি।

'এবং আমি যুগোশ্লোভিয়ার নেতা মার্শাল টিটোর সম্বন্ধেও পড়েছি! হয়তো টিটো যে বিকল্পটা বেছে নিয়েছে, সেটাই ঠিক। হয়তো সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ নিহিত আছে ব্রিটিশ লেবার পার্টির পন্থা ও যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের পন্থার মাঝামাঝি কোথাও। আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। আমি বেলগ্রেডে যেতে চাই।'

'কি হিসেবে?'

'সেই ব্যাপারেই তোমার সাহায্য চাই। তুমি তো শুধু বিদ্বান নও। আমি শুনেছি, তুমি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর সম্বন্ধে একখানা বই লিখছো।'

'প্লেটোর শাইনসংক্রান্ত বই 'লজ' প্রসঙ্গে লিখেছি।'

'অন্যান্য বইও লিখেছো। তাছাড়া তুমি কম্যুনিষ্ট আন্দোলন সংক্রান্ত অনেককে চেনো। সুইচবোর্ডের চেয়ে তোমার কলেকশনের সংখ্যা বেশী…।'

শেষ কথাটা চল্লিশের দশকের ইয়াঙ্কিং শ্ল্যাং।

'তুমি ন্যু লীডার পত্রিকার কাউকে চেন?'

'আমার পছন্দসই পত্রিকা নয় ওটা। সত্যি কথা বলতে কি আমি রাজনীতির দিক থেকে রক্ষণশীল। তোমরা যাকে পচা লিবারেল বলো, তাও নয়, একেবারে গোঁড়া।

রক্ষণশীল। তুমি কি জানো, আমি স্পেনের জেনারেল ফ্র্যাংকোর সঙ্গে করমর্দন করেছি?'

মোসবী বলে।

'সত্যি ?'

'এই হাতে। ছুঁয়ে দেখো না—'

'কেন দেখবো ?'

'দেখোই না। হয়তো কোন মানে খুঁজে পাবে।

'যে হাত ফ্র্যাংকোর হাত ছুঁয়েছিল, সেই হাত ছুঁয়ে দেখো।'

তখন অত্যন্ত অদ্ভুৎভাবে হাতের কালো আঙুলগুলো বাড়ালো লাষ্টগার্টেন। ওকে কিছুটা রহস্যময় মনে হচ্ছে, কিছুটা অসুস্থ। দেঁতো হাসি হেসে ও বলে—

'অবশেষে আমি সত্যিকার রাজনীতির যোগাযোগে এলাম। কিন্তু ন্যু লীডার পত্রিকার ব্যাপারে আমি সিরিয়স। যুগোশ্লাভিয়ায় যাবার জন্যে আমি সাংবাদিকের পরিচয়পত্র চাই।'

কখনো কোন খবরের কাগজ বা পত্রিকায় লিখেছো ?'

'দ্য মিলিট্যাণ্ট পত্রিকায় লিখেছি।'

'কি লিখেছিলে ?'

লাষ্টগার্টেন মিথ্যে বলার টেকনিক রপ্ত করতে পারেনি। ওকে নিয়ে এইভাবে মজা করা মোসবীর হৃদয়হীনতার পরিচয় দেয়।

'কোথায় যেন একটা নোটবুকে—'

লাষ্টগার্টেন বোঝাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু ন্যু লীডারের অফিসে চিঠি লেখার দরকার হয়নি। দুদিন পরেই ব্যুলেভার্দে শূয়রের মাংসের দোকানের কাছে লাষ্টগার্টেনের সঙ্গে দেখা। ও ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলেছে, ছড়িটারও আর বিশেষ দরকার নেই। ও বলে—

'আমি যুগোশ্লাভিয়া যাচ্ছি নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে।'

'কার অতিথি ?'

'মার্শ্যাল টিটোর। যুগোশ্লাভ সরকারের। যারা উৎসাহী, তাদের ওরা অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করে নিজেদের দেশ দেখাতে চায়।

দেখাতে চায়, কিভাবে ওরা যুগোশ্লাভিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে ওহ্,
আমি জানি—'

একদেশে সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠা অসম্ভব, সমাজতন্ত্র সারা বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব-বিপ্লবের মাধ্যমে গড়ে উঠবে, এই রীতিসম্মত ট্রটস্কিবাদী বক্তব্য আপত্তি হিসেবে উঠতে পারে ভেবে লাষ্টগার্টেন বলে—

'আমি জানি, একদেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। এবং আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে সর্বহারার এক-নায়কত্বকে নতুন রূপ দিয়ে টিটোই মার্কসবাদকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেবেন। আমার প্রথম ভালোবাসা বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন। আমি তার কাছেই ফিরে যাচ্ছি। হয়তো, ব্যবসা করে বড়লোক হওয়া আমার জন্যে নয়।'

'হয়তো নয়।'

'এখন আমার আশা হচ্ছে। তাছাড়া বসন্তকাল আসছে।'

এখন লাষ্টগার্টেনের মাথায় ধূসর রং-এর ভারী টুপি এবং পোষাকে এমন আরও কিছু চিহ্ন, যা দেখে মনে হচ্ছে, শীত আর শেষ হতে চাইছে না। পুনর্জন্মের প্রার্থী লাষ্টগার্টেন। জীবনের লাবণ্য উদ্ঘাটিত হোক, এই সুযোগ সে চাইছে। কিন্তু, হয়তো—মোসবী ভাবছে—হয়তো অতিপ্রাকৃতের সাহায্য ছাড়া লাষ্টগার্টেন কোনদিনই উপযুক্ত বহিরঙ্গ নিয়ে বাঁচতে পারবে না।

'তাছাড়া আমাদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত কিছু ফয়সালা করার আগে ট্রুডি নতুন করে ভাবার একটা সুযোগ পাবে।'

'তোমাদের দু'জনের সম্বন্ধটা তাহলে এই পর্যায়ে যেয়ে দাঁড়িয়েছে? আমি দুঃখিত।'

'ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হত। যুগোশ্লাভদের বোঝানো যাবে না। এটা ভি, আই, পি, দের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত। দ্বন্দ্ব-মূলক বস্তুবাদ সম্বন্ধে সেমিনার হবে। আমার ভালোই লাগবে। কিন্তু ট্রুডির এসব পছন্দ নয়।'

…এখন বারান্দায় বসে চিমটে দিয়ে বরফ তুলতে যেয়ে মোসবীর হাত এতটুকু কাঁপেনা। সে আরও মেসক্যাল পানপাত্রে ঢালে। পানীয়ের মধ্যে গুসানো স্থ ম্যাগু নামে এক সুগন্ধি খোলসহীন শামুকের গন্ধ মেশানো। লাষ্টগার্টেন সম্বন্ধে এইসব লিখতে ভালো লাগছে। স্মৃতি-কথার এই পর্যায়ে নতুন কিছু বলতে হবে, নতুন করে গভীরে যেতে হবে। আগের পরিচ্ছদগুলো বড্ড ভারিক্কী হয়েছে। রাজনৈতিক তত্ত্বপ্রসঙ্গে অনেক রীতিবিরোধী কথাবার্তা বলা হয়েছে। রক্ষণশীল রাজনৈতিক মতবাদের দুর্বলতা। অ্যামেরিকায় বিকল্প রক্ষণশীল মতবাদের দৈন্য। এবং প্রচলিত লিবারেল মতবাদের বিরোধিতার প্রয়োজন। অলস ও বিশৃঙ্খল বুদ্ধিজীবিদের নিয়মের কঠিন নিয়ন্ত্রণে আনতে, তাদের পড়াশুনো করতে বাধ্য করতে এবং রাজনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন ধারার মধ্যে কাঠিন্য আনতে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছে মোসবী। সে জানে যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী …দুদল ছাত্রের ক্ষেত্রেই তার চেষ্টা নিস্ফল হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল, কলেজে পড়া অ্যামেরিকান বামপন্থী যুবকেরা ইউরোপীয় মডেলে সত্যিকার বামপন্থী আন্দোলনের স্বপ্ন দেখছে। দক্ষিণপন্থী নির্বোধগুলো আরও অদ্ভুত। কয়লাখনিতে গোলাপফুল ফোটানো যায় না। নিজের দক্ষিণপন্থী গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের দেখে আশাহত হয়েছে মোসবী। যেন একদল টি, ভি,—অভিনেতা। তাদের শিক্ষকের বাচনভঙ্গী ও বক্তব্যের অম্ল-মধুর মার্জিত সৌন্দর্য্য, যুক্তির কঠিন নিয়ন্ত্রণ, বাস্তব তথ্যের প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠা এবং বিতর্কের সময় নিষ্ঠুর আঘাতে প্রতিপক্ষকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতা—এসব ছাত্রদের ক্ষেত্রে রূপ নিয়েছে অন্তঃসার-হীন অভিনতাসুলভ ষ্টাইলে। আসল এবং মৌলিক মোসবী ষ্টাইল মানুষ মোসবীকে করে তুলেছে বিদ্বেষের পাত্র, যার ফলে তার চাকরী গেছে। চাকরীর মেয়াদ শেষ হবার সাত বছর আগে রিটায়ার করতে রাজী হওয়ার বিনিময়ে প্রিন্সটন য়ুনিভার্সিটি তাকে চল্লিশ হাজার একশো ডলার দিতে চেয়েছিল। তার আলোচনার ধরণটা য়ুনিভার্সিটির

বিদ্বজ্জন সমাজের এতোই অসহ্য। কোন টেলিভিসন প্রোগ্রামে মোসবীকে কেউ কখনও ডাকেনা। সে যেন অ্যামেরিকান গৃহযুদ্ধের গেরিলা যোদ্ধা মোসবী। যেখানে সে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়, সেখানে আর সবাই মরে যায়।

মোসবী খুবই যত্নের সঙ্গে পড়েছে সান্তায়ানা, মালরো, জাঁ পল সাত্র, বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও অন্যান্যদের স্মৃতিকাহিনী। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এদের কেউই বিশ্বস্তভাবে বা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সহ্য নয়। এইসব মানুষের জীবন চিন্তার জন্য উৎসর্গীকৃত, তারা জনজীবনের বিশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে, সেই বিশৃঙ্খলাকে তারা বুদ্ধিজীবি-নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছে, তারা মানুষকে বাচাবার জন্য আইডিয়া খুঁজেছে, মানুষ যেন নিজের মুক্তি খুঁজে পায় সে জন্যে তারা মনের দিকে মানুষকে সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু বিশেষ মুহূর্তে এরাই আবার কি ভয়ঙ্কর নির্বোধ। উদাহরণ হিসেবে অস্তিত্ববাদী জাঁ পল সাত্র্র কথাই ধরা যাক। সাত্র্ রাশিয়ানদের বললেন, প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ ঘাঁটিগুলোতে অ্যাটম বোমা ফেলো, কারণ অ্যামেরিকা এখন এক ভয়ংকর দানব। সাত্র্ কালো মানুষদের বললেন, সাদা চামড়ার মানুষদের খুন করো। নীতিবাদী দার্শনিক। কিংবা রাসেল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেল ছিলেন শান্তিবাদী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি পশ্চিমী শক্তিদের ডাক দিলেন, রাশিয়াকে ধ্বংস করো। এবং স্মৃতিকাহিনীর কোথাও কোথাও যুক্তির বালাই নেই। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একটা জার্মান জেপলিন লণ্ডনে গুলি করে নামানো হলে, নিহত জার্মানদের শরীর মাটিতে পড়ছে দেখে রাস্তার হৃদয়হীন মানুষের আনন্দ প্রকাশ করছিল। দেখে রাসেল কাঁদলেন। এবং সে রাতে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে যদি তাঁর প্রেমের শয্যায় এক সুন্দরী রমণী না থাকতো, মানবজাতির হৃদয়হীনতা দেখে তাঁর হৃদয় নাকি চিরতরে ভেঙে যেতো। যে কথাটা তিনি বললেন না, তা হলো এই যে জেপলিনচারী ওই জার্মানরা লণ্ডনে বোমা ফেলতে

এসেছিল, ছিল। সেই বোমায় রাস্তার হৃদয়হীন মানুষেরা যেমন উড়ে যেত, তেমনি প্রেমের শয্যায় প্রেমিক-প্রেমিকারাও বাঁচতোনা। এই সত্যটা মোসবী দেখতে পায়।

সে আন্তরিকভাবে আশা করে—এতোক্ষণে মেসক্যালের নেশা তার লেখনভঙ্গী বদলাতে চাইছে— যে মোসবী বুদ্ধিজীবিদের এই সাধারণ নিয়তি এড়াতে পারবে লাষ্টগার্টেন সংক্রান্ত হাল্কা ব্যাপারগুলো এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। অহঙ্কার একটা ভুল, তা সংশোধন করতে হবে রঙ্গ রসিকতা করে, হাসি দিয়ে।

আব কুড়ি মিনিট পরে ট্যুবিষ্টদের মিটলার ধ্বংসাবশেষ দেখাতে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ী আসবে। এখনও মোসবীর লেখার সময় আছে। সে লিখছে যে সেপ্টেম্বরে আবার যখন লাষ্টগার্টেনের সঙ্গে দেখা হল, লোকটার ওজন অন্ততঃ পঞ্চাশ পাউণ্ড কমে গেছে। রোদে পুড়ে কালো, চামড়ায় ভাঁজ, নোংরা দাগ ধরা স্যুট, চোখের কোলে পুঁজ। ও বললো, সারা গ্রীষ্মকাল ও আমাশয় ভুগেছে।

'ওরা বিদেশী ভি, আই, পি-দের কি খাওয়ালো? এবং লাষ্টগার্টেন —লাজুক অথচ তিক্ত, রোগা মুখ, লাল চোখ আধ্যাত্মিক বা আধি-দৈবিক কোন যোগাযোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে, লাষ্টগার্টেন প্রসঙ্গে যা মোসবী কোনদিন ভাবেনি।

'একটা চেন গ্যাং। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ব্যাপারটা আমি বুঝিনি। ভেবেছিলাম, আমাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। দেখা গেল, আমরা রাস্তাঘাট তৈরীর জন্যে ডেকে আনা বিদেশী ভলান্টিয়ার-দের একটা লেবর ব্রিগেড। কাজ করতে হয়েছে পাহাড়ী এলাকায়। সমুদ্র দেখার সুযোগ পাইনি। রাতে মাথা গোঁজার মত আশ্রয় ছিল না। মাটিতে শুতে হতো। খারাপ তেলে ভাজা জঘন্য খাবার খেতে দিতো।'

'পালিয়ে এলেনা কেন?

'কোথায়? কি ভাবে?'

'বেলগ্রেডের মার্কিন দূতাবাস গেলেনা কেন?'

'কিভাবে যাবো? আমি তো অতিথি। ওদের খরচে গেছি। রিটার্ণ টিকিট ওদের হাতে।'

'টাকা ছিল না?'

'ঠাট্টা করছো? একটা পয়সা ছিলোনা। পোকায় কামড়াতো, ক্ষিদে পেতো। সারা রাত বার বার পায়খানায় যেতাম। সারাদিন রাস্তায় কাজ করতাম। চোখে পুঁজ জমছিল।'

'ফার্ষ্ট এডের ব্যবস্থা ছিল না?'

'ফার্ষ্ট এড হয়তো ছিল, কিন্তু অসুস্থতার জন্যে দ্বিতীয়বার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ওদের নেই।'

...ট্রুডির কথা ইচ্ছে করেই বললো না মোসবী। লাষ্টগার্টেনকে ডিভোর্স করেছে ট্রুডি।

বলা বাহুল্য, অনুকম্পাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

মোসবী মাথা নেড়েছে।

রোগা শরীরেও এক ধরনের মর্য্যাদাবোধ—দূরে চলে গেছে লাষ্টগার্টেন। পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র দুইয়ের সম্বন্ধেই তার অভিজ্ঞতা বেশ মজার।

এই শেষ?

না, ঠিক এখানে শেষ নয়।

...লাষ্টগার্টেন এবং মোসবীর আবার দেখা হয়েছিল। পাঁচ বছর পরে। ন্যু ইয়র্কের একটা লিফটে উঠেছে মোসবী। সাতচল্লিশ তলায় র‍্যাংলে ফাউণ্ডেশনের এক্সিকিউটিভ ডাইনিং রুমে যাবে বলে এক্সপ্রেস লিফটে চড়েছে। লিফটে আর একজন মাত্র প্যাসেঞ্জার। লাষ্টগার্টেন! দাঁত বার করে হাসছে। আগের মত ফুলে-ফেঁপে উঠেছে লোকটা।

'লাষ্টগার্টেন!'

'উইলিয়ম মোসবী!'

'কেমন আছো লাষ্টগার্টেন ?'

'খুব ভালো আছি। সব বদলে গেছে। সুখে আছি। জীবনে সফল হয়েছি। বিয়ে করেছি। বাচ্চা হয়েছে।'

'ন্যুইয়র্কে ?'

'অ্যামেরিকায় কখখনো থাকবো না। বিশ্রী জায়গা, মানুষের অযোগ্য। এখানে আমি বে·াতে এসেছি।'

যন্ত্রের আপন নির্ভুল নিয়মে আমাদের তু'জনকে নিয়ে লিফটে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সেই একই লাষ্টগার্টেন। জোরালো কথা বলে, গলার স্বর নরম, জ্যাপোটেক কাঠামোর নাক এবং নীচে ব্যাঙের হাসি।

'কোথায় যাচ্ছো ?'

'ফরচ্যুন পত্রিকার অফিসে।'

'তুমি ভুল লিফটে উঠেছো। আবার নামতে হবে তোমার।'

...সাতচল্লিশ তলায় পৌঁছে তুজনে লিফট থেকে বের হলাম।

'কোথায় থাকো ?'

'অ্যালজিয়ার্সে। আমরা একটা লনড্রি খুলেছি।'

'আমরা ?'

'আমি ও ক্লোনস্কি। ক্লোনস্কিকে মনে আছে ?'

ওরা এখন বেআইনী ধান্দা ছেড়ে আইনসম্মত ব্যবসা করছে। লাষ্টগার্টেন এখন ক্লোনস্কির বোনকে বিয়ে করেছে। ওর বউয়ের ফটো দেখলাম। ঠিক ক্লোনস্কির মত দেখতে। বেড়ালের মত মুখ, কোঁকড়ানো চুলের হিংস্র আড়ালে ঘেরা মুখ, মুখের বিভিন্ন তুটো সমতলে তুটো চোখ—পাবলো পিকাসোর আঁকা ছবির মতো। এবং দাঁতগুলো ধারালো। প্রবালপ্রাচীরে ঘুমোবার সময় যদি মাছেরা তুঃস্বপ্ন দেখতো, ওদের দাঁতগুলো ওইরকম দেখাতো। ওর ছেলেমেয়েরাও ক্লোনস্কির মতো দেখতে। ফটোগুলো আফ্রিকান চামড়ার ওয়ালেটে রেখেছে লাষ্টগার্টেন। ওর হাসিমুখ দেখতে দেখতে মোসবী বুঝতে পারে, লোকে যেমন আফিমের নেশা করে সব ভুলে থাকে,

তেমনি নিজের সাফল্য নিয়ে গর্ব করে কৃত্রিম স্বর্গে থাকতে চাইছে লাষ্টগার্টেন।

'আমি ভাবলাম, কিভাবে আমরা উত্তর আফ্রিকায় সফল হলাম, সেই ঘটনাগুলো হয়তো ফরচ্যুন পত্রিকা ছাপবে।'

আমরা আবার হ্যাণ্ডশেক করলাম। আমার হাত, যে হাত একদিন ফ্র্যাংকোর হাত ছুঁয়েছিল। ওর হাত, যে হাত একদিন ক্যাডিলক গাড়ীর ড্রাইভিং হুইলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আলোকিত বাক্সের মত লিফটটা দরজা খোলে। ও ভেতরে ঢোকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর- –

তারপর, বলা বাহুল্য অ্যালজেরিয়ানরা ফরাসীদের তাড়িয়েছে এবং ইহুদীদের দেশ থেকে বার করে দিয়েছে। এবং ইহুদী পিতা লাষ্ট-গার্টেনকে পালাতে হয়েছে নিশ্চয়ই। স্নেহময় পিতৃত্ব! লোকটা ওই বাচ্চাগুলোকে ভালোবাসে। এবং দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, সন্তান উৎপাদন সৃজনীপ্রতিভার নিকৃষ্টতম প্রকাশ।

তবুও ··

মেসকালের নেশার ঘোরে মোসবী ভাবছে—

আমার বাবা-মা দুজনের একটা কমিটির মতো একমত হয়ে আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন।

যদিও মিটলায় যাবার গাড়ীটা এসে গেছে, বিকেলের পাহারগুলোর দৃশ্য দেখতে দেখতে মোসবী এই কবিতাটা লিখে ফেলে—

যখন সে ছোট্ট ছেলে।

লোকে তার যত্ন নিতো।

গরম স্যুপ ঠাণ্ডা করে দিতো, গান গাইতো, আদর করতো, পায়ে পরিয়ে দিতো লম্বা মোজা।

আর ঘুমিয়ে পড়লে কোলে তুলে নিয়ে যেতো ওপর তলায়।

ওর মনে আছে—

তার বাবার গভীর নাভি।
মায়ের উরুতে নীল শিরার রেখা।

মা-বাবা যখন বিদায় নিলো মৃত্যুর আড়ালে।
সে নিজের কাজ এখন নিজেই করে—
খুব বিনীত ভঙ্গীতে নয়, খুব ভালোভাবে নয়।
কিন্তু আজ এখানে সে মেক্সিকোর বাদামী রং পাহাড় দেখছে যার
স্থূল শরীরের আড়ালে।
কত মৃত পরিবারের কঙ্কাল-করোটি।

ওয়েলস থেকে আসা দুই মহিলা এখন তার ভ্রমণসঙ্গী। একজন বয়সে প্রাচীনা। মহিলা ভ্রমণকারীদের ডিউক অফ ওয়েলিংটন কিম্বা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ফিল্মে সি, অব্রে স্মিথ নামের যে অভিনেতা গুর্খা রেজিমেন্ট পরিচালনা করতো সিনেমার পর্দায়, তার মতো দেখতে। মস্ত বড় নাক, প্রকাণ্ড চোয়াল, ঠোঁটে ভাঁজ, বেশ একটু গোঁফ আছে। অন্যজনের বয়স কম। তার গালদুটো গোলগাল, কালো চোখে রসিকতার ইঙ্গিত। জুড়িটা বেশ। ভদ্র। ইংরেজরা যেমন হয়। অধিকাংশ অ্যামেরিকানের মতো মোসবীও ইংরেজদের এই সব গুণের অধিকারী হতে চায়। ওয়েলস থেকে আসা দুজন মহিলাকে তার পছন্দ। কিন্তু গাইড তার পছন্দ নয়। বড্ড রোগা। গালে লাল মাটির রং। তাছাড়া লোকটা বড্ড জোরে গাড়ী চালায়। গাড়ী প্রথম থামলো টুলে-তে। ওরা গাড়ী থেকে নেমে গীর্জার প্রাঙ্গণে টুলের বিখ্যাত সেই গাছটা দেখলো। দু হাজার বছরের পুরোনো, জটিল, ছায়াঘেরা সবুজ সাইপ্রাস। অদৃশ্য হ্রদের গভীরে তার মূল। সে সাদা-কালোয় মেশানো, চাষীদের তৈরী এই ছোট্ট গির্জাটা এবং এদের ধর্ম থেকে অনেক প্রাচীন। ধুলোর মধ্যে শুয়ে আছে একটা কুকুর। প্রাচীনতাকে সে সম্মান দেখায় না। কিন্তু

সচেতনভাবে নয়। বৃদ্ধা মহিলা মাথায় স্কার্ফ বেঁধে দুঃসাহসী ভঙ্গীতে গির্জায় ঢুকলেন। কষ্ট করে হাঁটু গেড়ে বসার ভঙ্গিমার মধ্যে গুণ ছিল। নিশ্চয়ই খৃষ্টান। টুলের গভীরে তাকায় মোসবী। এখানে একটা পৃথিবী, অনেক মানবসমাজ থাকতে পারে। জেরাল্ড হার্ড এমন এক জীবনবৃক্ষের কথা কল্পনা করেছিলেন, যেখানে বাসা বেঁধেছিল মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা। কিন্তু বাস্তব স্বর্গোদ্যান সংক্রান্ত সোনালী রূপকথাকে সমর্থন করে না। আদিম মানুষ মাটিতে ছুটে বেড়াতো, তারা হিংস্র ছিল, তারা সবকিছুকে হত্যা করতো। কিন্তু তবুও সেই আততায়ীদের উত্তরাধিকারীরা যে শান্তির স্বপ্ন দেখছে, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। মোসবী ভাবে—আমার ধর্ম এই বৃক্ষের মত। গির্জা আমার জন্যে নয়।

এখান থেকে যেতে তার মন চায়না। তাকে যদি এখানে থাকতে হতো, সে থাকতো গাছের মগডালে। কেননা নীচের ডালে থাকলে অন্যদের পায়খানা মাথায় পড়বার সম্ভাবনা। ওয়েলস-থেকে-আসা ভদ্রমহিলারা গাড়ীতে চড়েছেন। গাইড মোড়লী করে হর্ন বাজাচ্ছে। গরমের মধ্যে অপেক্ষা করা আরামদায়ক নয়।

মিটলায় যাবার রাস্তাটা ফাঁকা। গরমে ল্যাণ্ডস্কেপ সুন্দর অথচ সর্পিল হয়ে উঠেছে। ড্রাইভার ভূতত্ব ও পুরাতত্ব জানে। যেভাবে ও জ্ঞান বিলোচ্ছে, তার ধারণটাই বিশ্রী। দ্য ওয়াটার টেবলস, দ্য ক্যাভার্নস, দ্য ট্রায়াসিক পীরিয়ড। আর জ্ঞান চাইনা। আর বিশদ বিবরণে আমার প্রয়োজন নেই। আমি যা জানি, তারই ব্যবহার জানিনা। এবং এইভাবে এক সময় মিটলা দেখা যায়। ডানদিকের রাস্তাটা গেছে তেহুয়ানতেপোকের দিকে। বাঁদিকে 'আত্মার নগরী!' এখানে বৃদ্ধা মিসেস পারসনস (এলসি ক্ল্যুস পারসনস) ফলের খোসায় ভরা রোদেজ্বলা রাস্তায় ইণ্ডিয়ানদের জীবনধারা নিয়ে রিসার্চ করেছেন। গাছের ছায়ায় ছায়ায় প্রস্রাবের গন্ধ। লম্বা পাতলা একটা শূকর। না, শূকরী। মোসবীর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি পেছনে

থেকে শূকরীর ছোট্ট যোনিদ্বারটা দেখে। মাটি যেমন মানুষকে, তেমনি পশুদেরও খাদ্য জোগায়।
কিন্তু এখানে বিস্ময়কর সুন্দর সব প্রাচীন মন্দির। ভাঙাচোরা হয়নি। স্পেনিশ খৃষ্টান যাজকেরা এগুলো ভাঙেনি। অন্য জায়গায় তারা মন্দির ভেঙেছে, প্রাচীন মন্দিরের পাথর নিয়ে গির্জা গড়েছে।
ট্যুরিষ্টদের জন্যে বাজার। রুক্ষ সূতীর কাপড়। ময়দার মত সাদা। ত্রিপলের নীচে ঝুলছে ইণ্ডিয়ানদের এমব্রয়ডারী। মৃৎপাত্রগুলোতে ধূলো জমছে। কালো স্যাক্সোফোন, পোড়ামাটির কালো ট্রে।
ব্রিটিশ মহিলা ভ্রমণসঙ্গিনী দুজন এবং গাইডের পেছন যেতে যেতে মোসবীর মনে হয় যেন সে মরে গেছে। মরে যেয়েও সে বেঁচে আছে। মোসবীর হিসেবে শেষ অবধি বেঁচে থাকা তার নিয়তি। তার কল্পনায়, এই তার নরক, এই তার শাস্তি। এবং কখন হয়েছিল মৃত্যু? অনেক দিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্টে। গাড়ী ভেঙে চুরমার হয়েছিল। আসল মোসবী মরে গিয়েছিল। কিন্তু আর একজন মোসবীকে গাড়ী থেকে টেনে বার করা হয়েছিল। একজন সৈনিক প্রশ্ন করেছিল—'ও, কে?'
হ্যাঁ, সে ভালো আছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে দূরে গেছে সে। কিন্তু এখন প্রতি পদক্ষেপ, প্রতিটি মুহূর্ত তাকে এইভাবে বাঁচতে হবে। এবং এখন কাকাতুয়া ডাকছে, বাচ্চা ছেলেরা জ্বালাচ্ছে, মেয়েরা চেঁচাচ্ছে, তার জুতোয় ধূলো জমেছে। সে স্মৃতিকাহিনী লিখতে লিখতে একটা হাস্যকর লোকের চরিত্র খুঁজতে খুঁজতে লাষ্টগার্টেনকে খুঁজে পেয়েছে। স্যার হ্যারল্ড নিকলসনের স্মৃতিকথার ধরণে। অবশ্য অতোটা পরিশীলিত নয়। কিন্তু প্রোটোকল অনুযায়ী, ডিপ্লোমেসীর ভাষায়, ম্যাণ্ডারিনদের বিদ্রূপমেশানো ভঙ্গীতে। কিন্তু কিছু কিছু সত্য সে লেখেনি। যেমন—
ট্রুডিকে অ্যালফ্রেড রাস্কিনের সঙ্গে দেখা যাবে, ব্যবস্থাটা করেছিল মোসাবীই। কেননা লাষ্টগার্টেন যখন রাইন নদী পেরোচ্ছে, তখন

তার বউ ট্রুডিকে আলিঙ্গনে বেঁধেছে মোসবী। অবশ্য লর্ড বাট্রাণ্ড রাসেলের সুন্দরী বান্ধবীর মত ট্রুডি বুদ্ধিজীবির আদর্শনিষ্ঠ, থেকে অদ্ভুত আত্মিক সংকটে মোসবীকে সান্ত্বনা দেয়নি। কিন্তু মোসবী ট্রুডিকে লাষ্টগার্টেনের কাছ থেকে দূরে যেতে বলেনি। সে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। কিন্তু তার ধারণাটা—যে লাষ্টগার্টেন একটা হাস্যস্কর লোক—সেই ধারণাটা ট্রুডিকেও ছুঁয়েছে। এরকম একটা ভাঁড়ের সঙ্গে থাকতে রাজী হয়ছিল ট্রুডি। কিন্তু লাষ্টগার্টেন সত্যিই একটা ভাঁড়। দার্শনিক কঁৎ-এর চোখে নেপোলিয়ঁ যেমন—বেমানান, সময়ের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে। নিষ্কর্মা হয়েও লোকটা বড়ো হবার চেষ্টা করছে। নেপোলিয়ঁ হতে চেয়েছে, ক্রোড়পতি হতে চাইছে, ইউরোপ জয় করতে চাইছে, হিটলারের পতমের পর যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তার সুযোগ নিয়ে বড লোক হতে চেয়েছে। লোকটার কল্পনাশক্তি কম, মৌলিকতা নেই, পুরোনো আইডিয়াব পেছনে ছোটে এবং এতো অপটু! লাষ্টগার্টেনের অস্তিত্বের কোন যুক্তি নেই। তাই লোকটা হাস্যস্কর। ট্রুডিও হাস্যস্কর। ওর পেটটা কি বিরাট ছিল। কিছু কিছু লোকের জন্মের সময তাদের অজাত ভাই বা বোনের ভ্রূণ তাদেরই শরীবে থেকে যায়। অতিরিক্ত একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। যেমন চোখের প্রাথমিক কিছু অংশ পায়ের মধ্যে রইলো কিম্বা কানের সুরুর অংশটা রইলো পিঠে। মোসবীর মনে হতো, ট্রুডির পেটের ভেতরে ওর ছোট্ট একটা বোন লুকিয়ে আছে। তাব কাছে ট্রুডি ছিল ক্লাউনের মত। কিন্তু তাব মানে এই ময় যে সে ট্রুডিকে ঘৃণা করতো। না, সে ট্রুডিকে পছন্দ করতো। তার এক দিকের চোখটা ঘুরতো নিজস্ব বলয়ে। সে সেণ্টের ব্যবহার বুঝতোনা।

এই সময়, মোসবী মানুষদের নিযে ঠাট্টা তামাসা করতো।

'কেন?'

'যেহেতু তার প্রয়োজন ছিল।'

'কেন?'

'যেহেতু !'

···গাইড বোঝাচ্ছে, মর্টার ছাড়াই এই বাড়ীগুলো তৈরী হয়েছে। পূজারীদের অঙ্ককষার ভুল ছিল না? পাথর একেবারে সঠিক মাপে কাটা হয়েছে। এতো শতাব্দী পরেও দুটো পাথরের ফাঁকের মধ্যে একটা দাড়ি কামানো ব্লেড ঢোকানো যাবেনা। জ্যামিতির নিয়মে নিখুঁৎ কাটা পাথরগুলো নিজেদের ওজনের দরুণই ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এখানে থাকতো আদিম সেই পুরোহিতেরা। দেয়ালটা রং করা। লাক্ষাকীট কিম্বা ক্যাকটাস—উকুনের রসে রাঙানো। এখানে ছিল যজ্ঞবেদী। যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, সেখানে বসতো দর্শকেরা। পুবোহিতেরা ছুরি ব্যবহার করতো। সুন্দর যুবকেরা বাঁশী বাজাতো। তারপর বাঁশী ভেঙে যেতো। রক্তাক্ত ছুরিটা মাথাব চুলে মুছে নিতো জহ্লাদ। তার চুল নিশ্চয়ই জট বেঁধে যেতো। এবং এখানে, অভিজাত নরনারীর কবর। সিঁড়ি নীচেব দিকে নেমে গেছে। অ্যাজটেক সভ্যতার প্রভাবে জ্যাপোটেকরা পববর্তীকালে নববলির অনুষ্ঠান কবতো।

·· ওয়েলস থেকে আসা বুড়োটা বেশ সুন্দব। পাতালগহ্বরে ঢুকতে বেরোতে ওর সাহায্যেব দরকাব হয় না।

বলা বাহুল্য—

বলা বাহুল্য. তোমার পক্ষে নিজেকে মনোবম ও বাঞ্ছনীয় ব্যক্তিত্বের মানুষে পবিণত করা সম্ভব ছিলনা কারণ যে কাজ করতেই হবে, সেকথা না ভেবে নিজেকে ইচ্ছেমতো বদলানো যায় না। অবশ্য পালনীয় কাজ। জরুরী কাজ। জরুবী, ব্যাপক এবং ভয়ংকর। কর্তব্যের বাধ্যবাধকতা, যা মানুষকে পঙ্গু করে। যে প্রয়োজনের চাপে মানুষ কুৎসিত হয়ে ওঠে। এই লোকটা সিক্রেট সার্ভিসের ডাইরেক্টর। ওই লোকটা খুনী।

স্মৃতিকাহিনীর কাঠিন্য একটু নরম করবে বলে লাষ্টগার্টেনকে ফিরিয়ে এনেছে মোসবী। লাষ্টগার্টেন, যার সর্বনাশ এই কমেডীর বিষয়।

ল্যাণ্ডগার্টেন, যার অস্তিত্বের কোন যুক্তি ছিলনা। কিন্তু সে, মোসবী অন্য এক সৃষ্টি, পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ, সে দাঁড়িয়ে আছে রোদের মধ্যে পাথরের ব্লকগুলোর ওপরে, পাতালপুরীতে নামার সিঁড়ির ধাপে। হ্যাঁ, সে সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ। সে নিজেকে এই গভীর চিন্তাশীল, হাসতে নারাজ, পাথর, লোহা, অসংগত নিরর্থক আকারে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে।

যা কিছু মানবিক, সব কিছু থেকে মুক্ত হয়েছে বলে এখন তার পক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখীন হওয়াই উচিত।

তাই কি ঘটবে?

কিন্তু মানবিক সব কিছু থেকে মুক্ত হলে সম্মুখীন হওয়ার মতো কোনে ঈশ্বর থাকে কি?

…কিন্তু ওরা তাকে নীচে গোরস্থানে নিয়ে গেছে। ভারী একটা গ্রিল। গেট। পাথরগুলো প্রকাণ্ড। ভল্টটা বন্ধ। তার গুমট লাগে। তার ভয় হয়। বড্ড স্যাঁৎস্যাঁতে বিস্তারিতভাবে আঁকা-বাঁকা—খোদাই-এরা দেয়ালে সরু সরু নিয়ন আলোর টিউব। আবহাওয়া থেকে জল শুষে নেবার জন্যে বাক্সভর্তি চূণ। তার হৃদ্‌পিণ্ড পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তার ফুসফুসে হাওয়া ঢুকছেনা। জেসাস! আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিনা। এখানে বন্ধ থাকা! এখানে মরে যাওয়া! যদি তাই হয়? অ্যাক্সিডেণ্ট তো শেষ হয়, কিন্তু যদি অস্তিত্বের মত সবকিছু শেষ না হয়? মৃত! মৃত! ঝুঁকে পড়ে ও দিনের আলো খোঁজে। হ্যাঁ, আছে। আলো আছে। জীবনে মুক্তি, লাবণ্য ও করুণা এখনও আছে। যদি নাও থাকে, তবু তো বাতাস আছে। সময় থাকতে তার কাছে যাও।

'আমাকে বাইরে যেতেই হবে।'

মোসবী গাইডকে বললো।

'মহিলারা, আমার নিঃশ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।'

* * *

পার্ল এস বাক

১৯৩৮এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন অ্যামেরিকান মহিলা-লেখিকা পার্ল এস বাক। সেকালের চীনের কৃষকজীবনের দুর্দশা ও যন্ত্রণার জীবনধর্মী আলেখ্য তাঁর গুড আর্থ উপন্যাস। কিন্তু পরবর্তীকালে মাও সে-তুং এর বৈপ্লবিক নেতৃত্বে চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের গুরুত্ব অনুধাবনে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং স্যাটান নেভার স্লীপস-এর মত কম্যুনিস্টবিরোধী উপন্যাস লিখেছিলেন। আঙ্গিক ও শিল্পবোধের মানদণ্ডে তাঁকে কখনোই হেমিংওয়ে, ফকনার প্রমুখ নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী অন্যান্য অ্যামেরিকান সাহিত্যিকের সমতুল্য বলা চলে কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।



আততায়ী প্রেম

পাল. এস, বাক

এপ্রিল মাস। লণ্ডনে তখন বসন্ত নেমেছে। পিটারসনের মৃতদেহটা টেমস নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল। ছাব্বিশ বছরের যুবক পিটারসন। সকালে কারখানায় কাজ করতে যাবার সময় বয়লার মিস্ত্রী মিস্টার ব্রাউন প্রথম মৃতদেহটা দেখতে পায়। আশ্চর্য্য হয়ে যায় ব্রাউন। সারা শরীর তার ভয়ে কাঁপতে থাকে। তার চল্লিশ বছরের জীবনে এরকম মর্মান্তিক দৃশ্য সে দেখেনি। ডিটেকটিভ গল্পের বইয়েই শুধু পড়েছে। কোন মতে সাইকেল চালিয়ে সে ফিরে এলো। খবর দিয়ে দিল গ্রামে।

পিটারসন জীবিকায় ছিল ইঞ্জিনিয়ার। বন্ধু স্মিথের নিমন্ত্রণে সে গ্রামে সাত দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসেছিল। পিটারসনকে নিমন্ত্রণ করার পেছনে বন্ধু স্মিথের একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার একমাত্র সুন্দরী বোন মার্সেলার সঙ্গে পিটারসনের বিয়ে দেওয়া। আগেই স্মিথ কিছুটা আভাস দিয়েছিল বন্ধু পিটারসনকে। মার্সেলা সত্যিই নিখুঁত সুন্দরী। মার্সেলার যৌবন জল-টলমল পদ্মদীঘির জল। পীনোন্নত স্তন, ক্ষীণ কটি এবং সুঠাম শরীর নিয়ে এই মার্সেলা। সরোবরের রাজহংসী বলে মনে হয় তাকে।

ব্রাউনের মুখে অবিশ্বাস্য খবরটা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। বিনা মেঘে বজ্রপাত। হঠাৎ গতকাল সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেরিয়ে পিটারসন আর ফিরে আসেনি।

স্মিথ ও মার্সেলা ভেবেছিল, পরিচিত কোন লোকের বাড়ীতে বুঝি ও রাতটা

থেকে গেছে। পিটারসন গ্রামে প্রথম এসেছে। পথ-ঘাট তার অচেনা। ৮
খবরটা শুনে মার্সেলা মূর্চ্ছা গেল। এই অল্প সময়েই মার্সেলা পিটারসনকে ভালোবেসে ফেলেছিল। পিটারসনও তাই।
স্মিথ ও মার্সেলার সঙ্গে গ্রামের অনেকেই জায়গাটা দেখতে এলো। কিন্তু একি। শুধু তো পিটারসনের মৃতদেহটা নেই। টমাস ব্লেকেরও মৃতদেহটা অদূরে পড়ে রয়েছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। শুধু একটা মৃদু শব্দ তুলে টেমস নদী বয়ে চলেছে আপন মনে। অনেকক্ষণ পর সবাই কথা বলে উঠলো। একজন বুড়ো মানুষ বললেন, আমাদের শোকে ভেঙে পড়লে চলবে না। এক্ষুনি পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত।
মার্সেলা কাঁদতে কাঁদতে পিটারসনের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে একজন মার্সেলার হাত ধরে বললো, মার্সেলা, তুমি শক্ত হও। তুমি মৃতদেহ ছুঁলে তোমার হাতের ছাপ পড়ে যেতে পারে। পুলিশ তোমায় সন্দেহ করতে পারে। এ কথাটাকে সবাই সমর্থন করলো সঙ্গে সঙ্গে।
মার্সেলা চেয়েছিল পিটারসনের মৃতদেহের পাশে বসে তার ঠোঁটে শেষ চুম্বন এঁকে দিতে। কিন্তু তার মনের সাধ পূর্ণ হোলো না। কিছু লিলিফুল তুলে মার্সেলা পিটারসনের বুকে ছড়িয়ে দিল শুধু। লাল ফুলগুলো যেন মার্সেলার প্রেমের শেষ উপহার। পিটারসনের জন্যে সবাই দুঃখ জানালো। কেন এই নিষ্ঠুর খুন করা হোল? একজন বললো।
এই গ্রামে পিটারসন নতুন অতিথি। তার তো এখানে কোন শত্রু থাকা সম্ভব নয়? টমাস ব্লেকই বা খুন হোল কে করে? সে তো স্থানীয় ছেলে? পৃথক পৃথক মন্তব্য সকলের।
তবে কি টমাস ব্লেকের সঙ্গে পিটারসনের কোন গোপন শত্রুতা ছিল? স্মিথ ভাবতে লাগলো। শেষে সবাই বললো, কোন ব্যাপারে এঁরা পরস্পর পরস্পরকে খুন করেছে বা খুন করতে বাধ্য হয়েছে। মার্সেলা নিশ্চুপ। শুধু কাঁদছে।
পুলিশকে খবর দেওয়া হোল। খবর পেয়েই পুলিশ এলো। পুলিশের সঙ্গে এলেন মাইকেল স্কট। মাইকেল স্কট একজন বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞাত গোয়েন্দা। ইংল্যাণ্ডের অনেক শক্ত শক্ত কেস অনায়াসে সমাধা করে নাম

খুনের কিনারা চাও ? তাছাড়া আমি আশা করি, পিটারসনকে প্রথম সাক্ষাতে তুমি ভালোবেসে ফেলেছিলে ?'

'আপনি কি প্রশ্ন করবেন করুন।' মার্সেলা দুঃখ পেয়েছে, ওর গলার স্বরে বোঝা গেল ?'

'এই খুনের ব্যাপারে তোমার কি অভিমত ?'

'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। ভগবান যে এতো নিষ্ঠুর, জানতাম না।'

'টমাস ব্রেক ছেলেটি তো তোমাদের গ্রামেই থাকতো। নিশ্চয়ই তুমি তাকে চেন ? কেমন ছেলে ছিল ?'

'টমাস ব্রেক অত্যন্ত বখাটে ছেলে ছিল। নেশা করতো, বদ মেয়েদের সঙ্গে মিশতো। গ্রামের কেউই তাকে ঘাটাতো না। কারণ টমাস ব্রেক বদ মেজাজী ও গুণ্ডা ছিল।'

'নিশ্চয়ই তোমার মতো সুন্দরী মেয়েকে জ্বালাতন করতো ?'

'আমার বিয়ে করার জন্যে ইদানিং পাগলা হয়ে উঠেছিল। আমাকে ও দাদাকে ব্রেক ভয় দেখাতো।'

'কি চাকরী করতো টমাস ব্রেক ?'

'টারবাইন মেরামতের মিস্ত্রী ছিল।'

'পিটারসনকে দেখার আগে তুমি কাকে কাকে মনে মনে ভালোবাসতে ? আমি জানি, ভালোবাসাটা কোন অন্যায় নয়। যৌবন ক্ষণস্থায়ী। যৌবনকালে যদি কাউকে ভালোবাসা না যায়, তাহলে বৃথাই সে যৌবন। এতে লজ্জার কিছু নেই।' মাইকেল স্কট জানেন, একজন সদ্য-যুবতী মেয়ের পেট থেকে কি করে কথা বার করতে হয়।

'ঠিক ভালোবেসেছিলাম কিনা জানিনা। তবে মিঃ ম্যাকেঞ্জীকে কেমন যেন আমার ভাল লেগেছিল।'

'কে এই মিঃ ম্যাকেঞ্জী ?' অধীর আগ্রহে মাইকেল স্কট জিজ্ঞেস করলেন।

'গ্লাসগোর একটা কলেজের লেকচারার। আমাদের গ্রামে তার দিদি থাকেন। কলেজে ছুটি হলেই গ্রামে বেড়াতে আসেন। এবারও এসেছিলেন। আমি কিন্তু মিঃ ম্যাকেঞ্জীকে ঠিক স্বামী হিসেবে বেছে ফেলিনি। লোকটা খোঁড়া।

আর এইখানেই আমার অনিদ্রা। অবশ্য ভদ্রলোক খুব অমায়িক এবং ভদ্র। হ্যাঁ, আমি টমাস ব্লেকের জ্বালাতন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মিঃ ম্যাকেঞ্জীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতাম। তার হাত ধরে টেমস নদীর ধারে গিয়ে বসতাম; টমাস ব্লেককে দেখিয়ে দেখিয়ে। যাতে দুষ্ট গ্রহের মতো সে আমার জীবন থেকে সরে যায়।'

'মার্সেলা, তোমায় অনেক ধন্যবাদ।' এই বলে মাইকেল স্কট চলে গেলেন।

পথে আসতে আসতে মাইকেল স্কট ভাবতে লাগলেন, মিঃ ম্যাকেঞ্জীকে কি খুনী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? কিন্তু একজন খোঁড়া লোক কি করে দুজন শক্ত সমর্থ যুবককে এক সঙ্গে হত্যা করতে পারে পিস্তল ছাড়া?

তাছাড়া মিঃ ম্যাকেঞ্জী শিক্ষিত ভদ্র এবং অমায়িক। এর মধ্যে স্মিথের কোন ভূমিকার সম্ভাবনা আসতে পারে? হয়তো স্মিথ চেয়েছিল তার বোন মার্সেলার সঙ্গে মিঃ ম্যাকেঞ্জীরই বিয়ে হোক। কিন্তু বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে গুণ্ডা টমাস ব্লেক। তাই সে স্বাস্থ্যবান পিটারসনকে নিমন্ত্রণ করেছিল যাতে ধাক্কা লড়াই বাধে। তাহলে মিঃ ম্যাকেঞ্জীর পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। স্মিথের দেহেও কম শক্তি নেই।

মিঃ ম্যাকেঞ্জীর দিদির বাড়ীতে উপস্থিত হলেন মাইকেল স্কট। মিঃ ম্যাকেঞ্জীর দিদি মাইকেল স্কটকে অভ্যর্থনা করে ঘরে বসালেন। মধ্যবিত্ত পরিবার। চারপাশ এক নজরে দেখে নিয়ে স্কট বললেন—

'আমি মিঃ ম্যাকেঞ্জীর সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছি।'

'মিনিট দশ আগে সে গ্লাসগো চলে গেছে। কাল ওদের কলেজ খুলছে।'

'ঠিক আছে', মাইকেল স্কট উঠে দাঁড়ালেন।

'বসুন, আমি কফি তৈরী করছি।' মিঃ ম্যাকেঞ্জীর দিদি অনুরোধ করলেন।

'অনেক ধন্যবাদ।' কফি খেয়ে মাইকেল স্কট সোজা চলে এলেন গ্লাসগোতে। মিঃ ম্যাকেঞ্জীর সঙ্গে একবার মুখোমুখি কথা বলা দরকার জমাট অন্ধকারে এক টুকরো ক্ষীণ আলোর সন্ধান পাওয়া যায়?

পরের দিন ভোরে মাইকেল স্কট মিঃ ম্যাকেঞ্জীর কলেজে যেয়ে হাজির। কলেজের আশপাশে স্টাফ কোয়ার্টারের একটা স্যুটে মিঃ ম্যাকেঞ্জী থাকেন। মিঃ ম্যাকেঞ্জীর

এখানে সকলেই পরিচিত। সুতরাং কোন অসুবিধা হোল না মাইকেল স্কটের, নিজের পরিচয় দিলেন মাইকেল স্কট।

'বলুন আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

মিস্টার ম্যাকেঞ্জী বললেন।

'আমি আপনার অমূল্য সময় নষ্ট না করে এখনই কথা শুরু করবো। পিটারসন ও টমাস ব্রেকের খুনের ব্যাপারে আপনি কতটা জানেন? কারণ ঐ সময় আপনি ওখানে ছিলেন।'

'ছিলাম ঠিকই। কিন্তু কিছুই জানিনা, মিস্টার স্কট। আমি অত্যন্ত দুঃখিত আপনার প্রয়োজনে আসতে পারলাম না বলে। তাছাড়া মিস্টার পিটারসনকে আমি চিনিও না।

টমাস ব্রেককে কয়েকবার দেখেছি বটে। কিন্তু নীচ লোকদের সঙ্গে আমি কথা বলি না। মেশাতো দূরের কথা।'

'আপনি চলে আসার সময় কি জানতেন যে তারা টেমস নদীর ধারে খুন হয়েছে?

'একজন খুন হয়েছে বলে গ্রামের কে একজন জানিয়েছিল বটে। কিন্তু কে খুন হয়েছে, তা জানতাম না। আপনি এখন বলছেন, দু'জন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি মার্সেলাকে ভালোবাসেন?'

'একটি সুন্দরী যুবতী মেয়েকে কোন যুবকই না ভালোবেসে থাকতে পারে বলুন?'

'তা তো বটে। মার্সেলা কেমন মেয়ে বলে আপনার ধারণা?'

—'ভাল বলেই তো অনুমান হয়। যদিও ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পাইনি।'

'মার্সেলাকে স্ত্রী হিসেবে পেলে নিশ্চয়ই আপনি সুখী হবেন?'

'এতে আমার দ্বিমত নেই। মার্সেলা খুব সরল এবং সহজ মেয়ে।'

আমি ভেবেছিলাম আপনার কাছ থেকে একটা ক্লু পাব?

অত্যন্ত দুঃখিত মিস্টার মাইকেল স্কট। কোন খবর পেলে নিশ্চয়ই জানাবো।

ধন্যবাদ। মাইকেল স্কট চলে গেলেন। আবার ফিরে এলেন গ্রামে। বিকেলের দিকে টেমস নদীর ধারে এসে বসলেন। ঠিক এইখানেই খুন

হয়েছিল। নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন মাইকেল স্কট। চিন্তার শেষ নেই তাঁর। উপরিহৃত তাঁর ডায়েরীতে দুজনের নাম আততায়ী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। একজন মার্সেলার দাদা স্মিথ এবং অপর জন মিস্টার ম্যাকেঞ্জী। যদিও কোন প্রমাণ এখনও তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি।

ধীরে ধীরে টেমস নদীর ওপরে সন্ধ্যা নেমে আসতে লাগলো। নীল আকাশ রক্তিম হয়ে উঠতে লাগলো। হঠাৎ একটা কুকুরের ডাকে মাইকেল স্কটের চিন্তার ছেদ পড়লো। এক বুড়ো ভদ্রলোক নদীর ধার দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কুকুরটা একটা ঝোপের ভেতরে পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে আর একটা অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল স্কটের মাথায় বিদ্যুত খেলে গেল। ছুটে গেলেন ঝোপের দিকে। কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর নিজেই মাটি খুঁড়তে লেগে গেলেন। স্কটের শরীরে শিহরণ জাগলো। মাটির নীচে একটা চপার ও একটা রক্তমাখা রুমাল পাওয়া গেল। স্কটের চোখ দুটো চিতাবাঘের চোখের মতো জ্বলে উঠলো।

উনি ছুটে এলেন স্মিথের বাড়ীতে। মার্সেলা তখন রাতের খাবারের জন্যে রান্না ঘরে ব্যস্ত ছিল। স্মিথ বাড়ীতে নেই। স্কট আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না।

মার্সেলার দুটি হাত সজোরে চেপে ধরে বললেন, 'মার্সেলা ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।' দারুণ উত্তেজনায় মাইকেল স্কটের সারা শরীরটা কাঁপছে। কথাটা শুনেও মার্সেলার মুখে কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। ও শুধু বললো, এত দিনে আমার ভাগ্য আমার সঙ্গে শত্রুতা করলো।

তুমি যে এমন জঘন্য কাজ করতে পারবে, এ ধারণাই করতে পারেনি মার্সেলা। ফুলের মধ্যেও কীট থাকে। মার্সেলা, তোমার মতো সুন্দরী, ফুলের মতো মেয়ে কি করে এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে, এ আমার চিন্তার বাইরে। বল, সব সত্যি কথা আমায় খুলে বলো।

আমার বয়স তখন সাত। আর দাদার বয়স দশ। হঠাৎ একদিন গভীর রাতে আমি দরজার কীহোল অর্থাৎ চাবির গর্ত দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম এক বীভৎস ঘটনা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আমার মা আমার বাবার পা জড়িয়ে ধরে

কাঁদছে। বাবার হাতে ধারালো চপার। বাবা বলছে, কোন পুরুষ চিরকাল কোন মেয়েমানুষকে ভালবাসতে পারে না। তোমার যৌবন নেই। তোমাকে ভালোবাসা যায় না, এই বলে বাবা, মাকে চপার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে কেলে একটা ব্যস্তার পুরে ফেললেন। দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দাদা ঘুমিয়েছিল। পরের দিন দাদাকে কিছু বললাম না। কোনদিনই বলিনি। কিন্তু সেই থেকে সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপর আমার ঘৃণা জন্মে গেল।

আমার যতই বয়স বাড়তে লাগলো, ততই পুরুষদের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে লাগলো। দাদার দুই প্রেমিকাকে আমি হত্যা করেছি। কারণ, দাদার জন্য আমার বাবার দুঃখিত হবে। তাছাড়া দাদাও তো পুরুষ। আমি বড়ো হলাম। আমার ঘিরে ভ্রমরের মতো প্রেমিকরা এলো। আমি বুঝতে পারলাম, ওরা আমার যৌবনটাকে ভালো বাসে। আমার মনটাকে নয়। আমি পিটারসনকে টমাস ব্রেকের নামে উত্তেজিত করলাম। আবার টমাস ব্রেককে বললাম, যেমন করে পারো, দাদার বন্ধুকে খুন করে আমার নাও। ওরা একদিন টেমস নদীর ধারে গেল। আমিও একটা চপার নিয়ে ওদের গোপনে অনুসরণ করলাম। টমাস ব্রেক তার চপারটা অতর্কিতে পিটারসনের বুকে বসিয়ে দিল। পিটারসন নিরস্ত্র ছিল। আমি ওই মুহূর্তে পেছন থেকে টমাস ব্রেকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। লাল হয়ে গেল আমার ধারালো চপারটা রক্তে। শুধু রক্ত। আমি রুমাল দিয়ে হাতটা মুছে চপারটা আর রুমালটা মাটি চাপা দিলাম। জানেন, রাত গভীর হলে আমার মা একটা রক্তাক্ত শরীর নিয়ে যেন আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন আমার মনের মধ্যে ভয়ংকর প্রতিহিংসা জেগে ওঠে। ট্রেন-দুর্ঘটনায় আমার বাবা মারা যান। তা না হলে আমার হাতে তিনিই প্রথম শিকার হতেন।

এই বলে মার্সেলা চুপ করলো। মাইকেল স্কট চেয়ে রইলেন শুধু মার্সেলার দুটি নীল মায়াবী চোখের দিকে। মাইকেল স্কটের মনে হলো, এখন বুঝি বসন্ত কাল নয়। জমাট শীত নেমেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। আকাশ থেকে শুধু তুষার ঝরছে। প্রচণ্ড তুষারপাতে সারা পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। শুধু বেঁচে থাকবে গোয়েন্দা মাইকেল স্কট আর রহস্যময়ী মার্সেলা তার দুটি নীল মায়াবী চোখ নিয়ে। সে চোখে আছে প্রেম আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

* * *

আইজ্যাক ব্যাসেভিস সিংগার

৯ -এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অ্যামেরিকাবাসী ইহুদী কথাসাহিত্যিক আইজ্যাক ব্যাসেভিস সিংগার। তাঁর জন্ম ১৮৯৪ সালে পোলাণ্ডে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। প্রথম যুগের অধিকাংশ রচনাই ঈড্ডিশ ভাষায় লেখা। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প উপন্যাসে ইহুদী সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের পটভূমিতে দুঃখী মানুষ, অসহায় মানুষ এবং আপাত-দৃষ্টিতে যে পরিহাসের পাত্র, সেই মানুষই এক ঐশ্বরিক মহিমায় বিশ্বভুবন আলো করে দাঁড়ায়, যখন তার বিশ্বাস ও মানবিকতা তার আপাতনির্বুদ্ধিতা এবং মানবিক সীমাবদ্ধতার ওপরে জয়ী হয়।



নির্বোধ

আইজ্যাক সিংগার

॥ এক ॥

আমি বোকা গিম্পেল্। আমি নিজেকে বোকা ভাবিনা। বরং উল্টোটাই ভাবি। কিন্তু লোকে বলে, আমি নাকি বোকা আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন থেকেই ওরা বলতো। স্কুলে আমার সাতটা নাম ছিল : মুখ্খু, গাধা, মাথামোটা, উজবুক, পাঁঠা আর বোকা। শেষ নামটাই রয়ে গেল। আমার বোকামিটা কি ধরণের ছিল? আমাকে যে যা বোঝাতো, আমি সহজেই বিশ্বাস করতাম। ওরা বলতো, 'গিমপেল, শুনেছো তো, আমাদের র‍্যাবির (ইহুদী ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও যাজক) বউয়ের বাচ্চা হয়েছে?' তাই শুনে আমি স্কুলে গেলামনা। পরে জানা গেল, কথাটা মিথ্যে। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো? র‍্যাবির বউয়ের পেটটা বড় হয়নি। কিন্তু আমিতো র‍্যাবির বউয়ের পেটের দিকে কখনো তাকাইনি। এটা কি খুব বোকার মত কাজ? ওরা সবাই দল বেঁধে হাসতো, ঠাট্টা করতো, পা ঠুকতো, নাচতো। মেয়েমানুষের বাচ্চা হলে ছেলেদের হাতে কিসমিস দেওয়া হয়। কিসমিসের বদলে ওরা আমার হাতে তুলে দিতো ছাগলনাদি। আমার গায়ে তখন

যথেষ্ট জোর ছিল। আমি কাউকে থাপ্পড় মারলে সে চোখে অন্ধকার দেখতো। কিন্তু মারপিট করা আমার ধাতে সয়না। তাই ভাবতাম, যাকগে! ওরা এটারই সুযোগ নিতো।

স্কুল থেকে ফেরার সময় একদিন শুনলাম, আমার পেছনে কুকুর ডাকছে। আমি কুকুরকে ভয় পেতামনা। কিন্তু কুকুরের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধিয়ে লাভ নেই, আমি জানতাম। কুকুরটা পাগলা হতে পারে। পাগলা কুকুর কামড়ালে দুনিয়ার কোন ডাক্তার বীরপুরুষই তোমায় বাঁচাতে পারবেনা। তাই আমি ছুটে পালালাম। তারপর পেছনে ফিরে দেখি, বাজারের সবাই হেসে খুন। আসলে কুকুর ডাকেনি। কুকুরের মতো গলা করে ডেকেছিল চোট্টা উলফ—লিয়েব। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো? শব্দটা তো কুকুরের ডাকের মতই শোনাচ্ছিল।

যারা ঠাট্টা করতে আর বোকা বানাতে ওস্তাদ, তারা যখন দেখলো, আমাকে বোকা বানানো সোজা, ওদের প্রত্যেকে পালা করে আমাকে বোকা বানালো। 'গিমপেল, রাশিয়ার জার ফ্র্যাম্পোলে আসছেন।' 'গিমপেল, টারবীনে চাঁদ মাটির বুকে খসে পড়েছে।' 'গিমপেল, বাথরুমের পেছনে লুকানো সাত রাজার ধন খুঁজে পেয়েছে ছোট্ট হোড়েল ফারপীস।'

আমি বিশ্বাস করতাম।

···কেননা, প্রথমতঃ আমাদের মহান্ পিতারা তাঁদের বইয়ে লিখে গেছেন, সব কিছুই সম্ভব। কিভাবে সম্ভব, আমি অবশ্য ভুলে গেছি।

দ্বিতীয়তঃ, সারা সহরের সব লোক যখন আমাকে বোঝাতে চাইছে, আমাকে বিশ্বাস করতেই হতো। আমি যদি বলতাম, তোমরা মিছে কথা বলছো, লোকে চটে যেতোনা? ওরা বলতোনা, 'তুমি কি বোঝাতে চাইছো? আমাদের সবাইকে তুমি মিথ্যুক বলছো?' আমি কিই বা করতে পারতাম? আমি ওদের কথা বিশ্বাস করতাম এবং

আমি আশা করি, আমার বিশ্বাসের জন্যে ওদের কল্যাণ হয়েছে।

আমি তো অনাথ, ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি। আমার যে ঠাকুর্দা আমায় মানুষ করছিল, তারও কবরে শোয়ার সময় হয়েছিল। রুটি সেঁকার এক কারখানার মালিকের কাছে ওরা আমাকে রাখলো। ওখানে আমার সেকি ঝঞ্ঝাট গেছে! প্রত্যেকটি মেয়ে প্যানকেক সেঁকতে এসে একবার না একবার আমাকে বোকা বানাবে। 'গিমপেল, স্বর্গে এখন মেলা বসেছে।' 'গিমপেল, র‍্যাবি সাত মাসে একটা বাছুর বিইয়েছে।' 'গিমপেল, একটা গরু ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে যেয়ে পেতলের ডিম পেড়েছে।'

ইয়েশিভার এক ছাত্র রোল কিনতে এসে বললো—'গিমপেল, তুমি এখনও কোদাল দিয়ে ময়দা চাঁছছো? ওদিকে স্বয়ং মেসাইয়া (ইহুদীদের ত্রাণকর্তা) এসেছেন। মৃতেরা কবর থে'ক উঠে এসেছে।'

'তার মানে?'

আমি বললাম—

'কেউ তো ভেড়ার শিঙে তৈরী শিঙা ফোঁকেনি?

'তুমি কি কালা নাকি হে? শুনতে পাওনি?'

ও বললো।

এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—

'আমরা শুনেছি, আমরা শুনেছি।'

তারপর মোমবাতির কারখানার বিয়েজ্জি কর্কশ গলায় বললো—

'গিমপেল, তোমার মা আর বাবা কবর থেকে উঠে এসেছেন? ওঁরা তোমায় খুঁজছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো জানতাম, ওরকম কিছুই ঘটেনি। কিন্তু তবুও লোকে যখন বলছে, উলের জামাটা পড়ে বাইরে যেয়ে দেখাই থাকনা। হয়তো সত্যিই কিছু হয়েছে। দেখতে আমার ক্ষতিটা কি? কিন্তু আমি বাইরে যেতেই ওরা ও বেড়ালডাক ডাকলো।

সেদিন আমি শপথ নিলাম, আর কিছু বিশ্বাস করবোনা। কিন্তু তাতেও সুবিধে হলনা। ওরা আমায় এমনভাবে বোকা বানাতো যে আমার সব তালগোল পাকিয়ে যেতো।

আমি ইহুদী-শাস্ত্রজ্ঞানা র‍্যাবির কাছে গেলাম। আমি ওঁর উপদেশ চাইলাম।

উনি বললেন—

'আমাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, এক ঘণ্টা পাপ করার চাইতে সারাটা জীবন বোকামি করা অনেক ভালো। তুমি বোকা নও। যারা তোমায় বোকা বানায়, তারাই বোকা। কেননা যে মানুষ তার প্রতিবেশীকে লজ্জা দেয়, সে স্বর্গের নন্দনকাননে প্রবেশের অধিকার হারায়।'

অথচ, আমি যখন র‍্যাবির বাড়ী থেকে বের হতে যাচ্ছি, র‍্যাবির মেয়েই আমাকে বোকা বানালো।

'গিমপেল, তুমি দেয়ালে চুমু খাওনি?'

'নাতো। কেন?'

'ওটাই নিয়ম। এখানে যতোবার আসবে, দেয়ালে চুমু খাবে।'

দেয়ালে চুমু খেতে কোন ক্ষতি তো নেই। অথচ সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাবির মেয়ে হি-হি করে হেসে উঠলো, ও আমাকে বোকা বানিয়েছে যে।

আমি অন্য সহরে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ সবাই আমার বিয়ের ঘটকালী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। পারলে তো আমার কোটের পেছনটা ছিঁড়ে নেয় আর কি। ওরা সবাই আমাকে বোঝাতো? শুনতে শুনতে আমার কানে তালা লাগার জোগাড়।

আমার হবু বৌয়ের স্বভাবচরিত্তির ভালো ছিল না। অথচ ওরা আমায় বোঝালো, মেয়েটি অপাপবিদ্ধা কুমারী। মেয়েটা খুঁড়িয়ে হাঁটতো। ওরা বললো, লাজুক তো, তাই ইচ্ছে করে ওইভাবে হাঁটে। ওর একটা বেজন্মা ছেলে ছিল। লোকে বোঝালো, ও মেয়েটার ভাই।

আমি চেঁচিয়ে বললাম—

'তোমরা বেকার সময় নষ্ট করছো। আমি ওই বেশ্যাটাকে কিছুতেই বিয়ে করবোনা।'

শুনে ওদের কি রাগ!

'এসব কি কথা, গিমপেল? তোমার লজ্জা করেনা? আমরা তোমায় আমাদের র‍্যাবির কাছে নিয়ে যাবো। তুমি ওই মেয়েটাকে মিছি-মিছি বদনাম দিয়েছো শুনলে উনি তোমার জরিমানা করবেন।'

তখন আমি বুঝলাম, ওরা আমায় সহজে ছাড়বেনা। আমি ভাবলাম: বিয়ের পর স্বামীর কথামতোই বউ চলে এবং তাতে যদি মেয়েটি রাজী থাকে, আমারও আপত্তি নেই।

তাছাড়া···

আগুনের জ্বালা না সয়ে জীবনের পথে চলা যায় না। সে রকম আশা করাও উচিত নয়।

আমি সেই মেয়েটির বাড়ী গেলাম। নীচে বালি, ওপরে মাটির তৈরী বাড়ী। আমার পেছনে হাসতে হাসতে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে এক গ্যাং লোক। পোষা ভাল্লুককে খেপাবার জন্যে ছেলেরা যেমন ভাল্লুকের পেছনে ছোটে। কিন্তু কূয়োর কাছে এসে ওরাও থেমে গেলো। সেই মেয়েটির নাম এলকা! এলকাকে ওরাও ভয় করে। ওর মুখটা এমনভাবে খোলে যেন ওটা কব্জায় আঁটা। ওর জিভের ধারও ভয়ানক। আমি ওর বাড়ীতে ঢুকলাম। এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল অবধি টাঙানো দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছে। খালি পায়ে কূয়োর ধারে দাঁড়িয়ে কাপড় কাচছে এলকা। তার পরণে রঙচটা পুরোনো গাউন, তার চুল ঝুঁটিবাঁধা, পিন দিয়ে আঁটা। দুর্গন্ধে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।

দেখলাম, আমি কে, ও চেনে। আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো—

'ছাখো ছাখো কে এসেছে! সেই বোকারাম! বসো।'

আমি ওকে সব বললাম। আমি কিছুই লুকোইনি। আমি বললাম—

'আমকে সত্যি কথা বলো। তুমি কি সত্যিই কুমারী? ওই ছুই ইযেচিয়েল কি সত্যিই তোমার ভাই? আমি অনাথ, আমাকে তুমি ঠকিওনা।'

এলকা জবাব দিলো—

'আমি নিজেও অনাথ। যে তোমার প্যাঁচালো কথা বলার ধান্দা করবে, তার নাকটাও যেন পেঁচিয়ে যায়। আমি পঞ্চাশ গিলডার পণ চাই। তাছাড়া বিয়ের সময় ওরা যেন চাঁদা তুলে কিছু দেয়। নইলে ওরা আমার বিশেষ একটা জায়গায় চুমু খেতে পারে। জায়গা-টার নাম নাই বা করলাম।'

এলকা খুব খোলোখুলি কথা বলে।

আমি বললাম—

'কনেই তো পণ দেয়, বর তো কখনও পণ দেয় না।,

তখন এলকা বললো—

'আমার সঙ্গে দরাদরি করোনা। হয় খোলাখুলি 'হ্যাঁ' বলো, নয়তো সাফসাফ 'না' বলে দাও আর যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই ফিরে যাও।'

আমি ভেবেছিলাম: এই ময়দায় কখনো পাঁউরুটি সেঁকা হাবেনা। কিন্তু আমাদের সহরের সব মানুষ গরীব নয়। ওরা এলকার সব সর্তেই রাজী হল। বিয়ের আয়োজন করা হল। ঘটনাচক্রে সে সময় আমাদের সহরে আমাশার মহামারী চলছে। উৎসব হলো কবরখানার গেটের কাছে। মরা মানুষের শরীর ধোয়ার জন্যে ছোট্ট যে কুঁড়েঘরটা আছে, তার কাছেই। সবাই মদ খেয়ে মাতাল হল। যখন বিয়ের চুক্তি লেখা আছে, র‍্যাবিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড়, তিনি জানতে চাইলেন—

'কনে কি বিধবা? অথবা অতীতে তার কি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে?'

যে কবর খোঁড়ে, তার বউ কনের হয়ে জবাব দিলো—

'কনে একবার বিধবা হয়েছে, আর একবার তার ডিভোর্সও হয়েছে।

সেই মুহূর্তটা বড় অন্ধকার বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি কি করতে পারতাম। বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে যাওয়া কি সম্ভব ?

ওরা নাচলো। ওরা গান গাইলো। কনের স্বর্গগত মা-বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা হলো। কাঁটা ও শুঁয়া আছে, এমন যে সব বীজকোষ কাপড়ে আটকে যায়, সেগুলো ছুঁড়লো স্কুলের ছেলেরা। টিশে বি' অ্যাভ্-এর উপোষের দিনেও ওরা এগুলো ছোঁড়ে। প্রার্থনা শেষ হলে উপহারের পালা। মুড়ল শাখার বোর্ড, ময়দা মাখার ঢাকনিহীন সরু পাত্র, বালতি, ঝাঁটা, হাতা, বাড়ীর নানা কাজে লাগে এমন আরও অনেক জিনিষ। তারপর দেখি, দুটো ছোকরা একটা দোলনা নিয়ে আসছে। 'ওটা কোন কাজে লাগবে, জানতে চাইলাম'। ওরা বললো—ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। কাজে আসবে।' আমি বুঝলাম, আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে। অন্যভাবে ভাবতে গেলে, তাতে আমার ক্ষতি কি ?

দেখাই যাকনা, কি হয়। গোটা শহরটাই পাগল হয়ে গেছে, এমনতো হতে পারে না।

॥ দুই ॥

রাতে আমি বউয়ের কাছে শুতে গেলে সে বাধা দিলো।

'এই জন্যেই কি আমাদের বিয়ে হয়েছে ?'

আমি বললাম।

এলকা জবাব দিলো—

'আমার মাসিক হয়েছে।'

'কিন্তু কাল তো ওরা তোমাকে ধর্মীয় স্নান-অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলো। যেটা তো মাসিকের পরে হয়, আগে নয়। তাই না ?,

'আজ গতকাল নয় এবং গতকাল আজ নয়। তোমার পছন্দ না হলে তুমি যেতে পারো।'

...সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করতে হলো।

বিয়ের চার মাস পরে এলকার প্রসব-ব্যথা উঠলো। মুঠোকরা হাত দিয়ে লোকে হাসি ঢাকে। কিন্তু আমি কি করতে পারতাম। অসহ্য যন্ত্রণায় দেয়াল আঁচড়াচ্ছে এলকা। কেঁদে বলছে—'গিমপেল, আমায় ক্ষমা করো। আমি মরে যাবো।' বাড়ীতে অনেক মেয়েমানুষ। জল ফুটছে। এলকার চীৎকার বেড়েই চলেছে।

আমার মনে হল, এই অবস্থায় আমার প্রার্থনা গৃহে যেয়ে প্রার্থনা করা উচিত।

সহরের লোকেদের এটা খুবই পছন্দ হল। এককোণে বসে আমি যখন প্রার্থনা ও ধর্মসঙ্গীত পড়ছিলাম, ওরা মাথা নেড়ে বলছিল—

'প্রার্থনা, করো, প্রার্থনা করো। প্রার্থনা করে কেউ কোন মেয়েমানুষকে কোনদিন গর্ভবতী করতে পারেনি।'

ওদের একজন আমার মুখে খড় গুঁজে দিয়ে বলে—

'গরুর জন্যে খড় চাই।'

ঈশ্বর জানেন, হয়তো ওর কথাতেও কিছু সত্য ছিল।

এলকার ছেলে হল। শুক্রবার সিনাগগে (ইহুদী প্রার্থনা মন্দির) সেক্সটন (প্রার্থনা মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক) যখন টেবিল ঠুকে ঘোষণা করলো—'ধনী রেব গিম্পেল তাঁর সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে সবাইকে ভোজে নিমন্ত্রণ করছেন'—প্রার্থনাগৃহ সবার হাসির শব্দে ভরে গেল। আমার মুখটা লাল হয়ে উঠছিল। কিন্তু আমার কিছুই করার ছিল না। শিশুর সুন্নৎ করা এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তো আমারই।

সহরের অর্ধেক লোক অনুষ্ঠানে এলো। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি ভিড়। মেয়েরা গোলমরিচ-ছড়ানো মটরদানা এনেছিল। শুঁড়িখানা থেকে

ছোট পিপেভর্তি বীয়ার এলো। আমি অন্য সবার মতোই খেলাম। ওরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালো। তারপর লিঙ্গচর্ম ছেদনের অনুষ্ঠান হলো। আমি আমার বাবার নামে শিশুর নাম রাখলাম। আমার বাবার আত্মার সদ্গতি হোক। সবাই চলে গেলে আমার বউ বিছানার চারপাশের পর্দা সরিয়ে আমায় ডাকলো। বললো—

'গিমপেল, তুমি এতো চুপচাপ কেন? দেখে মনে হচ্ছে, তোমার বুঝি জাহাজডুবি হয়েছে।'

'আমি কি বলবো? তুমি আমার কতো ভালো করলে। আমার মা যদি জানতেন এরকম ঘটবে, তিনি আর একবার মরতেন।'

'তুমি কি পাগল নাকি?'

'আমাকে আর কতো বোকা বানাবে? ধর্মের নিয়মে আমারই কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব থাকা উচিত জেনেও—'

'ব্যাপার কি বলোতো? তুমি কি কিছু একটা কল্পনা করতে সুরু করছো?'

'যার মা-বাব নেই, সেই অনাথ, অসহায় মানুষের সঙ্গে কি এমনি ব্যবহার করতে হয়? তুমি এই বেজন্মা বাচ্চাটার জন্ম দিলে?'

'ওসব বোকামি মগজ থেকে তাড়াও। ও তোমারই সন্তান।'

'কিভাবে তা সম্ভব হয়? বিয়ের সতেরো সপ্তাহ পরে তোমার বাচ্চা হয়েছে।'

এলকা আমায় বললো, এরকম হয়, নমাস পূরো হবার আগেই অনেক বাচ্চার জন্ম হয়। 'কিন্তু এতো আগে?'

আমি বললাম। এলকা বোঝালো ওর এক ঠাকুমার ঠিক এমনি একটি বাচ্চা হয়েছিল এবং জলের একটা ফোঁটার সঙ্গে অন্য ফোঁটার যেমন মিল, এলকার সঙ্গে তার সেই ঠাকুমার নাক তেমনি মিল। এলকা যে সত্যি বলছে বোঝাতে চেয়েও এমন সব জোরালো কসম খেলো যে মেলায় দরাদরি করার সময় কোনো চাষা অতোগুলো দিব্যি আওড়ালে যে কোন লোকই বিশ্বাস করতো। কিন্তু সত্যি

কথা বলতে কি, আমি এলকাকে বিশ্বাস করিনি।

কিন্তু পরের দিন আমি যখন স্কুলমাষ্টারকে এই সব কথা বললাম, সে বললো, আদম ও ইভের জীবনেও নাকি একই ঘটনা ঘটেছে। ওরা যখন বিছানায় উঠলো, ওরা দুজন। যখন বিছানা থেকে নামলো, তখন ওরা চারজন।

'পৃথিবীর প্রত্যেক মেয়েমানুষই ইভের নাংনী।'

স্কুলমাষ্টার আমায় বোঝালো।

আমার ভাগ্যে এই রকমই ঘটতো। ওরা তর্ক করে আমায় চুপ করিয়ে দিতো। কিন্তু সত্যি কথা ভাবতে গেলে, কেই বা বলতে পারে, কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে ?

আমি আমার দুঃখ ভুলতে চাইলাম। নবজাত শিশুকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম। সেও আমাকে ভালোবাসতো। আমাকে দেখলেই সে ছোট্ট দুটো হাত বাড়িয়ে আমার কোলে উঠতে চাইলো। পেটের ব্যথায় ও কাঁদতে সুরু করলে আমি ছাড়া কেউ ওকে ভোলাতে পারতোনা। দাঁত ওঠার সময় ব্যবহারের জন্যে হাড়ের তৈরী ছোট্ট আংটি আমি ওকে কিনে দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম গিল্টি-করা ছোট্ট একটা টুপি। ওর প্রায়ই নজর লেগে যেতো, যেসব মন্ত্রতন্ত্র আওড়ালে নজর লাগা সারে, তার খোঁজে আমাকে প্রায়ই ছুটোছুটি করতে হতো। আমার খাটুনি দিন দিন বাড়ছিল। বাড়ীতে বাচ্ছা ছেলে থাকলে খরচাপাতি কিরকম বাড়ে, সবাই জানে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার বউ এলকাকেও আমার খারাপ লাগতো না। ও আমাকে গালমন্দ করতো। ও আমার দিকে কটমট করে তাকালে আমি কথা বলতে পারতাম না। ও কথা বললে মনে হত যেন আলকাতরা আর গন্ধক একসঙ্গে ভগভগ করে ফুটছে। তবুও ওকে আমার ভালো লাগতো। ও আমাকে আঘাত দিতো। তবুও ওর প্রত্যেকটা কথা আমার ভালো লাগতো।

সন্ধ্যেবেলা আমি ওর জন্যে আনতাম একটা সাদা রুটি, একটা কালো

রুটি আর আমার নিজের হাতে সেঁকা পোস্তদানার রোল্। ওর জন্যে আমি চুরি করতাম। হাতের কাছে যা পেতাম। ম্যাকারোনি, কিসমিস, বাদাম, কেক। বেকারীর চুল্লিতে গরম রাখার জন্যে শনিবার মেয়েরা যা রেখে যেতো, তার থেকেও চুরি করতাম। মাংসের চাকতি, এক টুকরো পুডিং, মুরগীর ঠ্যাং। তাড়াতাড়ি যা সরানো যায়। এলকা খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছিল, সুন্দর হচ্ছিল।

হপ্তার দুটো রাত আমাকে বেকারীতে কাজ করতে হতো। শুধু শুক্রবার রাতটা আমি বাড়ীতে থাকতে পেতাম। ঠিক সেদিনই আমার সঙ্গে শোয়ার কোননা কোন একটা অজুহাতে বাদ করতো আমার বউ। হয় তার গলা জ্বলছে নয়তো পেট ব্যথা করছে নয়তো হিক্কা উঠছে কিম্বা মাথা ধরেছে। মেয়েলী অজুহাত কিরকম অদ্ভুত হয় সবাই জানে। আমার খুব খারাপ লাগতো। তার ওপরে আবার, ওর সেই বেজন্মা ছোট ভাইটা যতো বড়ো হচ্ছে, ততো পাজী হচ্ছে। সে আমার পেছনে লাগলে আমি তাকে মারতে গেলে এলকা এতো জোরে চেঁচিয়ে আমাকে গালমন্দ করতো যে আমার মনে হত যেন আমার চোখের সামনে সবুজ ধোঁয়াটে কুয়াশা ভাসছে। দিনে দশবার ও আমাকে ডিভোর্স করার ভয় দেখাতো। আমার জায়গায় অন্য কোন পুরুষ হলে সব ছেড়েছুড়ে উধাও হয়ে যেতো।

কিন্তু আমি সেই ধরণের মানুষ, যে নারীর সবকিছু সহ্য করে।

মানুষ কি করতে পারে?

ঈশ্বর তাকে কাঁধ দুটো দিয়েছেন?

বোঝাও ঈশ্বরই দিয়েছেন।

সে রাতে বেকারীতে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। চুল্লি ফেটে আর একটু হলে অগ্নিকাণ্ড বেঁধে যেতো। কোন কাজ ছিল না বলে আমি বাড়ী চলে এলাম। আমি ভাবছিলাম, হপ্তার মাঝামাঝি রাতে বাড়ীতে ঘুমুতে পারার আনন্দ কেমন, আজ আমি জানবো। যেন ঘুমন্ত শিশুর ঘুম না ভাঙে, তাই পা টিপে টিপে বাড়ীতে ঢুকলাম। মনে

হলো, এক জোড়া নয়, দুজোড়া নাক ডাকছে। একটা শব্দ, হাল্কা। অন্যটা জবাই করা ষাঁড়ের মত। আমার ভালো লাগলোনা। আমি বিছানার কাছে গেলাম। হঠাৎ সব আঁধার হয়ে গেল।

আমি দেখলাম…

এলকার পাশে শুয়ে আছে অন্য এক পুরুষ।

আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে চীৎকার করে সারা শহরের ঘুম ভাঙাতো।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, আমি চীৎকার করলে বাচ্চা ছেলেটার ঘুম ভেঙে যাবে। ছোট্ট একটা শিশু—ছোট্ট চড়ুইয়ের মত—তাকে ভয় দেখিয়ে লাভ কি? বেকারীতে ফিরে যেয়ে ময়দার বস্তার ওপরে শুয়ে সকাল অবধি আমি চোখ বুজতে পারিনি। আমি ম্যালেরিয়া রুগীর মত কাঁপছিলাম। আমি নিজেকে বোঝালাম—

'গাধাপনার একটা শেষ আছে। গিমপেল সারা জীবন বোবা বনতে পারে না। গিমপেলের মত বোকারও বোকামির একটা সীমা আছে।'

সকালে আমি র‍্যাবির উপদেশ চাইতে গেলে শহরে হৈচৈ বেঁধে গেল। ওরা এলকাকে ডেকে পাঠালো। সে বাচ্চা ছেলে কোলে নিয়ে এলো। সে সবকিছু অস্বীকার করলো।

সে বললো, 'গিমপেলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি স্বপ্ন বা কল্পনার ব্যাপারে কিছু জানিনা।' ওরা চেঁচালো, ওরা এলকাকে ভয় দেখালো, ওরা টেবিল ঠুকলো। কিন্তু এলকার বক্তব্য বদলালোনা। তার নামে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে বললো।

কসাই এবং ঘোড়ার ব্যবসায়ীরা এলকাকে সমর্থন জানালো। কসাই খানার এক ছোকরা আমাকে বললো, 'আমরা তোমার ওপর নজর রেখেছি।' এলকার বাচ্চাটা এই সময় পেচ্ছাব করে ফেললো। র‍্যাবিদের আদালতে পবিত্র আরক (যে বিশাল জলযানে আশ্রয় পেয়ে প্রলয়প্লাবনের সময় নোয়া ও প্রাণী জগতের প্রাণ বেঁচেছিল, তারই

প্রতীক) আছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে বাচ্চাসমেত এলকাকে বাইরে পাঠানো হল।

আমি র‍্যাবিকে জিজ্ঞেস করলাম—

'আমি কি করবো ?'

'তুমি শুধুনি এলকাকে ডিভোর্স করো।'

'কিন্তু ও যদি রাজী না হয় ?'

'তুমি ডিভোর্সের নোটিশ দাও। তোমার কাজ তাতেই খতম।'

'বেশ, ঠিক আছে। র‍্যাবি, আমি ভেবে দেখবো।'

'ভাবার কিছু নেই। তুমি এলকার সঙ্গে এক বাড়ীতে আর থাকবেনা।'

'কিন্তু বাচ্চাটাকে যদি দেখতে চাই ?'

'বেজ্জাটাকে যেতে দাও। ওর বেজন্মা বাচ্চাটাও ওর সঙ্গেই যাক।'

দিনের বেলা আমার খুব একটা খারাপ লাগতোনা। আমি ভাবতাম, একদিন না একদিন ওটা হতোই। ফোঁড়া হলে সেটা তো ফাটবেই। কিন্তু রাতে ময়দার বস্তাগুলোর ওপর শুয়ে এলকার কথা, ওর বাচ্চা ছেলেটার কথা আমার বড্ড মনে পড়তো।

আমি রাগ করতে চাইতাম।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমার স্বভাবের একটা বড় দোষ, আমি সত্যি সত্যিই রাগ করে থাকতে পারি না। প্রথমতঃ—আমার মাথায় ওই কথাটাই প্রথমে এলো—মানুষ কখনো না কখনো ভুল করে। ভুল না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। ওই যে ছেলেটা এলকার পাশে সেদিন শুয়েছিল, ও হয়তো এলকাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে, হয়তো এলকাকে উপহার দিয়ে লোভ দেখিয়েছে। মেয়েদের মাথার চুল লম্বা, বুদ্ধি খাটো। তাই হয়তো ভুল করেছে এলকা।

এবং এলকা যখন বলছে, সব মিথ্যে, এমনও তো হতে পারে যে আমিই ভুল দেখেছি ? দৃষ্টিবিভ্রম কি হয়না ? দূর থেকে দেখে মনে হল, ছায়া, মানুষ কিম্বা পুতুল। কাছে যেয়ে দেখলে, কিচ্ছু নেই। যদি

তাই হয় ? তাহলে তো আমি এল্‌কার সঙ্গে অবিচার করছি।
এই সব ভেবে দেখে আমার চোখে জল এলো। যে বস্তার ওপরে আমি শুয়েছিলাম, তার ভেতরে ময়দা ছিল। আমার চোখের জলে ময়দা ভিজে গেল।
সকালে র‍্যাবির সঙ্গে দেখা করে আমি বললাম, আমারই ভুল হচ্ছে। র‍্যাবি শরের কলম দিয়ে সব লিখলেন। বললেন, যদি তাই হয়, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা আবার ভেবে দেখতে হয়। যতোক্ষণ ওঁদের বিচার শেষ না হচ্ছে আমি আমার স্ত্রীর কাছে যেতে পারবোনা, তবে অন্যের মারফত স্ত্রীকে রুটি ও টাকা পাঠানো চলবে।

॥ তিন ॥

র‍্যাবিরা একমত হতে ন'মাস লেগে গেল। চিঠি লেখালেখি চললো। এরকম একটা ব্যাপারের ফয়সালা করতে এতো পাণ্ডিত্য দরকার হয়, আমি আগে বুঝিনি। ইতিমধ্যে এলকার আর একটি মেয়ে হল। স্যাবাথের (ইহুদী ধর্মমতে সপ্তাহের পবিত্র দিন শনিবার স্যাবাথ হিসাবে উদযাপিত হয়) দিন আমি সিনাগগে যেয়ে তার জন্যে প্রার্থনা করলাম। টোরা অবধি এলাকার লোকেরা আমায় নিয়ে হাসিঠাট্টা করলো। অভদ্র ও বাচাল স্বভাবের যেসব লোক রুটির কারখানায় আসতো, তারা আমার পেছনে লাগতো। ফ্র্যাম্পোলের সবাই আমার ঝামেলা ও দুঃখ নিয়ে হাসিঠাট্টা করে খুশী হতো। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাকে যা বলা হবে, আমি তাই বিশ্বাস করবো।
বিশ্বাস না করে লাভ কি ?
আজ তুমি তোমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করছোনা।
কাল তুমি হয়তো ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবেনা !

প্রতিবেশী এক অ্যাপ্রেনটিস্ যুবক মারফৎ আমি এলকাকে রোজ ভুট্টা বা গমের আটা থেকে তৈরী পাঁউরুটি পাঠাতাম। কখনো বা এক টুকরো প্যাস্ট্রি বা রোল্। সুযোগ পেলে একফালি পুডিং বা মধু মেশানো কেক। যা হাতের কাছে পেতাম।

অ্যাপ্রেনটিস ছোকরার মনটা ভালো। কখনো কখনো ও নিজেও কিছু জোগাড় করে দিতো। আগে ও প্রায়ই আমার পেছনে লাগতো, আমার নাক টানতো, আমার বুকের পাঁজরায় খোঁচা মারতো। কিন্তু আমার বাড়ী যাওয়া-আসা সুরু করার পর থেকে ও ভালো ব্যবহার করতো।

'হাই, গিম্পেল, তোমার বউ আর বাচ্ছা দুটো খুব ভালো! তুমি ওদের যোগ্য নও।'

'কিন্তু লোকে যে আমার বউয়ের সম্বন্ধে যা-তা বলে?'

'লোকের আজেবাজে কথা বলা আর গুজব ছড়ানোই অভ্যেস। শীতশেষের হিমকে যেমন কেউ পাত্তা দেয় না, তেমনি লোকের কথাতেও কান দিতে নেই।'

একদিন র‍্যাবি আমায় ডেকে বললেন—

'গিমপেল, তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার বউয়ের কোনো দোষ নেই?

'আমি নিশ্চিত।'

'কিন্তু তুমি নিজের চোখে দেখেছো—'

'হয়তো ছায়া দেখেছি।'

'কিসের ছায়া?'

'বোধহয় কড়ি বরগার।'

'তা হলে তুমি বাড়ী যেতে পারো। ইয়ানওভার-এর র‍্যাবির কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মাইমনিডিস নামের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ খুঁজে উনি দুষ্প্রাপ্য একটা উদ্ধৃতি খুঁজে বার করেছেন। তাতে তোমার বক্তব্যের সমর্থন আছে।

আমি র‍্যাবির হাতে চুমু খেলাম।

আমি একছুটে বাড়ী যেতে চাইলাম।

দীর্ঘদিন স্ত্রীপুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সামান্য ব্যাপার নয়। মনে হচ্ছিল, একছুটে এখুনি বাড়ী যাই।

তারপর ভাবলাম: এখন কাজে যাই, সন্ধ্যেবেলা বাড়ী যাবো। আমি কাউকে কিছু বলিনি। কিন্তু ধর্মীয় উৎসবের দিনে মনটা যেমন খুশী খুশী লাগে, আমার মনের ভাবও তখন সেইরকম। মেয়েরা রোজকার মতোই আমায় নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম: 'তোমরা যা ইচ্ছে, উল্টোপাল্টা কথা বলো। সত্যি যা, তা প্রকাশ হবেই। তেল যেমন জলের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। মাইমনিডিস বলেছে, এটাই ঠিক। অতএব এটাই ঠিক।'

রাতে ময়দার তাল ফেঁপে উঠবে বলে ওটা ঢেকে রাখলাম, আমার পাওনা রুটি নিলাম, ছোট্ট থলিভর্তি ময়দা নিলাম এবং বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। আকাশে পূর্ণচাঁদ, তারা ঝিকমিক রাত। এমন কিছু, যা আত্মার গহনে ভয় জাগায়। আমি সামনের দিকে হেঁটে যাই। আমার সামনে হেঁটে চলে দীঘল ছায়া। তখন শীতকাল: সদ্যঝরা তুষার। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু গভীর রাতে গান গাইলে লোকের ঘুম ভাঙবে বলে গান গাইনি। আমার শিস দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আমার মনে পড়লো যে রাতে শিস দিলে দৈত্যদানোরা বের হয়ে আসে। তাই আমি চুপচাপ, যতো জোরে সম্ভব হাঁটতে লাগলাম।

খৃষ্টানদের বাড়ীর উঠোন থেকে কুকুরগুলো আমায় দেখে চেঁচাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম: 'যতো ইচ্ছে চেঁচাও। তোমরা তো শুধুই কুকুর। আমি মানুষ, ভালো মেয়ে মানুষের স্বামী, আগামী দিনে মানুষ হবে এমন সব শিশুর জনক।

বাড়ীর কাছে যেতেই আমার হৃৎপিণ্ড ধকধক করছিল। অপরাধীদের হৃৎপিণ্ডের মত। আমার ভয় লাগছিলনা। কিন্তু বুকটা ধকধক

করছিল। না, আর পিছিয়ে যাওয়া যায়না। আস্তে আস্তে আগল খুলে ভেতরে গেলাম। এলকা ঘুমিয়েছিল। আমি নবজাত শিশুর দোলনার দিকে তাকাই। বন্ধ শাটারের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসেছে। নবজাত শিশুর মুখ আমি সেই আলোয় প্রথম দেখলাম। এবং তখনই ওকে, ওর প্রত্যেকটা ছোট্ট অস্থিকে ভালবেসে ফেললাম। তারপর আমি আমার স্ত্রীর বিছানার কাছে গেলাম।

আমি কি দেখলাম?

দেখলাম, সেই অ্যাপ্রেনটিস ছোকরা এলকার পাশে শুয়ে আছে।

সেই মুহূর্তে মেঘের আড়াল নিভে গেল চাঁদ। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আমি কেঁপে উঠলাম। আমার দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করে শব্দ হল। রুটিটা আমার হাত থেকে খসে পড়লো। আমার বউ জেগে উঠে বললো—'কে ওখানে?'

আমি ফিসফিস করে বললাম—'আমি'।

'গিমপেল? তুমি এখানে? আমি ভেবেছিলাম, তোমার এখানে আসতে নিষেধ আছে।'

'র‍্যাবি অনুমতি দিয়েছে'।

আমি যেন জ্বরে কাঁপছিলাম।

'শোনো, গিমপেল, শেডে যাও, দ্যাখো, ছাগলটা কেমন আছে। মনে হয়, ওর অসুখ হয়েছে।'

আমি বলতে ভুলে গেছি, আমরা একটা ছাগল পুষেছিলাম। ওর শরীর খারাপ শুনে আমি উঠোনে বেরিয়ে গেলাম। ছোট্ট ছাগলটা বড্ডো ভালো। ওকে আমি মানুষের মতোই ভালোবাসি। একটু ইতস্তত: করে আমি দরজা খুলে শেডের ভেতরে ঢুকলাম। চারপায়ে দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট ছাগল। আমি ওর সারা গায়ে, শিঙে, স্তনে হাত দিয়ে দেখলাম, সব ঠিক আছে। হয়তো গাছের ছাল বেশী খেয়ে ফেলেছে।

'শুভরাত্রি। ভালো থাকো।

আমি ওকে বললাম।

জবাবে ছাগল বললো।

'ম্যা।'

যেন ও আমার শুভেচ্ছার জন্যে আমায় ধন্যবাদ জানালো।

আমি ঘরে ফিরে গেলাম।

অ্যাপ্রেনটিস ছোকরা উধাও।

আমি বললাম—

'ছোকরা কোথায় গেল?'

'কোন ছোকরা?'

আমার বউ জানতে চাইলো।

'কি বলছো? অ্যাপ্রেনটিস ছোকরা, তুমি যার সঙ্গে শুয়েছিল।'

'আজ এবং গতকাল আমি যেসব দুঃস্বপ্ন দেখেছি, সেগুলো যেন সব সত্যি হয়ে তোমার শরীর ও আত্মার ক্ষতি করে। তোমার ভেতরে অশুভ শক্তি ভর করেছে, সে তোমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখে। আমি তোমাকে ঘেন্না করি। তুমি একটা ভূত! বেরিয়ে যাও! নয়তো আমি চেঁচিয়ে ফ্র্যাম্পোলের সব লোককে এখানে জড়ো করবো!'

আমি নড়তে পারার আগেই চুল্লির আড়াল থেকে লাফিয়ে উঠে এলকার ভাই আমার পেছনে ঘুঁসি মারলো। মনে হলো যেন আমার ঘাড় ভেঙে গেল। আমার মনে হচ্ছিল, আমার নিজের কোথায় একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আমি বললাম—'কেলেংকারী কোরোনা। এবার লোকে বলবে, আমি ভূতগ্রস্ত বা পিশাচ ডেকে আনতে অভ্যস্ত।'

এলকার উদ্দেশ্য ঠিক তাই ছিল।

'তাহলে আমার সেঁকা রুটি কেউ আর ছোঁবেই না।'

এইসব বলে আমি বউকে ঠাণ্ডা করলাম।

'বেশ। যথেষ্ট হয়েছে। এবার শুয়ে পড়ো।'

এলকা বললো।

পরের দিন আমি অ্যাপ্রেনটিস ছোকরাকে ডাকলাম।

'শোনো ভাই।'

আমি ওকে সব বললাম।

'কি বলছো?'

ও একদৃষ্টিতে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো যেন আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছি।

'আমি শপথ করে বলছি'।

অ্যাপ্রেনটিস ছোকরা বললো।

'তুমি বরং কবিরাজ বা ডাক্তার দেখাও। আমার ধারণা; তোমার মাথার স্ক্রু ঢিলে আছে। কিন্তু তোমার জন্যে আমি কাউকে কিচ্ছু বলবো না।'

দীর্ঘকাহিনী এবার সংক্ষেপে বলি।

কুড়ি বছর আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ছিলাম।

ওর ছটি সন্তান হয়েছে। চারটি মেয়ে। দুটি ছেলে। অনেক ধরণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমি কিছু দেখিনি বা শুনিনি। আমি শুধু বিশ্বাস করেছি।

র‍্যাবি সম্প্রতি আমাকে বলেছেন—

বিশ্বাসের নিজস্ব উপকারিতা আছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, ভালোমানুষ তার বিশ্বাসের জোরেই বাঁচে।'

হঠাৎ আমার বউ অসুস্থ হয়ে পড়লো। সামান্য ব্যাপার থেকে শুরু। ওর স্তনে ছোট্ট একটা টিউমার হয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন বেঁচে থাকা ওর ভাগ্যে ছিল না। আমি ওর চিকিৎসার জন্যে অনেক খরচ করেছি। ইতিমধ্যে আমি নিজস্ব বেকারীর মালিক হয়েছি। ফ্র্যাম্পোলে এটা বড়লোক হওয়া বলে ধরে নেওয়া হয়। এলকাকে

দেখতে রোজ কবিরাজ আসতো। কাছাকাছি যতো উইচ-ডক্টর ছিল, যারা যাদুবিদ্যার সাহায্যে রোগ সারায়, তাদের সবাইকে ডাকা হয়েছিল। জোঁক দিয়ে রক্ত শুষিয়েও কাজ হোলোনা। তখন লাবলিন্ থেকে ডাক্তার ডাকা হল। কিন্তু তখন বড্ড বেশী দেরী হয়ে গেছে।

মৃত্যু শয্যায় আমার স্ত্রী এলকা আমাকে তার পাশে বসালো ডাকলো। বললো—

'গিম্পেল, আমাকে ক্ষমা করো।'

আমি বললাম—

'কিসের জন্যে ক্ষমা চাইছো? স্ত্রী হিসেবে তুমি ভালো ছিলে, বিশ্বস্ত ছিলে!'

'সেই তো দুঃখ, গিমপেল্? এতো বছর ধরে যেভাবে আমি তোমায় ঠকিয়েছি, তা কুৎসিৎ। আমি ভগবানের কাছে যাবার আগে সত্যি কথাটা বলে যেতে চাই। এই ছেলেমেয়েরা কেউই তোমার সন্তান নয়।'

সেই মুহূর্তে কেউ যদি আমার মাথায় এক টুকরো কাঠ দিয়ে মারতো, তাহলেও বোধহয় আমি এতো বেশী ঘাবড়ে যেতাম না।

'ওরা কার সন্তান?'

'আমি জানি না। অনেক পুরুষ এসেছিল…কিন্তু ওরা তোমার সন্তান নয়।'

কথা বলতে বলতে মাথাটা একপাশে ঘোরালো, ওর চোখদুটো ঘষা কাচের মত হয়ে গেল, এলকা মরে গেল।

ওর ক্যাকাশে ঠোঁটে হাসির রেখা জেগেছিল।

আমার মনে হল…

মরে যেয়েও এলকা যেন বলছে—

'আমি বোকা গিমপেলকে ঠকিয়েছি। আমার স্বল্পস্থায়ী জীবনের এটাই সার্থকতা।

॥ চার ॥

এক রাতে ··

তখন শোকের সময় শেষ হয়েছে ! আমি ময়দার বস্তাগুলোর ওপরে শুয়ে স্বপ্ন দেখছি ।

স্বপ্নে শয়তান নিজে আমার কাছে এলো ।

বললো—

'গিমপেল, তুমি ঘুমুচ্ছো কেন ? সারা পৃথিবী তোমাকে ঠকিয়েছে। তুমিও প্রতিদানে সবাইকে ঠকাও ।'

'সারা পৃথিবীকে ঠকানো কি করে সম্ভব ?'

'সারাদিন একটা বালতিতে পেচ্ছাব করো। তারপর রাতে পেচ্ছাবটা ময়দার তালে ঢেলে দাও। ফ্র্যাম্পোলের জ্ঞানীগুণীরা নোংরা খাবে।'

'মৃত্যুর পরে ভিন্ন দুনিয়ায় যে বিচার হবে, তার কি হবে ?,

'মৃত্যুর পরে কোন ভিন্ন জগৎ নেই। ওরা তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে। তোমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে তোমার পেটের ভেতরে একটা বেড়াল রয়েছে। যত্তোসব বাজে কথা !'

'বেশ। কিন্তু ঈশ্বর কি আছেন ?'

'না, ঈশ্বরও নেই ।'

'তাহলে কি আছে ?'

'পুরু কাদা।'

শয়তানের মুখে ছাগলদাড়ি, মাথায় শিঙ, ওর লম্বা দাঁত, লেজও আছে। ওর সব কথা শুনে আমার লেজ ধরে টান দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আমি ঘুমের মধ্যে ময়দাভর্তি বস্তা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলাম। আর একটু হলে আমার বুকের পাঁজরা ভেঙে যেতো। পেচ্ছাব করতে যেয়ে আমি দেখলাম, ময়দার তাল ফেঁপেফুলে উঠেছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি শয়তানের পরামর্শ মতোই কাজ করলাম।

ভোরবেলা অ্যাপ্রেনটিস এলো। আমরা ময়দা মাখলাম, সুগন্ধি মশলাবীজ ছড়ালাম এবং সেঁকতে দিলাম। অ্যাপ্রেনটিস চলে গেলে আমি চুল্লির ধারে ছোট্ট নালার ওপরে কম্বল ছড়িয়ে বসে ভাবছিলামঃ 'বেশ, গিমপেল, সারাটা জীবন ওরা তোমাকে লজ্জা দিয়েছে, তুমি এবার তার প্রতিশোধ নিয়েছো।'

বাইরে কুয়াশা ঝিলমিল করছে।

ভেতরে চুল্লীর ধারে বেশ গরম।

আমার মুখের সামনে আগুনের তপ্ত শিখা নাচছে।

আমি মাথা নীচু করে ঝিমুতে লাগলাম।

আমি স্বপ্ন দেখলাম…

'এ তুমি কি করলে, গিমপেল?'

'এসব তোমারই দোষ'—

আমি কেঁদে উঠলাম।

'বোকা! বোকা গিমপেল, আমি মিথ্যে বলে তুমি কেন ধরে নিলে যে সব কিছুই মিথ্যে? আমি আসলে কাউকেই ঠকাতে পারিনি। আমি শুধু নিজেকেই ঠকিয়েছি। গিমপেল, আমি আজ সব কিছুর দাম দিচ্ছি। মরণের পরপারে এখানে কেউ তোমাকে রেহাই দেয় না।'

আমি এলকার মুখের দিকে তাকাই।

মুখটা নিকষ কালো।

চমকে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল।

আমি বুঝলাম, সব কিছু সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলে আছে। আমি ভুল করলে অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত হব। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করলেন। আমি বড় কোদালটা ও পাঁউরুটিগুলো নিয়ে উঠোনে বের হলাম এবং তুষারঢাকা মাটি খুঁড়তে লাগলাম।

ইতিমধ্যে অ্যাপ্রেনটিস ফিরে এলো। 'বস, এ কী করছো?'
ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।
'আমি কী করছি, তা আমি জানি।'
ওর চোখের সামনেই আমি রুটিগুলো মাটিতে পুঁতে দিলাম।

॥ পাঁচ ॥

তারপর আমি বাড়ী গেলাম। লুকোনো জায়গা থেকে সারাজীবনের জমানো টাকা পয়সা বার করে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিলাম। বললাম—

'আজ রাতে আমি তোমাদের মাকে দেখেছি। বেচারা কালো হয়ে গেছে।'

ওরা এতো অবাক হয়ে গেল যে ওরা কেউ কোন কথা বললোনা।

'তোমরা ভালো হও। বোকা গিমপেল বলে কেউ কোনদিন ছিল, তোমরা ভুলে যেও।'

আমি বললাম। আমি আমার ছোট্ট কোটটা গায়ে দিলাম, বুটজুতো দুটো পায়ে এঁটে নিলাম। আমার এক হাতে সেই থলিটা, যার ভেতরে প্রার্থনার সময় গায়ে দেবার শালটা আছে। অন্য হাতে লাঠি। রাস্তায় আমায় দেখে সবাই অবাক।

'গিমপেল, তুমি কোথায় চলেছো?'

'আমি পৃথিবীর কাছে যাবো।'

…এবং আমি ফ্র্যামপোল ছেড়ে গেলাম।

আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। ভালো মানুষেরা আমায় অবহেলা করেনি।

অনেক বছর পরে আমি বুড়ো হয়েছি, আমার চুল পেকেছে।

আমি অনেক কিছু শুনেছি। অনেক মিথ্যে কথা। কিন্তু যতো

দীর্ঘদিন আমি বেঁচেছি, ততোই বুঝেছি, আসলে মিথ্যে বলে কিছুই নেই। বাস্তবে যা ঘটেনা, তা রাতে স্বপ্নে দেখা যায়। এক জনের জীবনে যা ঘটেনা, অন্যের জীবনে তাই ঘটে। আজ যা ঘটেনি, কাল তাই ঘটবে। এবং কাল যা ঘটবেনা, এক শতাব্দী পরে তা ঘটতে পারে। তফাৎটা কোথায়? আমি অনেক গল্প শুনে বলেছি, এটা সত্যি নয়। অথচ এক বছর না যেতেই শুনেছি, সেই ধরণের ঘটনা অন্য কোথাও ঘটেছে।

দূর থেকে আরও দূরে যেতে যেতে, অচেনা মানুষের টেবিলে অতিথি হয়ে খেতে খেতে, আমি প্রায়ই গল্প বলি। অসম্ভবের গল্প। জীবনে যা ঘটেনা, তারই গল্প। দৈত্যদানো, যাদুকর, হাওয়ায় চালানো উইণ্ডমিলের গল্প। বাচ্চা ছেলেরা আমার পেছনে ছোটে। 'ঠাকুর্দা, একটা গল্প বলো। তারা অনেক সময় বিশেষ কোনো গল্প শুনতে চাইলে আমি তাদের খুশী করার চেষ্টা করি। একটা মোটাসোটা ছেলে আমায় একবার বলেছিল: 'ঠাকুর্দা, এই গল্পটা তুমি আগেও বলেছো। ছোট্ট দুষ্টু ছেলেটা ঠিকই বলেছে।

স্বপ্নের ব্যাপারেও একই রকম। অনেক বছর আগে আমি ক্র্যামপোল ছেড়ে গেছি। কিন্তু রাতে চোখ বুঝলেই আমি সেখানে পৌঁছে যাই। স্বপ্নে আমি কাকে দেখি? এলকাকে। ওয়াশটাবের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এলকা, প্রথম দেখার সময় তাকে যেমনটি দেখেছিলাম, তার মুখ চকচক করছে, তার চোখে সন্তের চোখের মত আশ্চর্য্য দ্যুতি, সে অচেনা ভাষায় অদ্ভুত সব কথা বলে। ঘুম ভাঙলে কথাগুলো আমি ভুলে যাই। কিন্তু স্বপ্ন যতোক্ষণ থাকে, আমি শান্তি পাই। এলকা আমার সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। মনে হয়, সব ঠিক আছে। আমি কেঁদে বলি: 'এলকা, আমি তোমার কাছে থাকবো।' সে আমাকে সান্ত্বনা দেয়, আমাকে ধৈর্য্য ধরতে বলে। সময় ফুরিয়ে আসছে, এলকাও কাছে আসছে। কখনো কখনো সে আমার গায়ে হাত বুলোয়, আমায় চুমু খায়, আমার মুখে মুখ রেখে কাঁদে। জেগে

উঠে আমি অনুভব করি তার তপ্ত ঠোঁটের ছোঁয়া, তার চোখের জলের নোনা স্বাদ।

আজ আমার সন্দেহ নেই···

আমাদের এই জাগর পৃথিবী এক কাল্পনিক জগৎ। আসল পৃথিবী রয়েছে খুবই কাছে।

যে ভাঙাচোরা ছোট্ট বাড়ীতে আমি শুয়ে আছি, তার সামনেই কাঠের তক্তা। মরা মানুষকে ওঠার জার শুইয়ে কবরে নিয়ে যাওয়া হয়। যে ইহুদী কবর খোঁড়ে, তার কোদাল তৈরী আছে। কবর আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। মাটির নীচে কৃমিপোকরা আমার জন্যে ক্ষুধার্ত। কাফনও তৈরী, আমার ভিখিরীর ঝুলির মধ্যে আছে। আর একটা ছাঘরে ভিখিরী হয়তো অপেক্ষা করছে। আমি মরলে সে আমার খড়ের বিছানায় শুতে পাবে।

যখন সময় আসবে···

আমি আনন্দের সঙ্গে যাবো।

যেখানে যাবো, সেখানে যাই হোক, সব কিছু বাস্তব। সেখানে কোন জটিলতা নেই, কোন বিদ্রূপ নেই, সেখানে কেউ কাউকে ঠকায়না।

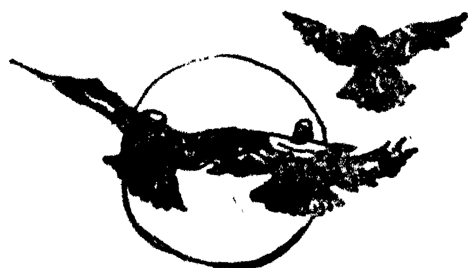
ঈশ্বরকে আমি প্রশংসা করি।

সেখানে বোকা গিমপেলকেও বোকা বানানো যায় না।

* * *

আঁদ্রে জিদ

১৯৪৭-এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ। ১৯৪৬-এ লেখা 'থিসিয়স' গল্পে গ্রীক উপকথার রাজা থিসিয়স, গোলকধাঁধার রহস্যময় পথগুলোও যার গতি রুদ্ধ করতে পারেনা, রূপক অর্থে আঁদ্রে জিদ নিজেই। কারণ জীবনে, শিল্পভাবনা ও রচনাশৈলীর ব্যাপারে মসিয়ঁ জিদ কখনও এক জায়গায় দীর্ঘদিন বাঁধা থাকেননি। মসিয়ঁ জিদকে কোথায় পাওয়া যাবে, তাঁর জীবৎকালে কেউ সহজে বলতে পারতোনা। এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফ্রাসোয়া মরিয়্যাক বলেছিলেন, মৃত্যুর পরে জিদ কোথায় গেছেন, সেই প্রশ্নের জবাব জিদই দেবেন পরপার থেকে চিঠি দিয়ে। চিঠিতে লেখা থাকবে—'নরকের অস্তিত্ব নেই। ইতি—আঁদ্রে জিদ।'



থিসিয়স

আঁদ্রে জিদ

।। এক ।।

আমি প্রাচীন গ্রীক রূপকথার রাজা থিসিয়স্। ইচ্ছে ছিল, আমার এই আত্মকাহিনী আমার একমাত্র ছেলে হিপ্পোলিটাসকে বলে যাবো। যেন সে এইসব ঘটনা থেকে কিছু শিখতে পারে। কিন্তু আমার ছেলে আজ পৃথিবীতে নেই এবং তবুও এইসব কথা আমি বলছি। ছেলেকে বলতে হলে ব্যক্তিগত প্রেমভালোবাসার কিছু ব্যাপার বাদ দিয়েই বলতে হতো। কারণ এসব ব্যাপারে ওর খুব সঙ্কোচ ছিল এবং আমার প্রেমকাহিনীগুলো ওকে শোনাতে আমার সাহস হতনা। তাছাড়া, আমার জীবনের প্রথম দিকেই শুধু এসব ব্যাপারের গুরুত্ব ছিল। প্রেম আমাকে নিজেকে চিনতে শিখিয়েছে। ঠিক যেমন হিংস্র পশুকে আমি হত্যা করেছি, যেসব দানবকে আমি যুদ্ধে হারিয়েছি, তারা আমাকে নিজেকে চিনতে ও জানতে সাহায্য করেছে।

তাই আমি হিপ্পোলিটাসকে প্রায়ই বলতাম: 'প্রথমে সঠিকভাবে জানা দরকার, তুমি কে? তারপর আসে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। আমি চাই বা না চাই, আমি ছিলাম রাজপুত্র। তুমি চাও বা না

চাও, তুমি যুবরাজ। এ ব্যাপারে তোমার বা আমার কিছু করার নেই। কারণ, এটা ঘটনা। এবং ঘটনা বা বাস্তব তোমার অস্তিত্বকে বন্দী করে রাখে।' কিন্তু হিপ্পোলিটাস কখনও আমার কথা শুনতো না। ওর বয়সে আমি অতোটা না হলেও, অনেকটা ওরই মতো অন্যমনস্ক ছিলাম। এবং তার ফলে ওর মতো আমারও কোন ক্ষতি হয়নি। শৈশবের সেই নিষ্পাপ দিনগুলো কী যে সুখের দিন। যখন শরীর ও মন বিনা যত্নে বেড়ে ওঠে। আমি তখন ছিলাম বাতাসের মত স্বচ্ছন্দ, সমুদ্র তরঙ্গের মত চঞ্চল। আমি উদ্ভিদের সঙ্গে বড় হয়েছি। আমি পাখীর ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসেছি। আমার অস্তিত্বের কোন সীমানা ছিলো না এমন কি বাইরেয় দুনিয়ার সংস্পর্শ আমার মনে শুধু নতুন ভোগস্পৃহা জাগাতো, কখনো মনে হতোনা যে আমি নিঙ্গস্ব কোন গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা আছি। রসাল ফলের গায়ে হাত বোলাতে ভালো লাগতো, ভালো লাগতো ছোট গাছের নরম শরীরে হাত বোলাতে, সমুদ্রতীরের মসৃণ পাথরগুলো ছুঁতে কিম্বা কুকুর ও ঘোড়ার লোমঢাকা শরীরে হাত দিতে। তখনো আমি রমণীর শরীরে হাত রাখতে শিখিনি। প্যান, জিউস বা থেটিস নামের গ্রীক দেবতারা যেসব সুন্দর জিনিষ আমাকে দেবেন, ক্রমশঃ আমি তাদের দিকে হাত বাড়ালাম।

একদিন আমার বাবা বললেন, এভাবে জীবন কাটানো আর আমার মানায় না। আমি বললাম, 'কেন? বাবা বললো, সে কি কথা? আমি তার ছেলে, রাজার ছেলে, আমাকে সিংহাসনে বসার আগে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

আমি তখন ছিলাম সুখে। ঠাণ্ডা সবুজ ঘাসের বুকে নগ্ন আমার শরীর। নাকি আমি রোদঝলসানো সমুদ্রবেলায় শুয়েছিলাম?

কিন্তু না, বাবাকে দোষ দেওয়া যায় না। বাবা আমাকে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শিখিয়েছিল এবং সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত, আমি যা কিছু করেছি, যা কিছু হয়েছি, তা নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করার ফলেই সম্ভব হয়েছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেঁচে থাকা সুখের হলেও সেদিন থেকে আমি জীবনের ধারা বদলেছিলাম। কেননা চেষ্টা ছাড়া মহৎ কিছু, মূল্যবান কিছু এবং স্থায়ী কিছু করা যায় না। প্রথম প্রচেষ্টায় বাবাই উৎসাহ দিয়েছিলো। বাবা বলেছিলো, গ্রীক দেবতা পসিডনের উপহার দেওয়া কিছু অস্ত্র সমুদ্রতীরের ওই পাথর-গুলোর তলায় নাকি লুকোনো আছে।

মানুষ কি করতে পারে, মানুষ কি হতে পারে। তুমি তোমার মনুষ্যত্বের যোগ্য হও'।

॥ দুই ॥

আমার বাবা ঈজিয়স সর্বদিক থেকে ভালোমানুষ ছিলো। অবশ্য আমার ধারণা, আমি নামেই ওর সন্তান। সবাই আমাকে বলেছে, আমি নাকি মহান্ দেবতা পসিডনের ঔরসজাত। হয়তো আমার নিয়ত পরিবর্তনশীল মেজাজ আমি পসিডনের কাছ থেকেই পেয়েছি। অন্ততঃ মেয়েদের ব্যাপারে। কোন একটি মেয়েকে নিয়ে দীর্ঘদিন সুখে থাকা আমার সয়না। ঈজিয়স মাঝে মাঝে এসব ব্যাপারে আমাকে বাধা দিতো। তার সেই অভিভাবকত্বের জন্যে এবং আমি যে অ্যাটিকায় আফ্রোদিতির উপাসনা আবার চালু করেছিলাম, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। আমার যে ভুলের জন্য ঈজিয়সের মৃত্যু হয়েছিল, সে জন্যেও আমি দুঃখিত। কথা ছিল, ক্রীট দ্বীপ থেকে নিরাপদে ফিরলে আমার জাহাজে সাদা পাল খাটানো থাকবে। সাদার বদলে কালো পাল দেখে ঈজিয়স ভাবলো, আমার মৃত্যু হয়েছে এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ও আত্মহত্যা করলো।

কিন্তু, আজ আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, সাদার বদলে কালো পাল খাটানোর ব্যাপারটা কি নিছকই ভুল? না ওটা আমার ইচ্ছাকৃত?

ঈজিয়স আমার নানা কাজে বাধা দিতো এবং বার্ধক্যের শয্যাসঙ্গিনী ডাইনী মীডিয়ার দেওয়া ওষুধপত্র খেতে খেতে ওর ধারণা হয়েছিল যে ও বোধহয় অদূর ভবিষ্যতে নবযৌবন ফিরে পাবে। এইভাবে ওর জীবন আমার জীবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যদিও পৃথিবীর নিয়মে বৃদ্ধকে যুবকের জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হয়।

কেউই বোধহয় অস্বীকার করবেনা যে আমি মানুষের স্বার্থে কিছু ভালো কাজ করেছি। এই পৃথিবীর বুক থেকে এই অনেক অত্যাচারী কুশাসক, আততায়ী, ডাকাত ও হিংস্র দানবদের চিরতরে সরিয়ে দিয়েছি। যেসব পথে সবচেয়ে সাহসী মানুষেরও পা রাখতে বুক কাঁপতো, সেই সব পথ আমি নিরাপদ করে তুলেছি। আমি আকাশ এতো পরিষ্কার করেছি যে মানুষ আজ মাথা উঁচু করে আকস্মিকভাবে ভয় না করে ওই আকাশের নীচে দাঁড়াতে পারে।

সে সময় দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মানুষের পক্ষে খুব একটা নিরাপদ ছিলনা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট সহর এবং সহর যেখানে শেষ, সেখানে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এমন সব জমি যেখানে চাষবাসের বালাই নেই, এমন সব পায়ে-চলা পথ যা আদৌ নিরাপদ নয়। মাঝে মাঝে ঘন অরণ্য ও পাহাড়ী গুহা। সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকাগুলোতে ডাকাতের দলগুলোর আড্ডা। তারা লুটপাট ও ছিনতাই করে, খুনখারাপি করে এবং পথিককে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায় করে। এরই পাশাপাশি বন্যজন্তুর উদ্দেশ্য-মূলক হিংস্রতা এবং রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াকলাপ, যার প্রকোপে কেউ কষ্ট পেলে বুঝতে পারতোনা, কে তাকে আঘাত করেছে—মানুষ না দেবতারা? রাজা ওয়েদিপাউস স্ফিংসকে এবং বেলেরোফন গরগনকে হত্যা করেছিলেন। দুটোকেই দৈত্য বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের মানবিক না অতি প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপকে বড় করে দেখানো হচ্ছে, কেউই বোঝেনি। যা কিছু দুর্বোধ্য, যা কিছু বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায়না—লোকে ধরে নেয়, এগুলো দেবতাদের

কাজ। মানুষের জয় এবং মানুষের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যোগাযোগ এতোটই নিবিড় যে বীরত্ব এবং ধর্মবিরোধী ক্রিয়াকলাপ অনেক সময় একই রকম মনে হতো। সে যুগে মানুষকে মানুষ হতে গেলে প্রথমে দেবতাদের জয় করতে হতো।

মানুষ কিন্তু দেবতার সঙ্গে যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আঘাত হেনে তবেই যুদ্ধে জেতা সম্ভব হতো। এপিডউরাসের কালো দানব পেরিফেটিসের সঙ্গে যুদ্ধে আমি যেমন তার হাতের গদা কেড়ে নিয়ে যুদ্ধে জিতেছিলাম।

জিউসের অস্ত্র বজ্র। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে এমন দিন আসবে যখন বিদ্যুৎ মানুষের করায়ত্ত হবে যেমনভাবে প্রেমিথিউস মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন আগুন। হাঁ, দেবতার ওপরে বিজয়ী হওয়া মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন আগুন। হাঁ, দেবতার ওপরে বিজয়ী হওয়া মানুষের সর্বোত্তম জয়।

কিন্তু রমণীরমণ রণে জয়ী হওয়ার ব্যাপারটা অন্যরকম। আমি এক রমণীর বাহুবন্ধন থেকে পালিয়ে অন্য রমণীর আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে এবং রমণীকে জয় করার আগে আমি তার কাছে হার মেনেছি।

পিরিথিউস (আহ্, তার সঙ্গে আমার সখ্যতার কথা আজও ভুলিনি, আমায় বলেছিল, 'হারকিউলিস ওমফেলির বক্ষবন্ধে ধরা দিয়ে যেভাবে নিজের পৌরুষ হারিয়েছিল, তুমি সেই ভুল করোনা।' এবং যেহেতু কোন না কোন প্রিয় রমণীর সঙ্গ ছাড়া বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, যখনি আমি নতুন প্রেয়সীর সন্ধানে ছুটেছি, পিরিথিউস আমাকে বলেছে : 'যাও, কিন্তু বন্ধনে বাঁধা পড়োনা।'

একজন রমণী আমার জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে (অন্ততঃ লোকে তাই বোঝে) আমাকে হৃদয় সুতোয় বাঁধতে বাঁধতে চেয়েছিল। তার কথা আমি পরে বলবো।

তার অন্য প্রজাদের মত তার বুকে একটি মাত্র স্তন ছিল। ছোটাছুটি এবং কুস্তিতে দক্ষ এই রমণী র মাংসপেশীগুলো ছিল আমাদের অ্যাথলিটদের মতই কঠিন। আমি ওর মোকাবালি করেছিলাম খালি হাতে। আমার হাতে বাঁধা পড়ে ও চিতাবাঘের মত ফুঁসছিল। অস্ত্র কেড়ে নেওয়ায় ও দাঁত ও নখ দিয়ে লড়ছিল। আমি হাসছিলাম বলে এবং আমাকে না ভালোবেসে ওর উপায় ছিলনা বলে ও রেগে গিয়েছিল। সত্যিকারের কুমারী মেয়ে এই একবারই পেয়েছি। পরে যদিও ও আমার সন্তান হিপ্পোলিটাসকে একটি মাত্র স্তন দিয়ে দুধ খাওয়াতো, তাতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমি চেয়েছিলাম, আমার এই নিষ্পাপ বন্য স্বভাবের সন্তান আমার উত্তরাধিকারী হবে।

জীবনে সবচেয়ে বড়ো দুঃখ যা পেয়েছি, গল্পের প্রসঙ্গে আমি বলবো। কেননা অস্তিত্বই সবকিছু নয় এবং আমি যে বেঁচেছিলাম, এটাই যথেষ্ট নয়। আমার উত্তরাধিকার অন্যকে দিয়ে যেতে হবে, যেন আমি নিভে যাওয়ার পরেও আগুন ও আলো জ্বলে থাকে। আমার ঠাকুর্দা কথাটা আমায় প্রায়ই বোঝাতেন।

পিথিয়স এবং ঈজিয়স আমার চেয়ে তীক্ষ্ণধী ছিল কিন্তু আমার সাধারণ জ্ঞানের জন্যে নাম ছিল। এর সঙ্গে মিশেছিল ভালো কিছু করার বাসনা। আমার এমন এক ধরণের সাহস ছিল যা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে আমায় প্রেরণা দিতো। সবার ওপরে ছিল আমার উচ্চাশা। আমার দূর সম্পর্কের ভাই হারকিউলিসের কীর্তির কথা আমি শুনেছি এবং ট্রোজেন ছেড়ে যখন আমায় এথেনসে আমার তথাকথিত জনকের কাছে ফিরে যেতে হল, লোকে সমুদ্রপথে যাওয়ার জন্যে সদুপদেশ দিলেও আমি স্থলপথই বেছে নিলাম। স্থলপথে ঘুরে যাওয়া এবং সেই পথের নানা বিঘ্নবিপদ আমাকে আকর্ষন করেছিল। আমি বুঝেছিলাম, এবার আমার যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ আসবে। দেশের সর্বত্র নানা ধরণের চোর ডাকাতেরা ঘোরাফেরা

করছে এবং হারকিউলিস তার পৌরুষ ওমফেলির পায়ে বাঁধা রেখেছে বলে চোর-ডাকাতেরা নির্ভয়ে ঘুরছে। আমার বয়স তখন ষোল। তাদের টেক্কা-সাহেব সব আমার হাতে। এবার আমার পালা। আমার হৃদয় লাফিয়ে ছুটছে সুখের চূড়ার দিকে। 'নিরাপত্তায় আমার কি প্রয়োজন? যে পথে বিপদ নেই, শৃঙ্খলা আছে, সে পথ আমার জন্যে নয়'—আমি বলেছিলাম। সুখ-শান্তি, নিশ্চিন্ত অলস আরাম এবং প্রশংসিত না হয়ে শুধু শান্তিতে বেঁচে থাকা আমার কাছে অসহ্য। সুতরাং পেলোপনীসাস অন্তরীপ ঘুরে এথেনসের পথে যাবার সময় আমার প্রথম শক্তিপরীক্ষা হল। আমার হৃদয় এবং আমার হাত আমাকে শেখালো, আমার শক্তি কতো। আমি অনেক কুখ্যাত ও ঘৃণিত ডাকাতকে হত্যা করেছি। যেমন সিনিস, পেরিফেটিস, প্রোক্রাসটিস, জেরিয়ন (না, ওর সঙ্গে লড়েছিল হারকিউলিস, আমি আসলে সারভিয়নের কথা বলতে চাইছিলাম। অবশ্য শিবন-এর ব্যাপারে আমার একটু ভুল হয়েছিল। পরে দেখা গেল, লোকটা ভালো ছিল, স্বভাবটাও ভালো, পথচারীদের উপকার করতো। কিন্তু যেহেতু আমি ওকে হত্যা করেছিলাম, পরে রটে গেল, লোকটা বদমায়েস ছিল।

এথেনসের পথে শতমূলীর ঝোপের মধ্যে ঘটেছিল আমার প্রথম প্রেমের জয়। রূপসী পেরিগোন-এর শরীর ছিল দীঘল এবং স্পর্শিল। আমি ঠিক তার আগেই ওর বাবাকে হত্যা করেছি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি ওকে দিয়েছিলাম সুন্দর একটি সন্তান, আমার ছেলের নাম রাখা হয়েছিল মেনালিপপেস। আমি পরে ওদের দুজনেরই খোঁজ রাখিনি। বাঁধা ছিঁড়ে চলাই আমার জীবন। সময় নষ্ট করতেও আমার অনীহা। আমি অতীতকে কখনো আমার পায়ে জড়িয়ে ধরতে বা আমার পথরোধ করতে দিইনি। বরং নতুন করে যা আয়ত্ত করা যাবে, তাই আমাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এবং যা কিছু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তা ভবিষ্যতের মধ্যেই

নিহিত।
এই প্রেরণা এমনই যে এইসব প্রাথমিক সামান্য ব্যাপারগুলো আমার কাছে সামান্যই তাৎপর্য্য ছিল। আমি এক আকর্ষণীয় অ্যাডভেঞ্চারের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। হারকিউলিসও তার জীবনে এ ধরণের অ্যাডভেঞ্চার দেখেনি। ঘটনাটা আমি বিশদভাবে বলছি।

॥ তিন ॥

এই গল্পটা খুব জটিল। ক্রীট দ্বীপ তখন এক শক্তিশালী রাজ্য। মিনোস সেখানকার রাজা ছিল। সে বলতো, অ্যাটিকা-র অধিবাসীরা তার ছেলে অ্যানড্রেজিয়সের মৃত্যুর জন্য দায়ী। প্রতিশোধ হিসেবে সে আমাদের কাছ থেকে প্রতি বৎসর এক উপহার নিতো। সাতটি যুবক এবং সাতটি যুবতীকে তার হাতে তুলে দেওয়া হতো। বলা হতো, ওরা দানব মিনোটর-এর ক্ষুধা মেটাবে। মিনোসের স্ত্রী প্যাসিফী এক ষাঁড়ের সঙ্গে যৌনমিলনের ফলে এই দানবশিশুর জন্ম দিয়েছিল। প্রথম কাকে মিনোটরের খাদ্য হতে হবে, সেটা লটারী করে ঠিক করা হত।
যে বছরের কথা বলছি, সে বছর আমি সদ্য গ্রীসে ফিরেছি। যদিও লটারীতে আমার নাম ওঠার কথা নয় (কারণ রাজপুত্রদের এসব থেকে রেহাই দেওয়া হয়), আমিই জোর করলাম যে আমাকে ক্রীটে পাঠাতে হবে। আমার বাবা রাজা ঈজিয়স আপত্তি করলেন। কিন্তু আমি রাজপুত্র হওয়ার বিশেষ সুবিধে পছন্দ করি না। আমি চাই যে আমার যোগ্যতা আমাকে সাধারণ মানুষ থেকে বড়ো করুক। সত্যি কথা বলতে কি, আমার পরিকল্পনা ছিল, আমি মিনোটরকে হারিয়ে গ্রীসকে এই হিংস্র ঘৃণ্য দানবের হাত থেকে মুক্তি দেব। ক্রীট দ্বীপ থেকে অনেক সুন্দর দামী ও অদ্ভুত জিনিস আমাদের ওখানে প্রায়ই

আসতো। তাই ওখানে যেতে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমি তাই ক্রীটের উদ্দেশ্যে পালতোলা নৌকোয় যাত্রা করলাম। আমার তেরোজন সঙ্গীর মধ্যে ছিল আমার বন্ধু পিরিথিউস।

মার্চ মাসের এক সকালে আমি অ্যামনিসস নামের ছোট্ট এক সহরে নৌকো ভিড়িয়েছি। এই বন্দরের কাছেই ক্রীটের রাজধানী নোসোস। সেখানেই ক্রীটের রাজা মিনোসের প্রাসাদ। ঝড় না হলে আগের দিনই আমাদের ওখানে পৌঁছুবার কথা। আমরা তীরে নামতেই সশস্ত্র প্রহরীরা আমায় ঘিরে ধরলো এবং আমার ও পিরিথিউসের তরোয়াল ছিনিয়ে নিল।

ওরা যখন দেখলো, আমাদের কাছে আর কোন অস্ত্র নেই, ওরা আমাদের নিয়ে গেল ক্রীটের রাজা মিনোসের কাছে নোসোস্ থেকে সভাসদদের নিয়ে উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পুরুষদের বুক খোলা। শুধু মঞ্চের ওপর বসে-থাকা মিনোসের পরণে ঢিলে আলখাল্লার মত দীঘল গাঢ় লাল রঙের পোষাক, যার রাজকীয় ভাঁজগুলো কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি নেমেছে।

গ্রীক দেবতা জিউসের মতো চওড়া পুরুষালী বুকে তিন সারি নেকলেস। গলায় হার পরে ক্রীটের অধিবাসী অন্য পুরুষেরাও, তবে সেগুলো সস্তা। মিনোসের গলার হারগুলো দামী পাথর ও সোনার তৈরী। দু-মাথাওলা একটা কুঠার তাঁর সিংহাসনের ওপরে ঝুলছে। মিনোসের ডান হাতে তার নিজের দৈর্ঘ্যের সমান লম্বা সোনার তরোয়াল, বাঁ হাতে মস্ত বড় তিন-পাপড়িওলা সোনার ফুল। গলার হারেও একই ধরণের ফুলের ডিজাইন। তার মাথায় সোনার মুকুটের চূড়ায় মোরগ ও উটপাখীর পালক গোঁজা। সে আমাদের কয়েক লহমা দেখে নিয়ে ক্রীট দ্বীপে আমাদের শুভাগমনে আনন্দ জানিয়ে হাসলো। হাসিটা ব্যঙ্গের বলা চলতো। কারণ আমরা তো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে চলেছি। মিনোসের পাশে ওর রানী আর, দুই রাজকন্যা। আমি তখনই বুঝে নিলাম, বড় রাজকন্যার

আমাকে পছন্দ হয়েছে। আমাদের প্রহরীরা যখন আমাদের নিয়ে যাবে বলে প্রস্তুত, বড় রাজকন্যা তার বাবার দিকে ঝুঁকে গ্রীক ভাষায় বললো: 'আমার অনুরোধ, ওকে পাঠিওনা'। সে আঙুল বাড়িয়ে আমাকে দেখালো। মিনোস আবার হাসলো এবং আদেশ যেন আমাকে সঙ্গীদের সঙ্গে না নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গী ও প্রহরীরা চলে যেতেই মিনোস জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো।

যদিও আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে আমি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করবো এবং আমি যে রাজপুত্র বা আমি যে একটা দুঃসাহসিক উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, সে কথা কাউকে জানতে দেবোনা, হঠাৎ আমার মনে হলো, তখন তাসের সব পাত্তিগুলো টেবিলে রাখাই ভালো। বিশেতঃ যখন রাজকন্যার নেকনজর পেয়েছি। আমি যদি এখন সাফসাফ বলে দিই যে আমি রাজা পিথিয়সের নাতি, রাজকন্যার নেকনজরে পড়া বা রাজার সাহায্য পাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। আমি এমন ইঙ্গিতও দিলাম যে অ্যাটিকায় জনশ্রুতি আছে, আমি মহান পোসিডনের ঔরসজাত সন্তান। মিনোস জবাবে গম্ভীর হয়ে বললো, জলে পরীক্ষা করে কথাটা সত্যি না মিথ্যে জানা যাবে। জবাবে আমি খুব ঠাণ্ডা মেজাজে বললাম, সে যে কোন পরীক্ষাই নিতে চাক, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত। মিনোস নিজে কি ভাবলো জানিনা তবে রাজ্যসভার মহিলারা সবাই আমার আত্মবিশ্বাস দেখে খুসী হলো।

'এখন তুমি যেতে পারো'।

মিনোস বললো।

'খাওয়া দাওয়া করো। তোমার সঙ্গীরা খাওয়ার টেবিলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। রাতে তোমাদের যা ঝামেলা গেছে, তার পরে তোমাদের মেজাজ নিশ্চয়ই ভালো নেই। বিশ্রাম নাও। তোমাদের সম্মানে বিকেলে খেলাধুলো হবে, সেখানে তুমি উপস্থিত থাকবে আশা

করি। তারপর, রাজকুমার থিসিয়স, তোমায় আমরা নোসস-এর প্রাসাদে নিয়ে যাবো। তুমি ওখানেই শোবে এবং কাল আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে যোগ দেবে। নেহাৎই সাধারণ ব্যাপার। তোমার বাড়ীর মতোই লাগবে পরিবেশটা। মহিলারা তোমার প্রথম জীবনের নানা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনে খুসী হবেন। এখন আমি খেলাধূলোর প্রস্তুতির ব্যাপারটা দেখতে যাচ্ছে। খেলার সময় আমাদের আবার দেখা হবে। তুমি যুবরাজ, সুতরাং শিষ্টাচার অনুযায়ী তুমি রাজকীয় বক্স-এর নীচে বসবে। যেহেতু আমি খোলা-খুলিভাবে তোমার সঙ্গীদের ও তোমার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখাতে চাইনা, তোমরা একসঙ্গেই বসবে।

খেলাধূলো হলো বিশাল অর্ধবৃত্তাকৃতি এরীনায়। এরীনার সমুদ্রের দিকটা খোলা। অজস্র মেয়েপুরুষ খেলা দেখতে এসেছে। ওরা এসেছে নসোস থেকে, লিটোস থেকে, এমন কি দুশো মাইল দূরবর্তী সহর গোরটিনা থেকে। অন্যান্য সহর এবং কাছের গাঁগুলো থেকে এবং জনবহুল মফঃস্বল এলাকা থেকেও লোক এসেছে। আমার খুব অবাক লাগছিল। বিদেশী ক্রীটবাসীদের অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। অ্যাম-ফিসিয়েটার-এর গ্যালারীতে জায়গা না থাকায় ওরা প্রবেশপথে এবং সিঁড়িতে ধাক্কাধাক্কি করছিল। ওদের অধিকাংশ মেয়েরই বুক খোলা। কেউ কেউ হাল্কা ধরণের বডিস পরেছে বুকে। সেই বডিসেরও আবার এমনই কাটিং, যা লজ্জা ঢাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ বডিস পরলেও দুই স্তনের সবটাই দেখা যাচ্ছে। পুরুষদের মধ্যে মেয়েদেরও কোমর ও পাছায় আঁটসাঁট বেল্ট ও কর্সলেট। পুরুষদের চামড়ার রঙ বাদামী। মেয়েদের মত তাদেরও হাতের আঙুল, কব্জি ও গলায় আঙটি, ব্রেসলেট ও নেকলেস। মেয়েরা সবাই রঙে ফর্সা। পুরুষদের সবারই দাড়ি কামানো। শুধু রাজার ভাই র‍্যাডামান্থাস আর তার বন্ধু ডিউকেলাস-এর দাড়ি আছে। রাণী ও রাজকন্যারা বসেছেন আমাদের বসার জায়গায় ঠিক ওপরে উঁচু

প্লাটফর্মে। এরীণা থেকে অনেকটা উঁচুতে এই মঞ্চ। প্রত্যেকেরই পরণে ঝলমলে পোষাক ও অলঙ্কার। প্রত্যেকে ফুলেফেঁপে ওঠা স্কার্ট পরেছে, স্কার্টের ভাঁজগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে গেছে কোমরের নীচে, এমব্রয়ডারি পা ছুঁয়েছে, পায়ে সাদা চামড়ার ছোট্ট জুতো। রাণী বসেছে মঞ্চের ঠিক মাঝখানে।

মোটাসোটা বলে ওর চেহারাই প্রথমে চোখে পড়ে। তার হাত ও বুক খোলা। বিশাল স্তনদুটোর ওপরে মুক্তো, পান্না ও অন্যান্য দামী পাথর। মাথার কালো চুলের কোঁকড়ানো গুচ্ছগুলো মুখের দুপাশে এবং কপালে। ওর ঠোঁটদুটো পেট্রকের মতো, নাকের ডগা ওপর দিকে বাঁকা, বড় বড় চোখ দুটোয় শূন্য দৃষ্টি। দেখলে গরুর চোখের কথা মনে পড়ে। তার মাথায় সোনার মুকুট চুলের বদলে কালো রঙের ছোট্ট টুপির ওপরে বসানো, মুকুটের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুৎ ধরণের টুপিটা দেখা যাচ্ছে, টুপির ডগাটা শিঙের মত কপাল থেকে উচিয়ে আছে। তার পোষাকের বুক থেকে কোমর অবধি খোলা কিন্তু পেছন দিকে উঁচু হয়ে গলার মস্ত কলারে শেষ হয়েছে। তার পরণের স্কার্ট ফুলেফেঁপে চারপাশে ছড়ানো। ক্রীম রং পাদভূমির ওপরে তিন সারি এমব্রয়ডারী। ওপরে বেগুনী রঙের আইরিশ ফুল, মাঝখানে হলুদ স্যাফ্রন এবং নীচে পাতাসমেত ভায়লেট ফুলের এমব্রয়ডারী। ঠিক নীচের মঞ্চে বসে আমি কাছ থেকে এইসব দেখছিলাম। রঙ, ডিজাইন ও পোষাকের কারুকাজের সৌন্দর্য্য দেখে আমার অবাক লাগছিল।

বড় মেয়ে অ্যারিয়্যাডনী বসেছিল ওর মায়ের ডান দিকে। ওর পোষাক এতো ঝকমকে নয়, পোষাকের রঙও আলাদা। তার ও তার বোনের স্কার্টে দুসারি এনব্রয়ডারী। কুকুর ও পাখী পোষাক আঁকা।

ফেড্রা-কে দেখলেই মনে হয়, তার বয়স কম। সে বসেছিল প্যাসিফে-র বাঁদিকে। তার পোষাকে দুসারি এমব্রয়ডারী। প্রথম

সারিতে ছেলেরা দড়ি নিয়ে লাফাচ্ছে। দ্বিতীয় সারিতে ছোট ছেলেরা বসে বসে মার্বেল খেলছে। ফেড্রা শিশুর মত খুসী হয়ে খেলাধূলার দৃশ্য দেখছিল। আমার কাছে সবকিছুই এমন নতুন যে আমি ঠিকমত মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। নাচ, গান ও কুস্তি শেষ হবার পর অ্যাক্রোব্যাটরা এরীনায় নামলো। মিনোটরের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধে নামতে হবে। তরোয়াল খেলার কৌশল দেখতে দেখতে ষাঁড়কে কিভাবে ক্লান্ত করে বোকা বানানো যায়, সে বিষয়ে অনেক কিছু শিখলাম।

॥ চার ॥

শেষ চ্যাম্পিয়নকে অ্যারিয়াডনী পুরস্কার দেবার পর খেলাধূলোর আসর বন্ধ বলে ঘোষণা করলো রাজা মিনোস। চারপাশে ওর সভাসদ, ও আমাকে আলাদাভাবে ডাকলো।

'যুবরাজ থিসিয়স, এবার সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায় তোমায় নিয়ে যেয়ে আমরা পরীক্ষা করে দেখবো, তুমি সত্যিসত্যিই তোমার দাবী-মাফিক মহান পসিডনের ঔরসজাত সন্তান কিনা।'

আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ছোট্ট একটা পাহাড়ের ওপর! নীচে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। রাজা মিনোস বললো—

'আমি এখন আমার মুকুটটা সমুদ্রে ছুঁড়ে দেবো। আমার বিশ্বাস, তুমি ওটা ফিরিয়ে আনতে পারবে।'

মহিলাদের উপস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে আমি প্রতিবাদ করলাম—

'আমি তো কুকুর নই যে আমার প্রভু কিছু ছুঁড়ে দেবেন আর আমি সেটা তুলে আনবো। জিনিষটা মুকুট হলেই বা কি এসে যায়? তার চেয়ে আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিই এবং এমন কিছু তুলে আনি যা আমার

কথার সত্যতা প্রমাণ করবে।'

আমি আরও একটা সাহসের কাজ করলাম। সমুদ্র হাওয়ায় রাজকন্যা অ্যারিয়াডনীর কাঁধ থেকে মস্ত বড় একটা রুমাল খুলে যেয়ে আমার দিকে ভেসে আসতেই আমি হেসে ওটা ধরে ফেললাম। এমন একটা ভাব করলাম যেন এই রাজকন্যা কিম্বা কোন দেবতা ওটা আমাকে উপহার দিয়েছেন। আমার আঁটসাঁট পোষাক খুলে আমি রুমালটা ল্যাঙটের মত পরে নিলাম। ভাব দেখালাম যে পুরুষাঙ্গ মেয়েরা দেখুক, এটা চাইছিনা। আসলে আমার কোমরে ছিল চামড়ার একটা বেল্ট। বেল্টে আঁটা ছোট্ট থলিতে ছিল গ্রীস থেকে আনা কিছু দামী রত্ন আর পাথর। সেটাই আমি ঢাকতে চাইছিলাম!

জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে আমি জলের নীচে ডুব দিলাম।

আমি নিপুণ সাঁতারু। জলের নীচে ডুব দিয়ে আমি ব্যাগ থেকে দুটো ক্রাইসোপ্রেসিস বের করলাম। তারপর জল থেকে শুকনো ডাঙায় ফিরে এসে আমি ওনিক্সটা দিলাম রানীর হাতে আর অন্য দুটো পাথরের এক একটা এক এক রাজকন্যার হাতে। আমি এমন একটা ভাব দেখালাম যেন আমি সমুদ্রের তলায় ওদুটো পেয়েছি, (কিম্বা যেহেতু দুষ্প্রাপ্য এই সব পাথর, যা শুকনো জমিতেই কচিৎ কদাচিৎ পাওয়া যায়, তা এইভাবে একডুবে সমুদ্রের নীচে পাওয়া সম্ভব নয়), অথবা আমার পিতা শক্তিমান সমুদ্রদেবতা পোসিডন ওগুলো আমায় দিয়েছেন যেন আমি ওগুলো মহিলাদের উপহার দিতে পারি।

সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল যে দেবতা পোসিডনের ঔরসে আমার জন্ম এবং পোসিডন আমাকে খুবই ভালোবাসেন।

এরপর রাজা মিনোস আমার তরবারীটা আমায় ফিরিয়ে দিলেন।

একটু পরেই রথে চড়ে আমরা নোসোসের দিকে রওনা হলাম।

॥ পাঁচ ॥

আমার এতো ক্লান্ত লাগছিল যে পরিবেশের নতুনত্ব দেখে আমি ততোটা চমৎকৃত হইনি। প্রাসাদের সামনে প্রকাণ্ড উঠোন, থামগুলো সিঁড়ি, ঘোরানো করিডর বেয়ে মশাল হাতে রাজভৃত্যেরা পথ দেখিয়ে চলেছে। দোতলার একটা ঘরে আমায় থাকতে দেওয়া হয়েছে। আমি ঘরে যাবার পর অজস্র বাতির মধ্যে একটা ছাড়া বাতী সবগুলো নিভিয়ে দেওয়া হল।

বিছানাটা নরম, সুগন্ধ জড়ানো। ওরা চলে যেতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সন্ধ্যা অবধি ঘুমিয়েছিলাম। যদিও দীর্ঘ যাত্রার অবসরেও আমি ঘুমিয়েছি। কারণ সারারাত পথে কাটিয়ে সকালে ক্রীটের রাজধানী নোসোসে পৌঁছেছিলাম।

আমার ব্যক্তিত্বে আন্তর্জাতিকতার ছাপ নেই। মিনোসের রাজসভায় এসে আমি অনুভব করেছি যে আমি গ্রীক এবং আমি এখন প্রবাসে এসেছি। অপরিচিত সব কিছুই আমাকে চমক দিয়েছে।

যেমন, ক্রীটবাসীদের পোষাক, তাদের আচার-আচরণের ধারা, আসবাবপত্র (আমার বাবা রাজা হলেও আমাদের বাড়ীতে আসবাবের অভাব ছিল), গৃহস্থালীর জিনিষপত্র, এবং সেগুলো ব্যবহারের ধারা। এতো কিছু সুন্দর জিনিষের মধ্যে আমি যেন এক বন্য অরণ্যচর। আমি সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিলামনা এবং আমার ব্যবহারে লোকে হাসতো বলে আমার আরও খারাপ লাগতো। আমার অভ্যেস, হাতে খাবার নিয়ে আঙুল দিয়ে মুখে পোরা। ওরা ব্যবহার করে সোনার তৈরী ছুরি—কাঁটা-চামচ। ওগুলো ব্যবহার করা অনেক সোজা। লোকে আমার দিক থেকে চোখ সরাতে চায় না। আমি মুখ খুললে আমাকে আরও বোকা বলে মনে হয়।

আমার নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে বেমানান মনে হতো।
আমি যখন নিজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে একলা কিছু করেছি, তখনই আমি ভালো কিছু করতে পেরেছি। এই প্রথম আমাকে সমাজের একজন হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এটা যুদ্ধ নয় কিম্বা শারীরিক শক্তিতে কোন কিছু তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়। এটা অন্যকে আনন্দ দেওয়ার প্রশ্ন। এবং এ ব্যাপারে আমার সামান্যই অভিজ্ঞতা আছে।

খাওয়ার টেবিলে দুজন রাজকন্যার মাঝখানে আমি বসি। আমাকে বলা হয়েছিল খুবই সরল, সাদাসিধে পারিবারিক ব্যাপার। মিনোস এবং রাণী ছাড়া খাওয়ার আসরে ছিল রাজার ভাই র‍্যাডাম্যানথাস, দুই রাজকন্যা এবং তাদের ছোট ভাই গ্ল্যকাস। এ ছাড়া ছিল রাজপুত্রের একজন গৃহশিক্ষক। করিনথ থেকে আসা এই গ্রীক যুবকের আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি।
ওরা আমাকে নিজের ভাষায় আমার অ্যাডভেঞ্চারগুলো বর্ণনা করতে বললো। রাজসভার সবাই ওই ভাষা বোঝে এবং ওই ভাষায় কথা বলতে পারে। যদিও এদের উচ্চারণে একটু টান আছে। আমি যখন প্রোক্রাসটিস-এর গল্প বলছিলাম, যে দানব পথচারীদের অদ্ভুত ভাবে শাস্তি দিতো এবং পরে একই শাস্তি সে আমার কাছে পেয়েছিল—শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ মেপে যেটা নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে বড়, সেটা কেটে নেওয়া—তখন গল্প শুনে ফেড্রা ও গ্ল্যকাস হাসিতে ফেটে পড়ছে দেখে আমি খুশী হলাম। কিন্তু ক্রীটে আমি কি উদ্দেশ্যে এসেছি, সেই ব্যাপারে কেউ কিছু বললো না। সবাই এমন ভাব দেখালো যেন আমি এখানে বেড়াতে এসেছি।
যতোক্ষণ খাওয়া দাওয়ার পালা চলছিল, অ্যারিয়্যাডনি টেবিলের নীচে আমার পায়ে বারবার চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু তরুণী ফেড্রার শরীরের ওম্ আমার বেশী ভালো লাগছিল। গরুর মতো গোলগোল

চোখে আমাকে এক নজরে দেখছিল, রাণী প্যাসিফি এবং রাজা মিনোসের মুখে সব সময়েই হাসি লেগে আছে। শুধু রাজার ভাই দাড়ীওলা র‍্যাডাম্যানথাস-ই খুশ-মেজাজে ছিল না। খাবারের চতুর্থ পদ শেষ হতেই রাজার সঙ্গে ও বেরিয়ে গেল। বলে গেল—ওরা সিংহাসনে বসতে যাচ্ছে। 'সিংহাসনে বসা' ব্যাপারটা আসলে কি, আমি পরে বুঝেছিলাম।

সমুদ্রযাত্রা-জনিত অসুস্থতায় তখনও আমি ভুগছিলাম। ভোজে বেশী খেয়েছি। মদ খাওয়া আরও বেশী হয়েছিল। আমাকে এতো নানা ধরণের মদ আর লিকর পরিবেশন করা হয়েছিল যে একটু পরে আমার আর জ্ঞান ছিল না।

এর আগে অবধি আমি জল বা জলমেশানো পাতলা মদ খেতেই অভ্যস্ত ছিলাম। মদের নেশায় আমার চারপাশের দুনিয়া বন্‌বন্ ঘুরছে। আমি দাঁড়াতে পারছিনা। আমি এই ঘর ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। রানী তাড়াতাড়ি আমাকে সংলগ্ন একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। শরীর খারাপ লাগছিল বলে আমি রানীর সঙ্গে একই সোফায় বসলাম।

তারপর রানী তার প্রেমালাপ শুরু করলো।

'আমার যুবক বন্ধু, কিছুক্ষণ আমরা একসঙ্গে কাটাবার সুযোগ পেয়েছি, সুতরাং সময়টা সদ্ব্যবহার করা যাক। তুমি যা ভাবছো, আমি সেরকম নই। তোমার চেহারাটা সুন্দর হলেও ও ব্যাপারে আমার লোভ নেই।'

এবং যদিও রাণী বলছিলো, ও আমার আত্মা, মন বা অভ্যন্তরের কিছু একটার ব্যাপারেই আগ্রহী, সে আমার কপালে হাত বোলাতে বোলাতে শেষ অবধি চামড়ার তৈরী জারকিন খুলে আমার বুকে হাত বোলাতে লাগলো। যেন ও দেখতে চাইছিল, সত্যি সত্যিই আমি ওখানে আছি কিনা। রাণী বলছিল—

'আমি জানি, তুমি কি উদ্দেশ্যে ওখানে এসেছো।

• •

আমি তোমার ভুলের ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। তোমার উদ্দেশ্য হত্যা করা। তুমি আমার ছেলে মিনোটর-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এখানে এসেছো। তুমি তার সম্বন্ধে কি শুনেছো, আমি জানিনা। তুমি আমার মিনতি শোনো! যাকে তোমরা মিনোটর বলো, সে দানব কিনা আমি জানিনা কিন্তু সে আমার সন্তান।'

এই সময় আমি বাধা দিয়ে বললাম, দানবেরা দানব বলেই যে আমি তাদের বিরুদ্ধে, এটা সত্যি নয়। কিন্তু রাণী আমার কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলো—

'আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। স্বভাবের দিক থেকে আমি আধ্যাত্ম-বাদী। স্বর্গীয় যা কিছু, তাই আমার ভালোবাসা জাগায়। মুস্কিলটা হলো, কোথায় যে দৈবিক ব্যাপারের সুরু এবং কোথায় শেষ, বোঝাই মুস্কিল। আমার খুড়তুতো বোন লিড-র কাছে দেবতা এসেছিল রাজহাঁসের বেশে। মিনোস জানে, আমি তাকে ডায়োস্কুরোস-এত মত উত্তরাধিকারী দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেবতাদের বীর্যেও যে জান্তব উপাদান আছে, তা কেমন করে চেনা সম্ভব?

আমি আমার ভুলের জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু পিসিয়স, আমি নিশ্চিত-ভাবে বলতে পারি, ষাঁড়ের সঙ্গে সঙ্গমের মুহূর্তটা ছিল আমার জীবনের এক ঐশ্বরিক মুহূর্ত। কারণ, তুমি ভেবে দেখো, ষাঁড়টা সাধারণ ষাঁড় ছিল না। দেবতা পোসিডন স্বয়ং তাকে পাঠিয়েছিলেন। ওই ষাঁড়টাকে দেবতার কাছে বলি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ষাঁড়টা এতোই সুন্দর যে মিনোস ওকে বলি দিতে চাইলোনা। তাই পরবর্তীকালে আমি সবাইকে বুঝিয়েছি যে ষাঁড়ের জন্য আমার দৈহিক কামনা আসলে দেবতার প্রতিশোধের একটা রূপ। তুমি তো জানো আমার শাশুড়ী ইউরোপাকে একটা ষাঁড় চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই ষাঁড়ের ভেতরে ছিল দেবতা জিউস স্বয়ং। জিউসের ঔরসে ইউরোপার গর্ভে আমার স্বামী মিনোসের জন্ম হয়। তাই এই পরিবারে ষাঁড়কে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়। সেই জন্যে, মিনোটরের জন্মের পর রাজা

মিনোস ভুরু কোঁচকালেই আমি বলতাম—

'তোমার মায়ের কেচ্ছার কথা ভুলে গেলে?' মিনোসকে স্বীকার করতেই হতো, ভুলটা স্বাভাবিক। মিনোস খুবই জ্ঞানী। ওর ধারণা, জিউসের উত্তরাধিকারী হিসেবে ও এবং ওর ভাই র‍্যাডাম্যানথাস বিচারের অধিকার পেয়েছে। ওর মতে বিচার করার আগে ওকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে এবং যতোক্ষণ ও বা পরিবারের কেউ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যাপারটা না বুঝেছে, ততোক্ষণ পর্য্যন্ত ওর পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়। ওর এই ধারণা থেকে আমরা পরিবারের সবাই নানারকম ভুল করতে প্রেরণা পাই। ওর মেয়েরা এবং আমি বিভিন্নভাবে নানারকম ভুল করি। যাতে বিচারক হিসেবে মিনোসের দিন দিন উন্নতি হয়। মিনোটরও তাই করছে, যদিও সে তা জানেনা। থিসিয়স, তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি যে তুমি মিনোটরের কোন ক্ষতি করোনা; বরং ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলে যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে ক্রীটের সঙ্গে গ্রীসের শত্রুতা হয়েছে, তার অবসান ডেকে আনো। কারণ এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে আমাদের দু'দেশেরই যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে।'

……এই না বলে রাণী আমার যত্ন করতে সুরু করলো এবং সমস্ত ব্যাপারটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছুলো যখন মদের গন্ধভরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে রাণীর স্তনের তীক্ষ্ণ গন্ধ মিশে আমার যথেষ্ট অসুবিধের সৃষ্টি করলো।

'এবার আমরা স্বর্গীয় ব্যাপারে ফিরে যাই।'

রাণী বলছিল।

'থিসিয়স, তুমি নিজেও কি কখনও কখনও বুঝতে পারোনা যে তোমার ভেতরে কোন না কোন দেবতা লুকিয়ে আছে?'

আমার অসুবিধার আর একটা কারণ, রাণীর বড় মেয়ে অ্যারিয়াডনী (দেখতে অপূর্ব সুন্দরী, তবে আমার কাছে ওর ছোট বোন ফেড্রার

আকর্ষণই বেশী মনে হয়েছিল) আমাকে আগেই ইঙ্গিতে ও ফিসফিস করে কথা বলেছে, সে আমার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করবে।

॥ ছয় ॥

কি সুন্দর বারান্দা! কি বিশাল প্রাসাদ! মনে হল যেন চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মত বাগানটা অজানিত কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে। সময়টা ছিল মার্চ মাস। কিন্তু বসন্তের আরামদায়ক ঈষৎ-উত্তাপ আমি এরই মধ্যে টের পাচ্ছিলাম। খোলা হাওয়ায় আমার বেশ ভাল লাগলো। বন্ধ দরজার আড়াল থাকতে আমি অনভ্যস্ত। আমি ফাঁকা হাওয়ার শ্বাস নিতে ভালোবাসি। আমাকে দেখেই ছুটে এল অ্যারিয়্যাডনী এবং কোন কথা না বলে এত জোর তার তপ্ত ঠোঁটদুটো আমার ঠোঁটে চেপে ধরলো যে আর একটু হলে আমরা দুজনেই উল্টে পড়তাম।

'আমার পেছন পেছন এসো। অবশ্য কেউ আমাদের দেখে ফেললে কিছু আসে যায় না, তবে গাছের ছায়ায় আমরা প্রাণ খুলে কথা বলতে পারবো!'

অ্যারিয়্যাডনী বললো।

বাগানের যে দিকে পাতার ভিড়, যেখানে বড় বড় গাছগুলো চাঁদকে আড়াল করলেও সমুদ্রের বুকে চাঁদের প্রতিফলন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আমাকে সেখানে নিয়ে যায় আমার সঙ্গিনী। সে এর মধ্যেই পোষাক বদলেছে। এখন তার পরনে ঘাবর প্যাটার্ণ স্কার্ট আর আঁটসাঁট উর্দ্ধাবরনীর বদলে হাল্কা ঢিলে পোষাক, যার আড়ালে সে সম্পূর্ণ নগ্ন।

'আমার মা তোমায় কি বলছিলো, আমি অনুমানে জানি। আমার মা পাগল। আমার মা যা কিছু বলেছে, তুমি অনায়াসে ভুলে যেতে

পারো। প্রথমতঃ, যে কথাটা তোমার বোঝা উচিত, এখানে এসেছো আমার সং ভাই দানব মিনোটরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে। আমি নিশ্চিত, তুমি জয়ী হবে। তোমাকে দেখা মানেই সংশয়কে মন থেকে নির্বাসন দেওয়া : (আমার কথার কাব্যিক ধরনটা কি কি তোমার কানে এলোনা ? হয়তো তোমার কবিতা শোনার কান নেই।) কিন্তু যে গোলকধাঁধার ভেতরে মিনোটর থাকে, সেখানে থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের সাধ্য নয়। যদি তোমার প্রেমিকা (তার মানে, আমি) তোমায় সাহায্য না করি, তুমিও এখান থেকে বের হতে পারবেনা। ওই গোলকধাঁধাটা কি ভীষণ জটিল, তুমি বুঝতে পারছোনা। কাল আমি তোমাকে ডিডেলাসের কাছে নিয়ে যাবো। সে এই গোলকধাঁধা তৈরী করেছিল। কিন্তু কিভাবে ওখান থেকে বের হতে হয়, সে এর মধ্যেই ভুলে গেছে। তুমি ডিডেলাসের কাছে শুনে কিভাবে ডিডেলাসের ছেলে ইক্যারাস এক-বার সাহস করে ওই গোলকধাঁধায় ঢুকে পাখার সাহায্যে হাওয়ায় ভেসে তবেই বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। আমি তোমাকে ওইভাবে গোলকধাঁধা থেকে বের হবার চেষ্টা করতে বলবোনা। ওটা খুবই বিপজ্জনক পন্থা।

তুমি এটা বুঝে নাও যে তোমার বাঁচার একমাত্র পথ হলো আমার কাছাকাছি থাকা। তোমাকে এবং আমাকে—আমাদের এখন থেকে একসঙ্গে থাকতে হবে। জীবনে এবং মরণে। শুধুমাত্র আমার সাহায্যে, আমার দ্বারা এবং আমার ভেতরে তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে। তুমি আমাকে নাও বা আমাকে যেতে দাও। যদি তুমি আমাকে না নাও ফলটা তোমার পক্ষে খারাপ হবে। সুতরাং তুমি এখন আমাকে নাও।'

কথা শেষ করেই অ্যারিয়্যাডনী আর কোন সংযমের ধার না ধরে আমার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়লো এবং ভোর অবধি আমাকে আলিঙ্গনে বেঁধে রাখলো।

আমার পক্ষে রাত্রির প্রহরগুলো খুব আস্তে আস্তে কাটছিল। কারণ আনন্দের মুহূর্তেও দীর্ঘ সময় এক জায়গায় থাকা আমার পছন্দ নয়। নতুনত্ব কেটে গেলেই আমি বাঁধন ছিঁড়ে দূরে যেতে চাই। পরবর্তীকালে অ্যারিয়্যাডনী প্রায়ই বলবে : 'থিসিয়স, তুমি কথা দিয়েছিলে।' কিন্তু আমি কোন প্রতিশ্রুতিই দিইনি! সবার ওপরে আমার স্বাধীনতা। আমার প্রথম কর্তব্য আমার নিজের প্রতি।

যদিও আমার স্নায়ু মদের নেশায় কিছুটা আচ্ছন্ন ছিল, যেভাবে অ্যারিয়্যাডনী তার কুমারীত্ব বিনা দ্বিধায় আমাকে সঁপে দিল, আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, আমি তার জীবনে প্রথম পুরুষ নই। সুতরাং তাকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি বিবেকের কোন দংশন অনুভব করিনি।

তাছাড়া তার ভাবপ্রবণতা আমার কাছে ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছিল। সে আমাকে চিরদিন ভালোবাসবে, এই প্রতিশ্রুতি এবং যেসব নরম বিশেষণে সে আমাকে ভোলাতে চাইতো সেগুলোও আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি কখনো ছিলাম তার সাত রাজার ধন, কখনো বা তার ক্যানারী পাখী, কখনো বা তার কুকুর, কখনো বা তার গিনী-ফাউল। এইসব প্রিয় নাম ধরে কেউ আমাকে ডাকুক, তা আমার আদৌ পছন্দ নয়। তাছাড়া অ্যারিয়্যাডনী বড্ড বেশী পড়াশুনা করেছিল। সে বলতো, 'প্রিয় আমার, আইরিশ ফুলগুলা শুকিয়ে যাবে, ঝরে যাবে। (আসলে কিন্তু ফুলগুলো সবে ফুটতে সুরু করেছে।) আমি খুব ভালোভাবেই জানতাম যে কোনো কিছুই চিরদিন থাকেনা। কিন্তু আমার কাছে বর্তমান ছাড়া কোন কিছুরই গুরুত্ব নেই। তাছাড়া অ্যারিয়্যাডনী বলতো—'তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবোনা।' কথাটা শুনেই আমি ভাবতে সুরু করতাম, কিভাবে ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

'তোমার বাবা রাজা মিনোস কি বলবে?

আমি ওকে প্রশ্ন করেছি।

ও উত্তরে বলেছে।

'মিষ্টি সোনা, মিনোস সবকিছুই সহ্য করে। যাতে বাধা দেওয়া যায় না, তা হতে দেওয়াই ওর মতে বুদ্ধিমানের কাজ। আমার মা ষাঁড়ের সঙ্গে সঙ্গমে মেতেছিল বলে সে রাগারাগি করেনি। তবে সব শুনে সে বলেছিল, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝলাম না। তবে যা হবার হয়ে গেছে এবং যাই করা যাক, এখন আর ঘটনা বদলাবেনা। সুতরাং আমাদের ব্যাপারে সে ঠিক তাই করবে। বড় জোর ও হয়তো তোমায় রাজসভা থেকে নির্বাসন দেবে। তাতে কিছু এসে যায়না। তুমি যেখানে যাবে, আমিও যাবো।

আমি ভাবলাম· ·।

আমি যেখানে যাবো, সেখানে তুমি যাও কিনা সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

হাল্কা প্রাতরাশের পর আমি বললাম যে আমি ডিডেলাসের সঙ্গে একা দেখা করতে চাই।' আমাকে পোসিডনের নামে শপথ নিতে হল যে কথা শেষ করেই আমি প্রাসাদে অ্যারিয়্যাডনীর কাছে ফিরে আসবো। তবে আমার প্রস্তাবে রাজী হল অ্যারিয়্যাডনী।

॥ সাত ॥

আমাকে স্বাগনত জানাতে উঠে দাঁড়ায় ডিডেলাস। স্বল্পালোকিত ঘর। সামনে অনেকগুলো ড্রয়িং ছড়ানো। চারপাশে অদ্ভুত কিছু যন্ত্রপাতি। লোকটা খুবই দীর্ঘকায় এবং বয়স অনেক হওয়া সত্বেও তার মেরুদণ্ড ঋজু। তার দাড়ির রং রূপালী। মিনোসের কালো দাড়ি বা র‍্যাডাম্যানথাসের সাদা দাড়ির চেয়েও বড় দাড়ি ডিডেলাসের। চওড়া কপালে অনেকগুলো গভীর ভাঁজ পড়েছে। সে নীচের দিকে তাকালে পুরু ভুরুজোড়ার নীচে চোখদুটো আধো-ঢাকা

পড়ে। সে আস্তে আস্তে ভারী গলায় কথা বলে। সে যখন চুপ করে থাকে, তখনও মনে হয়, সে কিছু ভাবছে।

ডিডেলাস আমাকে আমার নানা অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে অভিনন্দন জানালো। বললো, যদিও সে পৃথিবীর কলকোলাহল থেকে দূরে থাকে, আমার বীরত্বের কাহিনীগুলো তার কানেও পৌছেছে। কিন্তু তার চোখে, আমি নির্বোধ। কেননা অস্ত্রের সাহায্যে কে কি করলো, ডিডেলাসের কাছে তার কোন গুরুত্ব নেই এবং শারীরিক শক্তিকে সে ঐশ্বরিক কিছু বলে মনে করেনা।

ডিডেলাস বললো—

'একসময় তোমার পূর্বসূরী হারকিউলিস-এর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। লোকটা নির্বোধ ছিল। বীরত্ব দেখানো ছাড়া অবশ্য কিছু ওর কাছে আশা করা যেতোনা। কিন্তু তার মধ্যে যা আমার ভালো লেগেছিল, তা হল, যে কাজটা সে করছে, সেই কাজটা সে একমনে করে এবং তার দুঃসাহস কখনও পিছু হটেনা। তোমার ও হারকিউ-লিসের অসমসাহসকে ঔদ্ধত্য বললে ভুল হয়না। এই দুঃসাহস তোমাদের সামনের দিকে গিয়ে নিয়ে গেছে এবং তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু তার আগে এই অসম সাহস সেই কাপুরুষকে ধ্বংস করেছে, যে কাপুরুষ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরালে লুকিয়ে আছে। হারকিউলিস তোমার চেয়ে বেশী কষ্ট করেছে। ভালো কিছু করবে বলে তার যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ছিল। একটা অ্যাডভেঞ্চার শেষ হলে তাকে বিষণ্ণ মনে হত। কিন্তু তোমার মধ্যে যা আমার ভালো লেগেছে, তা হলো, তুমি সবকিছু থেকে আনন্দ আহরণের চেষ্টা করো। এখানেই হারকিউলিসের সঙ্গে তোমার তফাৎ। তুমি তোমার মন বা চিন্তাশক্তিকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলোনা বলে আমি তোমার প্রশংসা করছি। ওসব তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো, যারা নিজেরা সক্রিয় নয়, কিন্তু কাজের লোকেদের কাজের ভালো ভালো উদ্দেশ্য উদ্ভাবনে পটু।

তুমি কি জানো যে তুমি ও আমি আসলে দূরসম্পর্কের ভাই। মিনোস কথাটা জানেনা। ওকে এ ব্যাপারে কিছু না বলাই ভালো। আমাকে দুঃখের সঙ্গে আমার স্বদেশ অ্যাটিকা ছাড়তে হয়েছিল। সে সময় আমার ভাগনা ট্যালোসের সঙ্গে আমার মতভেদ দেখা দেয়। আমার মত সেও ছিল ভাস্কর। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাস্কর ট্যালোস খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে দাবী করে যে ভাস্কর্যে বিভিন্ন দেবমূর্তির পায়ের দিকটা স্থির, গতিহীন, শান্ত ভঙ্গিমায় রেখে সে দেবতাদের মাহাত্ম্য রক্ষা করছে। অন্যদিকে আমি চেয়েছিলাম, দেবমূর্তির হাত-পায়ে গতির ভঙ্গিমা এনে দেবতাদের মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতে।

আমারই চেষ্টার ফলে অলিমপাস আজ পৃথিবীর প্রতিবেশী হয়েছেন। এরই পরিপূরক হিসেবে আমি বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মানবজাতিকে দেবতাদের ছাঁচে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

তোমার বয়সে জ্ঞান অর্জনই ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো বাসনা। আমি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া মানুষের বাহুবল বিশেষ কিছুই করতে পারেনা এবং 'শক্ত হাতের চাইতে ভালো যন্ত্রের দাম বেশী'—এই প্রবাদটা সত্যি। তোমার বাবা তোমাকে যে অস্ত্রগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো না পেলে তোমার পক্ষেও অ্যাটিকা ও পেলোপনীজ-এর দস্যুদের দমন করা সম্ভব হতোনা। আমি ভেবেছিলাম যে আমার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ হবে যন্ত্র-গুলোর উন্নতি করা এবং সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন অঙ্কশাস্ত্র, যন্ত্র-বিজ্ঞান ও জ্যামিতি আমার ততোটা আয়ত্ত হবে, যতোটা মিশর-বাসীরা জানে। তত্ত্ব থেকে প্রয়োগে যেতে হলে আমাকে বিভিন্ন পদার্থের গুণাগুণ জানতে হবে। এমনকি যেসব পদার্থের এই মুহূর্তে কোন আপাতদৃষ্ট প্রয়োজন নেই, সেগুলোরও গুণাগুণ জানা দরকার। কেননা মানবজগতে যেমন জড়জগতেও তেমনি আমরা অপ্রত্যাশিত জায়গায় অসাধারণ গুণের সন্ধান পাই।

অন্যান্য ব্যবসা, অন্যান্য শিল্পকলা, অন্যান্য আবহাওয়া এবং অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে আমি দূরদেশে গেছি, বিখ্যাত বিদেশী পণ্ডিতদের শিষ্য হয়েছি এবং তাঁদের কাছে ততোদিন থেকেছি, যতোদিন তাঁদের আমাকে শেখাবার মত আর কিছু না থাকে। কিন্তু যেখানেই আমি থেকে থাকি এবং যতোদিনই আমি থেকে থাকি, আমি অন্তঃকরণের দিক থেকে গ্রীকই রয়ে গেছি। এবং যেহেতু আমি জানি, তুমিও গ্রীকের সন্তান, আমি তোমার ব্যাপারে আগ্রহী।

ক্রীটে ফিরে আমি মিনোসকে আমার পড়াশুনো ও দেশভ্রমণের ব্যাপারে বললাম এবং যে পরিকল্পনাটা আমার মনে এসেছিল, সেটাও জানালাম। মিশরে মোয়েরিস হ্রদের তীরে আমি একটা গোলকধাঁধা দেখেছি। আমি প্রস্তাব দিলাম, মিনোস আমার পরিকল্পনায় রাজী হলে এবং আমায় সাহায্য করলে আমি অন্য প্ল্যানে একটা গোলকধাঁধা তার প্রাসাদের কাছেই তৈরী করবো। সে সময় মিনোস একটা ঝামেলায় পড়েছিল। ষাঁড়ের সঙ্গে যৌনসঙ্গমের পর তার রানী এক দানবের জন্ম দিয়েছে। কিভাবে সেই দানবশিশুর দেখাশোনা করা উচিত, মিনোস জানেনা। কিন্তু মিনোটরকে সকলের থেকে আলাদা করে রাখা এবং জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে মিনোস আমাকে বললো, আমি যেন এমন একটা বাড়ী এবং পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত একসারি বাগান তৈরী করি, যেখানে ঐ দানব ঠিক বন্দী থাকবেনা অথচ ওখান থেকে পালাতেও পারবেনা! আমার সব জ্ঞান এবং আমার শ্রেষ্ঠ চিন্তার ফসল এই গোলকধাঁধা।

কিন্তু যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে যদি কেউ প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করে, কোন কারণেই তাকে আটকাতে পারেনা এবং সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে কোন পরিখা ও যে কোন বেড়াই ডিঙোতে পারে, আমি ভেবেছিলাম যে বন্দীকে কারাগারে রাখার শ্রেষ্ঠ উপায়

কারাগারটা এমনভাবে গড়া নয় যাতে তার বের হবার পথ থাকবেনা, বরং এমনভাবে গড় যেন সে কারাগার ছেড়ে যেতেই চাইবেনা। সব ধরণের ইচ্ছাপূরণের উপাদান তাই ওখানে আমি জড়ো করেছিলাম। মিনোটরের চাহিদা বেশী নয়, চাহিদার বৈচিত্র্যও কম। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার সময় সকলের কথাই ভাবতে হয়েছিল। সকলের অর্থাৎ যে কেউ ওই গোলকধাঁধায় ঢুকবে, তারই রুচির কথা আমরা ভেবেছিলাম। আর একটা প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল যে কোন আগন্তুকের ইচ্ছাশক্তিকে নষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যে আমি ওখানে যে মদ পরিবেশন করা হয় তার সঙ্গে কিছু মাদকদ্রব্য মিশিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওটাই যথেষ্ট নয়। আমি আরও ভালো একটা রাস্তা খুঁজে পেলাম।

আমি দেখেছি যে কিছু কিছু গাছ আছে, যা আগুনে ফেলে দিলে এমন এক ধরণের ধোঁয়া বের হয়, যার গন্ধে নেশা হয়। আমার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এগুলো চমৎকার কাজে এলো এবং যে উদ্দেশ্যে আমি এগুলোকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম, ঠিক তাই হল। আমি ওখানে দিবারাত্রি ষ্টোভ জ্বেলে রাখার ব্যবস্থা করলাম এবং ষ্টোভের আগুনে ওইসব গাছ পোড়ানো হতে লাগলো। ভারী গ্যাসগুলো শুধু যে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তাই নয়, তারা মিষ্টি একটা নেশার ভাব আনে, আনন্দদায়ক দৃষ্টিবিভ্রম জাগায় এবং ইন্দ্রিয় সুখবর্ধক এইসব মরীচিকা দেখতে দেখতে মন 'অর্থহীন' ক্রিয়াকলাপে মেতে ওঠে। 'অর্থহীন' কথাটা আমি এই অর্থে ব্যবহার করছি যে এই ক্রিয়াকলাপের ফলাফল কল্পনাভিত্তিক। যেসব দৃশ্য দূরকল্পনা, অনুধ্যান ও বিবেচনা এই ক্রিয়াকলাপের ফসল, তার সঙ্গে পরম্পরা, যুক্তি ও বাস্তবতার কোন মিল নেই। এই গ্যাস নিশ্বাসের সঙ্গে যাদের শরীরে ঢোকে, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক ফল হয় না। প্রত্যেকের নিজের মনে যে ধরণের জটিলতা আছে, তার নির্দিষ্ট প্রভাবেই যে আত্মহারা হয় : অন্যভাবে বলতে পারি, নিজের গোলক-

ধাঁধায় সে নিজেকে হারায়।

আমার ছেলে ইকেরাস্-এর ক্ষেত্রে এই জটিলতাগুলো অধিবিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত। আমার ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিবিভ্রম বিশাল, অগণিত ও জটিল প্রাসাদ, সিঁড়ি ও করিডরের রূপ নেয়। আমার ছেলের দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত অনুধ্যান যেমন, আমার দৃষ্টিবিভ্রম তেমনি শেষ হয় একটা সাদা দেয়ালের মুখোমুখি রহস্যজনকভাবে। কিন্তু এই মাদক সুগন্ধিগুলোর সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য জিনিষ হল, কোন মানুষ কিছুদিন এগুলোর ঘ্রাণ নিলে তার পক্ষে এগুলো অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। শরীর এবং মন দুইই এই খারাপ নেশার স্বাদ খোজে। নেশা না পেলে বাস্তব জগতের কোন আকর্ষণ থাকে না এবং কেউ বাস্তবের কাছে ফিরে যেতেও চায় না।

যেহেতু মিনোটরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে তোমাকে এই গোলকধাঁধার ভেতরে ঢুকতে হবে, আমি তোমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি একা কখনোই সফল হবে না। অ্যারিয়্যাডনী তোমার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু ও ভেতরে ঢুকবে না এবং কোন কারণেই যেন ও ওইসব মাদক বাষ্পের ঘ্রাণ না পায়। তুমি যখন নেশায় অভিভূত হয়ে পড়বে, ও যেন স্বাভাবিক থাকে। নেশা হলেও তুমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে। এর ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট না হতে পারে। কারণ মাদক বাষ্প এই ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে দেবে।

তাই আমি এই প্ল্যানটার কথা ভেবেছি। অ্যারিয়্যাডনী ও তুমি বাঁধা থাকবে সুতো দিয়ে। কর্তব্যের নির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও স্পর্শনীয় যোগসূত্র দিয়ে। সুতো তোমাকে সাহায্য করবে, তোমাকে বাধ্য করবে অ্যারিয়্যাডনীর কাছে ফিরে যেতে।

গোলকধাঁধার আকর্ষণ, অচেনার হাতছানি, তোমার দুঃসাহসের সামনের দিয়ে এগিয়ে চলার প্রেরণা—সবকিছু সত্ত্বেও তুমি কোন কারণে সুতো ছিঁড়ো না। তুমি ওর কাছে ফিরে যেও। নইলে

সবকিছু এবং ভালো যা কিছু সবই হারাবে।
ওই সুতোটাই হবে অতীতের সঙ্গে তোমার যোগসূত্র। অতীতের কাছে, নিজের কাছে ফিরে যাও। কারণ শূন্য থেকে কোন কিছুই সুরু হয় না। তোমার অতীত থেকে এবং তোমার বর্তমান থেকেই তোমার ভবিষ্যৎ জন্ম নিতে পারে।
যদি তোমার ব্যাপারে আমার আগ্রহ না থাকতো, আমি এসব আরও সংক্ষেপে বলতাম। কিন্তু নিয়তির সঙ্গে সাক্ষাতে যাওয়ার আগে তুমি আমার ছেলে ইকেরাসের কথা শুনে যাও। ওর কথা শুনলে তুমি কি ধরণের বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছো, তা তোমার সামনে ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদিও আমার সাহায্যে আমার ছেলে ইকেরাসের পক্ষে গোলকধাঁধার ডাইনী-জাল থেকে পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল, ওর মন আজও গোলকধাঁধার অশুভ প্রভাবের দাস।'

ছোট্ট একটা দরজার সামনে যেয়ে রঙ-করা পর্দাটা তুলে জোরাল গলায় হাঁক দেয় ডিডেলাস—
'ইকেরাস, আমার প্রিয় পুত্র, বাইরে এসে তোমার কষ্টের কথা আমাদের বলো। কিম্বা বরং যা ভাবছো, তাই চেঁচিয়ে বলো। একা থাকলে তুমি যেমন করো। আমার বা আমার অতিথির দিকে নজরে হবে না। ধরে নাও, এখানে আমরা কেউ নেই।'

॥ আট ॥

আমি দেখলাম, আমারই বয়সের এক যুবক, আধো-অন্ধকারে তাকে অপূর্ব সুন্দর মনে হল। মাথায় হাল্কা রঙের লম্বা চুল। চুলের গুচ্ছগুলো কাঁধে এসে পড়েছে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও বিশেষ কিছুর দিকে চেয়ে নেই। কোমর অবধি খোলা, কোমরে

আঁটসাঁট ও ধাতুর তৈরী বেল্ট। চামড়া ও কালো কাপড়ের ফালি ল্যাঙটের মতো করে অদ্ভুত ধরণের গিঁট দিয়ে বাঁধা, তাতে উরু দুটোর ওপরের অংশই ঢাকা পড়েছে। তার পায়ে সাদা চামড়ার বুটজোড়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

মনে হলো, ও বাইরে কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু আসলে গতিটা শুধু ওর মনের। ও আমাদের দেখতেও পায়নি বলে মনে হল। নিজের অবিচ্ছিন্ন বিতর্কমূলক চিন্তাধারা অনুসরণ করে ইকেরাস বলে চলেছে :

'এই পৃথিবীতে কে প্রথম এসেছিল? পুরুষ না নারী? তবে কি স্রষ্টা আসলে এক রমণী? বিচিত্র ও অসংখ্য প্রাণীরা, তোমরা কোন মহাজননীর গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছো? এবং উৎপাদনের কোন নিয়মে সেই মাতৃজঠর মাহাত্ম্য পেয়েছিল। সৃষ্টির দ্বৈতবাদ অনস্বীকার্য্য। সেক্ষেত্রে ঈশ্বর সেই মহাজননীর সন্তান। আমার মন ঈশ্বরকে ভাগ করতে চায় না। যেখানে বিভাজন, সেখানেই সংঘর্ষ। বহু দেবতার অস্তিত্ব মানেই দেবতার যুদ্ধ। বহু দেবতা কখনো ছিল না। ঈশ্বর এক ও অনন্য। ঈশ্বরের আলয় শান্তির নীড়। সবকিছুই সেখানে অভিনিবিষ্ট হয়। বিরুদ্ধ বস্তুর সমন্বয় সেই মহান অস্তিত্বের গভীর।'

একটু সময় চুপ করে থাকে ইকেরাস্। তারপর আবার বলে :

'কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি সরলতা, স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার প্রতীক হলেও জীবন এতো জটিল কেন? এতো গোলযোগ এবং এতো সংঘর্ষের যুক্তি কি? এসব কিসের দিকে চলেছে? এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায়? কেন আমরা সবকিছুর যুক্তি খুঁজি? ঈশ্বর ছাড়া আর কোনদিকে আমরা মুখ ফেরাতে পারি? কিভাবে আমরা আমাদের পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করবো? আমরা কোথায় থামবো?

কখন আমরা বলতে পারবো : তাই হোক, আর কিছু করার নেই। মানুষ থেকে শুরু করে কিভাবে আমরা ঈশ্বরে উপনীত হতে পারি?

এবং ঈশ্বর থেকে সুরু করলে কিভাবে আমি নিজের কাছে পৌঁছুবো? মানুষ যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে ঈশ্বরও কি মানুষের সৃষ্টি নয়? এইসব নানা পথ যেখান থেকে সুরু হয়ে নানা দিকে গেছে, সেই কেন্দ্রীয় বিন্দু খুঁজে ফিরছে আমার মন।'

কথা বলতে বলতে ইকেরাসের কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে। তার কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে যায়। আধো-আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার মনে হয়, দারুণ পরিশ্রম করে ইকেরাস যেন হাঁফাচ্ছে।

সে বলছে—

'ঈশ্বরের কোথায় সূচনা, আমি জানিনা। কোথায় তাঁর সমাপ্ত, সেবিষয়ে আরও কম জানি। নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হলে আমার বলা উচিত যে ঈশ্বরের সূচনার সমাপ্তি নেই। তাই কিছু কিছু শব্দ আমাকে যন্ত্রণা দেয়। যেমন 'অতএব', 'যেহেতু' এবং 'এই কারণ।' উপপত্তি এবং অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত আমার অসহনীয় মনে হয়। দুটি বাক্য থেকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুন্দরতম যুক্তি বা ন্যায়শাস্ত্র থেকে আমি এমন কিছু শিখিনা, যা আমি নিজে প্রথমে প্রয়োগ করিনি। ঈশ্বরকে আমি সূচনায় রাখি। তাই সমাপ্তিতে ঈশ্বর থাকেন।

আমি যদি তাঁকে সূচনায় না রাখি, সমাপ্তিতে তাঁকে আমি খুঁজে পাই না। আমি যুক্তিশাস্ত্রের প্রত্যেকটি পথে ঘুরেছি! আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে হয়। তার চেয়ে পাখীর মত ডানা মেলে উড়ে যাওয়া ভালো, নিজের ছায়া থেকে দূরে যাওয়া ভালো, শরীরের গ্লানি থেকে দূরান্তে যাওয়া ভালো এবং অতীতের গুরুভার থেকে মুক্ত হওয়া অনেক ভালো। অনন্ত অসীম আমাকে ডাক দিয়েছে।

আমি এমন একটা অনুভূতির স্বাদ পাই যেন খুব উঁচু জায়গা থেকে আমাকে কেউ ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হে মানবমন, আমি

তোমার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবো। আমার বাবা যন্ত্র বিজ্ঞানে অসাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে আমাকে আকাশে ভাসার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। আমি একা শূণ্যে ভাসবো। আমি ভয় পাইনা। আমি এই দুঃসাহসের মূল্য দেবো। আমার মুক্তির এটাই একমাত্র পথ। হে সহ্য মানবমন, সমস্যার জটিলতার দীর্ঘদিন বাঁধা থাকলেও নতুন এক পথ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আমাকে কে ডাক দিয়েছে আমি বোঝাতে পারবোনা। কিন্তু আমি জানি, আমার যাত্রার একটাই সমাপ্তি। সেই সমাপ্তি : ঈশ্বর।'

...তারপর ইকেরাস আমাদের ফেলে রেখে পেছনে সরে যায়, পর্দাটা তোলে ও ঘরের ভেতরে মিলিয়ে যায়।

'ছেলেটা হতভাগ্য।'

ডিডেলাস বলে।

'যেহেতু ও ভেবেছিল যে ও কোনদিনই গোলকধাঁধা থেকে পালাতে পারবেনা এবং যেহেতু ও বোঝেনি যে এই গোলকধাঁধা আসলে ওর নিজের অস্তিত্বের অন্তরালে লুকিয়ে আছে, ওর অনুরোধে আমি ওকে এক জোড়া ডানা তৈরী করে দিয়েছিলাম, যার সাহায্যে ও হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে, ওর মনে হয়েছিল, ওর সব পার্থিব পথের গতি রুদ্ধ এবং একমাত্র আকাশ পথেই ওর মুক্তি। আমি জানতাম, অধ্যাত্মবাদে ওর আসক্তি আছে। তাই ওর এই আকাঙ্খায় আমি আশ্চর্য্য হইনি। কিন্তু ওর বাসনা পূর্ণ হয়নি। ওর কথা শুনেই তুমি সম্ভবতঃ তা বুঝেছো। আমি সাবধান করে দেওয়া সত্বেও খুব উঁচুতে উড়তে যেয়ে নিজের শক্তির সীমা লঙ্ঘন করেছিল। ও সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিল। ও মরে গেছে।'

'তা কি করে হয়?'

আমি চেঁচিয়ে উঠি।

'আমি তো এক মুহূর্ত আগে ওকে জীবিত দেখলাম।'

'হ্যাঁ।'

জিডেলাস বললো।

'তুমি ওকে দেখেছো এবং ওকে দেখে তোমার মনে হয়েছে, ইকেরাস জীবিত। কিন্তু ও মৃত। থিসিয়ুস, আমার ভয় হয়, যদিও তুমি গ্রীক, যদিও তুমি সত্যের সূক্ষ্ম ও অন্যান্য দিক অনুধাবনে অভ্যস্ত, তোমার মেধা আমার যুক্তি বুঝতে পারবেনা। কেননা এই সত্যটা বুঝতে আমারও সময় লেগেছে। আমাদের মতে যে সব মানুষের মন ও মনন চিরন্তনের মাপকাঠিতে সামান্য নয়, আমরা শুধুমাত্র দিন-যাপন আর প্রাণধারণের সাধারণ অস্তিত্বে আবদ্ধ নই। নশ্বর মানুষের চোখে সময়ের যে পরিমাপ, সেই পরিমাপে আমরা বড় হয়ে উঠি, নিয়তি নির্দিষ্ট কাজ করি এবং মরে যাই। কিন্তু আরও একটা চিরন্তন এবং সত্য স্তর আছে, যেখানে সময়ের কোন অস্তিত্ব নেই। সেই স্তরে মানবজাতির প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিটি ক্রিয়া তার বিশেষ গুরুত্ব অনুযায়ী স্থান পায়। আমার ছেলে ইকেরাস তার জন্মের আগে এবং মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মিক সংকট, মানুষের উদ্ভাবনী এবং কবিতার বাঁধনহারা আকাশচারি তার প্রতিভূ। তার সংক্ষিপ্ত জীবনে সে এইসবেরই প্রতিভূ ছিল, তা সে জীবন দিয়ে শোধ করেছে। কিন্তু এখানেই তার সমাপ্তি নয়। বীরের জীবনে যা ঘটে : তা হলো এই যে তার ছাপ রয়ে যায়। কবিতা এবং শিল্পকলা তার কীর্তিকে নতুন জীবন দেয় এবং তার জীবন এক চিরস্থায়ী প্রতীক হয়ে ওঠে। এইভাবেই শিকারী ওরিয়ন জীবনে যেমন অজস্র শিকার করেছে, আজও সে অ্যাসফোডেলের এলিসিয়ান পথে তেমনি শিকারযাত্রায় চলেছে এবং রাত্রির আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জে তার ও তার অশ্বের প্রতীক আঁকা আছে। এইভাবে অনন্তকাল জুড়ে ট্যান্টালাসের তৃষ্ণা কাটেনা এবং সিসিফাস যখন করিনথের রাজা ছিল, তখন যেমন, আজও তেমনি সে পাহাড়ী চড়াই বেয়ে ভারী পাথর চূড়ায় তুলতে চেষ্টা করে, যদিও সেই পাথর চূড়োর কাছাকাছি পৌঁছে নীচে গড়িয়ে যায়।

কারণ তুমি বুঝতে পারবে যে জীবনে যে সমস্ত কাজ আমরা অসমাপ্ত রাখি মৃত্যুর পর সেই সব কাজ বারবার করতে যাওয়াই নরকের শাস্তি।

এইভাবে প্রাণীজগতে একটি প্রাণীর মৃত্যু সেই প্রাণীজাতির মধ্যে কোন অভাব আনেনা। কারণ মানবেতর প্রাণী তার স্বাভাবিক আকার ও ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখে। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর সমাজে ব্যক্তির কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু মানুষের পৃথিবীর ব্যক্তিই সব চয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই নোসোসে মিনোস জীবনের যে ধারা অনুকরণ করে চলেছে, তাই তাকে মৃত্যুর পরে নরকে বিচারকের যোগ্যতা দেবে। তাই রাণী প্যাসিফী এবং রাজকন্যা অ্যারিয়্যাডনী তাদের নিয়তি-নির্দিষ্ট পথে চলেছে। এবং তুমি, থিসিয়স, তোমাকে দায়িত্বহীন মনে হয় এবং তুমি হয়তো তাই থাকতে চাও, কিন্তু হারকিউলিস এবং জ্যাসন এবং পারসিউসের মত তুমিও নিয়তির দাস। কিন্তু জেনে রাখো (আমার চোখ বর্তমানের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যতকে জানার শিল্পকলা শিখেছে)—তোমার জীবনে তোমাকে মহৎ অনেক কিছু করতে হবে এবং তাও এমন একটা ক্ষেত্রে, যা তোমায় অতীতের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক তোমার ভবিষ্যতের পাশাপাশি দেখলে তোমার অতীতকে তখন ছেলেখেলা বলে মনে হবে। তুমি এথেনস নগরী প্রতিষ্ঠা করবে এবং সেখানে মানুষেব মন ও মননের এক চূড়ান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুতরাং গোলকধাঁধার গভীরে কিংম্বা ভয়ংকর ওই সংঘর্ষে জয়ী হবার পর তোমার প্রেমিকা অ্যারিয়্যাডনীর আলিঙ্গনে বাঁধা পড় না। কোথাও স্থির হয়ে থেকোনা। আলস্যের অন্য নাম বিশ্বাসঘাতকতা। তোমার নিয়তি যেদিন তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে, তার আগে পর্য্যন্ত বিশ্রাম নিওনা। কেননা এইভাবেই আপাতদৃষ্টিতে যা মৃত্যু বলে মনে হয়, তার ওপারে তুমি এক চিরন্তন জীবন পাবে, যে জীবন তোমাকে উপহার দেবে কৃতজ্ঞ মানবজাতি। কখনও স্থির

হয়ে, স্থানু হয়ে থেকোনা। সামনের দিকে চলতে থাকো। হে বীর, তোমার সঞ্চয় মন, মনন ও জীবনের অজস্র নগরী তুমি তোমার আপন পথ ধরে চলো।

এবং এখন আমি যা বলছি, যত্নের সঙ্গে শোনো ও মনে রাখার চেষ্টা করো। মিনোটরকে তুমি সহজেই যুদ্ধে হারাবে। সঠিকভাবে ভাবতে গেলে, লোকে যতোটা বলে, দানব ততোটা শক্তিশালী নয়। লোকে বলে, সে নিহত প্রাণীর মাংস খায়। কিন্তু ষাঁড় ঘাস ছাড়া কবে কি খেয়েছে? গোলকধাঁধায় ঢোকা খুব সহজ, বের হওয়া খুবই শক্ত। পথ না হারালে গোলকধাঁধায় ঢোকা যায়না। ওখানকার মেঝেয় পায়ের ছাপ পড়েনা। সুতরাং ফিরে আসার জন্যে তুমি অ্যারিয়্যাডনীর সঙ্গে সুতোয় বাঁধা থাকবে। আমি অনেকগুলো রীল সুতো তৈরী করেছি। ভেতরে যেতে যেতে তুমি সুতো ছাড়বে এবং একটা রীল ফুরিয়ে গেলে আর একটা রীল তার সঙ্গে বেঁধে নেবে যেন যোগাযোগের সূত্র কখনও বিচ্ছিন্ন না হয়। ফিরে আসার সময় তুমি সুতো গোটাতে থাকবে যতোক্ষণ না তুমি সুতোর প্রান্তে অ্যারিয়্যা-ডনীর কাছে এসে পৌঁছোয়। আমি জানিনা, এ ব্যাপারে আমি কেন তোমাকে এতো সাবধান করে দিচ্ছি। সুতোর শেষ ইঞ্চি পর্যন্ত গোলকধাঁধা থেকে বাইরে যাবার ইচ্ছেটা বাঁচিয়ে রাখা সবচেয়ে শক্ত। কারণ মাদক বাষ্প তোমার স্মৃতিশক্তিকে আচ্ছন্ন করবে এবং তোমার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা তোমার ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করবে। এসব আমি তোমাকে আগেই বলেছি। আমার নতুন কিছু বলার নেই। সুতোর রীলগুলো নাও। বিদায়।'

ডিডেলাসকে বিদায় জানিয়ে আমি অ্যারিয়্যাডনীর কাছে ফিরে এলাম।

।। নয় ।।

ওই সূতোর রীলগুলো নিয়েই অ্যারিয়্যাডনীর সঙ্গে আমার প্রথম বিরোধ বাঁধলো। সে চাইছিল, সূতোর রীলগুলো তার কাছে থাক, ওগুলো খোলা ও গুটানো মেয়েদের কাজ, একাজে তার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে এবং এইসব ঝামেলা থেকে সে আমাকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু আসলে সে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছিল। আমি কিছুতেই তাতে রাজী হতে পারিনি। তাছাড়া, আমার সন্দেহ ছিল, অ্যারিয়্যাডনী সূতো ছাড়তে অনিচ্ছা দেখাতে পারে। কারণ যতোই সে সূতো ছাড়বে, আমি ততোই তার কাছ থেকে দূরে যাবো। এবং সে সূতো না ছাড়তে পারে কিম্বা সূতো গুটিয়ে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি যত দূরে যেতে চাই, যেতে পারবোনা। আমি কিছুতেই রাজী হলাম না। মেয়েমানুষের শেষ অস্ত্র কান্নার বান ডাকানো। তাও প্রয়োগ করলো অ্যারিয়্যাডনী। কিন্তু আমি জানতাম, মেয়েমানুষের হাতে যদি কেউ একটা আঙুল ছেড়ে দেয়, সে গোটা হাতটা, তারপর পুরুষের সারা দেহটাই কব্জা করতে চাইবে। সূতোটা লিনেন বা পশমের ছিলনা। ডিডেলাস অজানা কোন ধাতু দিয়ে ওটা তৈরী করেছিল এবং আমি তরোয়াল দিয়েও ওটা কাটতে পারিনি। তরোয়ালটা আমি অ্যারিয়্যাডনীর কাছে রেখে গেলাম। কারণ মানুষের বাহুবলের চেয়ে মনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমার অতীতের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে অস্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে ডিডেলাস যা বলেছিল, তারপর শুধুমাত্র বাহুবলে দানব মিনোটরকে হারাতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমি অ্যারিয়্যাডনীকে বললাম, সে যেন গোলকধাঁধার গেট ছেড়ে কোন কারণেই ভেতরে না ঢোকে। অ্যারিয়্যাডনী নিজের হাতে আমার মনিবন্ধে সূতো বেঁধে বললো, এটা নাকি প্রেমের বাঁধন এবং তারপর সে দীর্ঘসময় ধরে আটার মত আমার ঠোঁটে ঠোঁট এঁটে রাখলো, যদিও আমি ভেতরে ঢোকার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম

যে তেরোজন যুবক যুবতী আমার সঙ্গী ছিল, তারা আগেই ভেতরে ঢুকেছিল। প্রথম বড় ঘরটা মাদক ধোঁয়ার ভরা। সেখানে ওদের সঙ্গে দেখা হল। এরই মধ্যে ওদের নেশা ধরেছে। ওদের মধ্যে আমার বন্ধু পিরিথৌসও ছিল।

আমার আগেই বলা উচিত ছিল, সুতোর রীলের সঙ্গে ডিডেলাস আমাকে মাদক ধোঁয়ার প্রতিষেধক ওষুধে ভেজানো একটা ন্যাকড়া দিয়েছিল ও ওটা আমায় নাকেমুখে জড়িয়ে রাখতে বারবার বলেছিল। ওটার জন্য নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলেও মাদক ধোঁয়ার প্রভাব কাটিয়ে আমি মাথাটা সাফ রাখতে পেরেছিলাম।

সুতো ছাড়তে ছাড়তে আমি তিনটে অন্ধকার ঘর পার হয়ে একটা দরজার সামনে পৌছুলাম। আমার হাত দরজার হ্যাণ্ডেলে লাগলো। দরজা খুলতেই রোদের ঝকমকে আলো। আমার সামনে বাটারকাপ, প্যানসি, টিউলিপ ও কারনেশন, ফুলের মধ্যে বাগানে ঘুমিয়ে আছে মিনোটর। তখুনি ওকে খতম করা উচিৎ হলেও আমি থেমে গেলাম। ওকে অদ্ভুৎ সুন্দর দেখাচ্ছিল। অর্ধাঙ্গে মানবদেহ ও অর্ধাঙ্গে অশ্বদেহধারী সেণ্টর-দের ক্ষেত্রে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি দানবের শরীরে মানুষ ও পশুর আশ্চর্য্য এক সম্মিলন। আমি খানিকক্ষণ চুপচাপ দেখলাম। তারপর ও একটা চোখ খুলতে বোঝা গেল, ও নির্বোধ এবং এবার কাজটা আমার শেষ করা উচিত ··

তারপর আমি কি করেছিলাম, ঠিক কি ঘটেছিল, আমার সঠিক মনে নেই। নাকেমুখে ন্যাকড়াটা মুখোসের মত বাঁধা থাকা সত্ত্বেও প্রথম ঘরে বেশ কিছুটা মাদক বাষ্প আমার স্নায়ুকে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। ফলে আমার স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক ছিল না। তা সত্ত্বেও যদি আমি মিনোটরকে হারিয়ে থাকি, সেই জয়ের স্মৃতি আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। অভিজ্ঞতাটা ইন্দ্রিয়সুখবর্ধক ছিল, এইটুকু বলতে পারি। বাগানে কয়েকটা মুহূর্ত স্বপ্নের মত মনে হলেও এবং জায়গাটা ছেড়ে যেতে অনিচ্ছা হলেও মিনোটরকে খতম করার পর সুতো গোটাতে

গোটাতে গোটাতে প্রথম ঘরে ফিরে যেয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখলাম, কে কিভাবে যেন ওদের অনেক খাত্ত পানীয় পরিবেশন করেছে। ওরা খাচ্ছে, মদ গিলছে, প্রেম করছে, উন্মাদের মত চেঁচাচ্ছে। আমি ওদের মুক্তি দিতে এসেছি বলায় ওরা চেঁচালো, 'কিসের থেকে মুক্তি?' এবং হঠাৎ সবাই মিলে আমায় গালাগাল দিতে স্বরু করলো। আমার বন্ধু পিরিথৌস যখন আমায় চিনতেই পারলো এবং সাফ বলে দিল যে পৃথিবীর সব সম্মানের বিনিময়েও ও বর্তমানের আনন্দ ছেড়ে যেতে তৈরী নয়, আমি খুবই দুঃখ পেলাম। যেহেতু ডিডেলাস আগেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, আমি ওকে দোষ দিতে পারিনি। আমি জানতাম, সাবধান না হলে আমারও ওদের মত অবস্থাই হত। ওদের ঘুঁসি মেরে, লাথি মেরে জোর করে ওদের আমার সঙ্গে নিয়ে এলাম।
মদের নেশায় বুঁদ হওয়ায় ওদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। গোলকধাঁধার বাইরে এসে আস্তে আস্তে এবং যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়কভাবে ওরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলো। পরে ওরা আমাকে বলেছিল, ওদের মনে হচ্ছে, ওরা যেন সুখের চূড়া থেকে এক অন্ধকার ও সরু গলির মধ্যে নেমে এসেছে। ওরা প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে আবার তৈরী করে নিল সেই কারাগার, যা মানুষকে নিজের জেলরে পরিণত করে এবং যার থেকে কোন মানুষের মুক্তি নেই। শুধু আমার বন্ধু পিরিথৌস তার মুহূর্তের পতনের জন্যে সত্যিই লজ্জিত হয়েছিল এবং সাহস ও বন্ধুত্বের আতিশয্য দেখিয়ে সে আমার ও নিজের চোখে তার মূল্য ফিরে পেতে চাইলো। অনতিকাল পরেই সে বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাবার সুযোগ পেলো।

।। দশ ।।

বন্ধুর কাছ থেকে আমি কিছুই লুকোইনি। অ্যারিয়্যাডনীর জন্যে আমার কামনা এবং সেই কামনা যে ক্রমশঃ ফুরিয়ে যাচ্ছে, আমি বলেছিলাম। অ্যারিয়্যাডনীর বোন ফেড্রা বয়সে ছোট হলেও তাকেও

যে আমার বেশী ভালো লেগেছে, তাও বলেছি। দুটো পাম গাছে দোলনা ঝুলিয়ে যখন দোলনায় দুলতো ফেড্রা। তার খাটোঝুল স্কার্ট হাওয়ায় ওপরে উঠে যেতো। আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসতো। কিন্তু এই দৃশ্যে অ্যারিয়্যাডনী দেখা দিলেই আমি বড় বোনের ঈর্ষা জাগাবার ভয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হতাম। তাহলেও এ ধরণের ব্যর্থ যৌন অভিলাস স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু ফেড্রাকে চুরি করে নিয়ে যেতে হলে কোন একটা প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে। এ ব্যাপারে পিরিথৌসের উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত প্ল্যান আমার বিশেষ কাজে এলো। অ্যারিয়্যাডনী এবং আমি দুজনেই এই দ্বীপ ছেড়ে যেতে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু অ্যারিয়্যাডনী যা জানতো না, তা হল, ফেড্রাকে সংগে না নিয়ে আমি যাবো না। পিরিথৌস তা জানতো এবং সে আমাকে সাহায্য করেছিল।

আমার চেয়ে তার স্বাধীনতা বেশী ছিল। অ্যারিয়্যাডনী আমার পায়ে শৃঙ্খলের মতো এঁটে থাকতো। পিরিথৌস প্রচলিত সামজিক রীতিনীতি অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিল।

একদিন সকালে পিরিথৌস আমাকে বললো—

মিনোস এবং র‍্যাডাম্যানথাস, এই দুই আদর্শ আইনপ্রণেতা ক্রীটের অধিবাসীদের নৈতিক জীবনের সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের সময় পায়ু-মৈথুনের ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ক্রীটবাসীরা পায়ু-মৈথুনে অভ্যস্ত এবং তাদের সংস্কৃতিতে সমকামিতার প্রভাব আছে। সুতরাং বয়ঃসন্ধিকালে কোন পুরুষ যদি কোন বয়স্ক পুরুষের সমকামি-তার সঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত না হয়, তার মান থাকেনা। মিনোসের ছেলে গ্লাকাস, যে দেখতে ঠিক ফেড্রার মতোই, এ ব্যাপারে তার দুশ্চিন্তার কথা আমাচক জানিয়েছে। আমি তাকে বোঝাতে চেয়ে-ছিলাম যে রাজপুত্র বলেই কেউ তার সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক গড়ে তুলছেনা। সে বললো, এটা সত্যি হলেও দুঃখের কথা কারণ ছেলের কোন পুরুষ বন্ধু নেই বলে রাজা মিনোসেরও খুব দুঃখ। যদিও এসব

ব্যাপারে বংশমর্য্যাদাকে মিনোস খুব গুরুত্ব দেয় না, তোমার মতো এক বিখ্যাত রাজপুত্র যদি মিনোসের ছেলের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়, মিনোস খুবই খুশী হবে। অ্যারিয়্যাডনী বোনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হলেও ভাইয়ের সঙ্গে তোমার সমকামিতার ব্যাপারে ঈর্ষ্যা দেখালো কারণ কোন পুরুষ কোন অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক গড়ে তুললে মেয়েমানুষ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়না।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম—

'যদিও আমি গ্রীক, সমকামিতার ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।' এ ব্যাপারে হারকিউলিসের সঙ্গে আমার তফাৎ আছে। হাইলাসের সঙ্গে তার সমকামিতার কথা আমি জানি। তাতে আমার লোভ নেই। গ্লাকাস তার বোন ফেড্রার মত দেখতে হলেও আমি ফেড্রাকেই চাই, গ্লাকাসকে নয়।'

আমার বন্ধু বোঝালো—

'অ্যারিয়্যাডনীকে ঠকাবার জন্যে এমন ভাব করতে হবে যেন তুমি গ্লাকাসকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো, ফেড্রাকে নয়। মিনোস এই দ্বীপে একটা প্রথা চালু করেছে। অল্পবয়স্ক ছেলের ওপরে বয়স্ক পুরুষের লোভ থাকলে বয়স্ক প্রেমিক প্রথমে তার সমকামিতার সাথীকে নিজের বাড়ীতে দুমাস রাখবে এবং দুমাস পরে অল্পবয়স্ক সঙ্গী জানাবে, বয়স্ক প্রেমিক তার পছন্দ কিনা বা তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে কিনা। সুতরাং গ্লাকাসকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে হলে জাহাজেই নিয়ে যেতে হবে। মিনোস যদি জানে যে তুমি তার ছেলে গ্লাকাসকে নিয়ে যাচ্ছো, মেয়ে ফেড্রাকে নয়, সে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু ফেড্রা রাজী আছে তো?'

'অ্যারিয়্যাডনী কখনো আমাকে তার বোনের সঙ্গে একা থাকার সুযোগ দেয়না। তবে ফেড্রা যখন বুঝবে যে আমি ওকে ওর দিদির চেয়ে বেশী প[illegible] করি, ও নিশ্চয়ই রাজী হবে।

...প্রথমে যদিও অ্যারিয়্যাডনীকে বোঝাবার পালা। সে সহজেই

রাজী হয়ে গেল। ওর ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে, বেচারা বুঝতেই পারেনি। গ্লকাসকে আমি সত্যি সত্যিই সমকামিতার সঙ্গী হিসেবে সঙ্গে নিচ্ছিনা বলায় সে আশাহত হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনায় রাজী হলো। ফেড্রাকেও সব খুলে বললো পিরিথৌস। কারণ ফেড্রাকে জোর করে জাহাজে তুলতে গেলে মেয়েটা চেঁচামেচি করতে পারে। কিন্তু ছোটরা বড়দের ঠকাতে আনন্দ পায় এবং সেই সেন্টিমেন্টটাই এক্ষেত্রে কাজে লাগালো আমার বন্ধু। এক্ষেত্রে গ্লকাস ঠকাচ্ছে তার বাবা-মাকে, ফেড্রা ঠকাচ্ছে তার বড় দিদিকে। মাথার চুল আঁটসাঁট করে বেঁধে মুখের দিকটা ঢেকে গ্লকাসের পোষাকে সাজলো ফেড্রা। তাকে গ্লকাস-এর মতোই দেখাচ্ছিল। এমন কি তার বড দিদি অ্যারিয়্যাডনীও লহমার জন্যে দেখলে তাকে গ্লকাস বলে ভুল করতো। মিনে'স আমাকে বিশ্বাস করে, আমার প্রভাব তার ছেলের পক্ষে ভালো হবে এই ধারনায় সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে এবং আমি তার অতিথি। তাকে ঠকাতে আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু বিবেকের দংশন আমাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। কৃতজ্ঞতা এবং ভদ্রতার মৃদু কণ্ঠ কামনারা সোচ্চার চীৎকারে চাপা পড়েছে। লক্ষ্য স্থির রেখে যে কোন পথে সেই লক্ষ্যে পৌছুনোই যুক্তিসঙ্গত। যা অবশ্যম্ভাবী, তা অবশ্যই ঘটবে।

প্রথমে জাহাজে উঠলো অ্যারিয়্যাডনী। রাতের ডিনারের পর ফেড্রা নিজের ঘরে শুতে যায় এবং সকালের আগে তার খোঁজ পড়ার সম্ভাবনা নেই। রাতের ডিনারের পর জাহাজে আনা হল ফেড্রাকে। সমুদ্রযাত্রা শুরু হল। কদিন পরেই ফেড্রার দিদি, সুন্দরী কিন্তু একঘেঁয়ে ধরনের মেয়ে অ্যারিয়্যাডনীকে আমি ন্যাক্সোসে নামিয়ে দিলাম।

আমার বাবা ঈজিয়স যখন দেখলো, জাহাজে কালো রঙের পাল টাঙানো (পাল বদলাতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম), সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো। ঘটনাটার কথা আমি আগেই

বলেছি। তবে একটা কথা। সমুদ্রযাত্রার শেষ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি অ্যাটিকার রাজা হয়েছি। আমাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ও আমার সিংহাসনে আরোহণের আনন্দদায়ক ঘটনার সঙ্গে আমার বাবার মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনা মিলে যাওয়ায় আমি আদেশ দিলাম আনন্দের গান ও দুঃখের গান ঐদিনের উৎসবে পরপর শোনানো হবে। আমি ও আমার সঙ্গীরাও নাচ গানে অংশ নিলাম। আনন্দ ও শোক : জনগন একই সংগে দুই চরম প্রান্তের দুটি অনুভূতির স্বাদ পাবে, এটাই আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল।

॥ এগারো ॥

অ্যারিয়্যাডনীর সঙ্গে আমার দুর্ব্যবহারের জন্যে অনেকেই আমাকে দোষ দিয়েছে। ওরা বলে, আমি নাকি কাপুরুষের মত ব্যবহার করেছি। ওকে একা একটা দ্বীপে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। হয়তো তাই। আমি চেয়েছিলাম, এখন থেকে ওর ও আমার মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান থাকুক। কারণ ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শিকারী ও শিকারের সম্বন্ধ। যখন ও জানতে পারলো, ওকে ঠকিয়ে ওর ভাইয়ের পোষাকে ওর ছোট বোনকে আমি সঙ্গে নিয়েছি, ও চেঁচামেচি সুরু করে দিলো এবং আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা তুলে আমায় বকাবকি সুরু করলো। শেষে চটে বললাম অ্যারিয়্যাডনীকে রেখে যাবো। ও আমাকে ভয় দেখালো, এই রকম জঘন্যভাবে তাকে ফেলে যাওয়ার বিষয়ে সে দীর্ঘ একটা কবিতা লিখবে। জবাবে আমি বললাম, সেই ভালো। যে রকম উত্তেজিত ও কাব্যিক ভাষায় অ্যারিয়্যাডনী কথা বলছিল, মনে হচ্ছিল, কবিতাটা ভালোই হবে। তাছাড়া কবিতা লেখার ব্যাপারটা ওকে সময় কাটাতে সাহায্য করবে এবং ইতিমধ্যে ও নিশ্চয়ই দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। কিন্তু আমার এই সব কথা শুনে ও আরও চটে গেল। মেয়েমানুষকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলে এই রকমই হয়। যে দ্বীপে ওকে রেখে

গেলাম, সেটার নাম ন্যাক্‌সোস। একটা গল্প আছে, আমি তাকে এই দ্বীপে ছেড়ে যাবার পর দেবতা ডায়োনিসাস, (যিনি সুরার দেবতা), তিনি নাকি এই দ্বীপে এসে অ্যারিয়্যাডনীকে বিয়ে করেন। হয়তো অন্যভাবে বলতে গেলে, মদের নেশায় সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল অ্যারিয়্যাডনী। লোকে বলে, বিয়ের দিনে দেবতা তাকে হিফিস্টাস এর তৈরী যে মুকুট উপহার দিয়েছিলেন, তা এখন আকাশের এক নক্ষত্রপুঞ্জ। দেবরাজ জিউস নাকি অলিম্পাস পাহাড়ে ওকে স্বাগতম্ জানিয়েছিলেন এবং ওকে অমরত্ব দিয়েছিলেন। অ্যারিয়্যাডনীকে নাকি দেবলোকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী আফ্রোদিতি বলে ভুল হত। লোকে এসব বললে আমি আপত্তি করিনি। ওকে দেবী করে যে ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি চালু হয়, সেটা আমারই চেষ্টায় এবং আমি নিজে সেই দেবীর মন্দিরে যেয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য নাচতাম। একটা কথা শুধু আমি বলতে চাই। আমি যদি অ্যারিয়্যাডনীকে না ছেড়ে যেতাম, ওর এতো নামডাক কি করে হতে পারত?

আমার সম্বন্ধেও বেশ কিছু রূপকথা চালু আছে। রূপসী হেলেনকে চুরি করা, বন্ধু পিরিথৌসকে সঙ্গে নিয়ে নরকে অবতরণ বা পাতালের রাণী প্রসারপাইনকে ধর্ষণ-সংক্রান্ত কাহিনী। এই সব গুজবে আমি প্রতিবাদ করিনি। কারণ এতে আমার সম্মান বাড়তো। অনেক সময় আমি নিজে গল্পগুলোতে রঙ চড়িয়েছি. কারণ অ্যাটিকার লোক এসব সহজেই-অবিশ্বাস করে। কুসংস্কার থেকে জনমনের মুক্তি খুব ভালো জিনিষ। কিন্তু জনগণের অশ্রদ্ধা অন্য রকম ব্যাপার।

সত্যি কথা বলতে কি, এথেনসে ফিরে যাওয়ায় পর থেকে আমি আমার ভালবাসার কাছে বিশ্বস্ত ছিলাম। আমি ভালবেসেছিলাম এক রমনীকে। সেই রমনী ফেড্রা। আমি ভালবেসেছিলাম এক নগরীকে। সেই নগরী এথেনস।

কাজটা সহজ ছিলনা। অ্যাটিকায় বিভিন্ন ছোট ছোট শহরের মধ্যে অনবরত সংঘাত ও সংঘর্ষ চলতো। ওদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয়

শাসনের অধীনে আনার জন্যে আমাকে শক্তি ও বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। আমার বাবা ঈজিয়সের ধারণা ছিল, এই ধরণের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ চলতে থাকলে তাঁর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমি দেখলাম, এই ধরণের সংঘর্ষ সাধারণ নাগরিকের স্বার্থের পরিপন্থী বেশীর ভাগ সংঘর্ষের মূলে ছিল অর্থনৈতিক অসাম্য এবং প্রত্যেকের ধনী হওয়ার চেষ্টা। আমার কাছে অর্থ বা সম্পদের কোন গুরুত্ব নেই এবং আমি অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ধনসম্পদের সমবণ্টনের মাধ্যমে আমি একদিকে অর্থনৈতিক অসাম্যের এবং অন্য দিকে এই অসাম্য থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়েছিলাম। ধনীরা এতে আমার ওপর ক্ষুব্ধ হলে আমি তাদের কয়েকজনকে ডেকে বললাম—'শুধু উদ্ভাবনী শক্তি, বাস্তব জ্ঞান বা অধ্যবসায়ের জোরে তোমরা বড়লোক হওনি, অনেকক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব হয়েছে অবিচার ও অত্যাচারের মাধ্যমে। ব্যক্তির গুণগত উৎকর্ষ ছাড়া অন্য কোন মূল্যবোধে যেহেতু আমি বিশ্বাসী নই, সেহেতু ধনসম্পদের লোভ কোন সীমা মানেনা এবং এই অভিশপ্ত লোভ মানুষকে সুখও দেয়না, যেহেতু অর্থকে কেন্দ্র করে তোমাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ দেশকে দুর্বল করে তুলছে, আমি প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করে তোমাদের সম্পদ কেড়ে নেবো এবং দেশের মানুষের মধ্যে অর্থসম্পদের সমবণ্টনের ব্যবস্থা করবো। আমি রাজা হলেও আমার জীবনযাত্রার মান দেশের দরিদ্রতম প্রজার মত। নিজের জন্যে আমি শুধু চাই সেনাবাহিনী পরিচালনা ও আইনের শাসন বজায় রাখার অধিকার। আমি চাই যে আমার প্রতিবেশীরা, অ্যাটিকা কোনো স্বৈরাচারীর শাসনে নেই, সেখানে শাসন চালাচ্ছে জনগণের সরকার। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ, জন্মমতে সে যাই হোক, শাসন সংক্রান্ত কাউন্সিলে বসার সমান অধিকার পাবে। যদি তোমরা স্বেচ্ছায় এতে রাজী না হও, আমি তোমাদের বাধ্য করবো। ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের রাজধানীতে এথেনস এলেই জানবে এবং দেবতাদের কাছে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,

এথেনস সর্বকালের মানুষের কাছে এক চিরন্তন বিস্ময় হয়ে থাকবে।
...আমার বন্ধু পিরিথৌস আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল—'সাম্য মানবজাতির পক্ষে স্বাভাবিক নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। শ্রেষ্ঠ মানুষ যদি নিকৃষ্টের ওপরে না ওঠে, যদি ঈর্ষা, অনুকরণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে, জনতা এক নিরাকার, পচনশীল, গতিশীল, জড় বস্তুপিণ্ডের রূপ নেবে। যদি তুমি সবাইকে সমান সুযোগ দাও, গুণগত পার্থক্যের ফলে কিছু মানুষ অন্য মানুষের ওপরে উঠবেই। ফলে আবার দেখা দেবে পদদলিত জনগণের পাশাপাশি নবজাত এক অভিজাত সমাজ।'
আমি প্রতিবাদ করে বলেছি—
'যেহেতু নতুন সমাজে আভিজাত্যের ভিত্তি হবে গুণগত উৎকর্ষ, অর্থ নয়, সুতরাং জনগন নতুন অভিজাত গোষ্ঠির দ্বারা পদদলিত হবেনা।'
আমি চারিদিকে প্রচার করে দিলাম, যে কেউ এথেনসে আসতে চাইবে, কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে তাদের সবাইকে এখানে স্বাগত জানানো হবে। পরবর্তীকালে আমি এথেন্সবাসীদের মধ্যে গুণগত উৎকর্ষের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ মেনে নিয়েছি। মানুষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং মাঝারি ধরণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য তার একমাত্র লক্ষ্য হবে, একথা আমি কখনও মানিনি। আমি জানি যে মানুষ স্বাধীন নয়, কখনও স্বাধীন হবেনা এবং স্বাধীন হওয়া হয়তো তার পক্ষে ভালোও নয়। কিন্তু মানুষের সম্মতি ছাড়া তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়না এবং যতোক্ষণ না তার মনে হবে যে সে স্বাধীন, সে সম্মতি দেবেনা। মানুষ তার নিয়তিকে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, এ আমি চাইনি। ডিডেলাস চেয়েছিল, মানুষ দেবতাদের সম্পদে শক্তিশালী হয়ে উঠুক। আমিও প্রগতিতে বিশ্বাস করি।
পিরিথৌস আমাকে ফেড্রার দিকে আরও বেশী নজর দিতে বলতো। সে ঠিকই বলতো। কিভাবে আমার পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়েছিল এবং দেবতারা কিভাবে আমার সাফল্য ও অহঙ্কারের এক ভীষণ মূল্য আদায় করেছিলেন, তাই আমায় এবার বলতে হবে।

॥ বারো ॥

আমার স্ত্রী ফেড্রাকে আমি বিশ্বাস করতাম। সে দিনদিন সুন্দরী হয়ে উঠছিল। তাকে তার পরিবারের জঘন্য পরিবেশ থেকে অল্প বয়সে দূরে এনেছি বলে আমি বুঝতে পারিনি, উত্তরাধিকারসূত্রে সে তার রক্তে বয়ে নিয়ে এসেছে ব্যভিচারের বীজ।

আমার প্রথম পক্ষের ছেলে হিপ্পোলিটাস রাজসভা, পার্টি বা মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করতোনা। সে ছিল অহঙ্কারী, সুন্দর, বাঁধাছেঁড়া। শিকারী কুকুরের পাল নিয়ে সে পাহাড়চূড়োয় উঠতো বন্যজন্তুর খোঁজে। সমুদ্রের ধারে সে বুনো ঘোড়াদের পোষ মানাতো।

ফেড্রা তার সৎ ছেলে হিপ্পোলিটাসকে ভালোবাসবে, এটা আমার আগে থেকেই অনুমান করা উচিত ছিল। ফেড্রার সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ কম ছিল না। কিন্তু হিপ্পোলিটাস তার বাসনার বাঁধনে ধরা পড়ছে না দেখে সে আমাকে বোঝালো যে হিপ্পোলিটাস নিজেই ব্যভিচারে আগ্রহী। আমি আমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করে-ছিলাম। আমি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আমার নির্দোষ ছেলের ওপর প্রতিশোধ নাও। মানুষ জানেনা, দেবতা যখন তার প্রার্থনা শোনেন, তার দুর্ভাগ্যই ওঁরা ডেকে আনেন' আমি আমার সন্তানকে হারিয়েছি। ফেড্রা নিজের দোষ বুঝতে পেরে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু আজ আমি একা। আমার বয়স হয়েছে। থিবেস থেকে বিতাড়িত অন্ধ রাজা ওয়েদিপাউসকে কলোনাস্-এ আমি স্বাগত জানিয়েছি। দেবতারা আশীর্বাদ করেছিলেন, যে দেশে রাজা ওয়েদিপাউস সমাধিস্থ হবে, সেই দেশ দেবতার আশীর্বাদপুত হবে। ওয়েদিপাউস আমাকে বলেছিল—

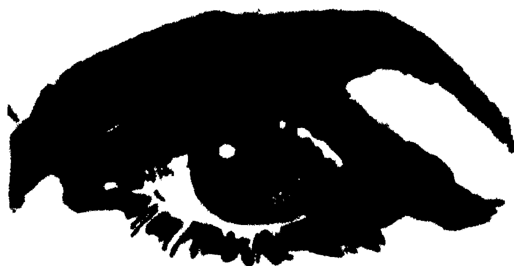
'পিতৃহত্যা ও মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারের পাপের যে সাক্ষ্য চোখের সামনে ছিল, আমার চোখ তা দেখতে পায়নি বলে নিজের চোখদুটোকে আমি শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি যখন চীৎকার করে বলেছিলাম, 'হে আঁধার, আমার আলো!',

আমি বলতে চেয়েছিলাম যে এখন থেকে আঁধারই আমার আলো। সেই মুহূর্তে আকাশের নীলে আঁধার নেমে এসে আমার মনের আকাশে জ্বলে উঠেছিল তারাদের দেয়ালি। যে পৃথিবী দৃষ্টির অতীত, সেই পৃথিবীটাই সত্য। যে পৃথিবী দৃষ্টির গোচর, সে শুধু মায়া। তাই অন্ধ ঋষি টিরেসিয়াস্ আমায় বলেছিল, যে মানুষ পৃথিবীকে দেখতে পায়না, সেই ঈশ্বরকে দেখতে পায়। আমি রাজা হয়েছিলাম একটি অপরাধের মাধ্যমে এবং তার পর যা কিছু হয়েছে, সব কিছুতে সেই অপরাধের ছাপ, আমার দুই ছেলে এখন রাজা হয়েছে। যেহেতু আমার মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারের ফলে তাদের জন্ম, তারা অভিশপ্ত এবং তাদের জঘন্য ক্রিয়াকলাপেই তাদের জন্মের পরিচয়। আমার মনে হয়, সমস্ত মানবজাতি এক আদিম পাপের জঘন্য চিহ্ন বহন করছে, যার থেকে অশুভ সব কিছুর জন্ম হয়। ঐশ্বরিক কৃপা ছাড়া মানুষ এই আদিম পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। হয়তো নিজের হাতে নিজের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে আমি আমার যন্ত্রণাকে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে চেয়েছি। হয়তো আমি অনুভব করেছিলাম, দুঃখের মহত্ব এবং বন্দীদশা থেকে মানুষকে উদ্ধার করায় দুঃখের ক্ষমতা, থেসিউস এবং ইডিপাসের সঙ্গে যখন আমি নিজের নিয়তির তুলনা করি, আমার মনে হয়, আমি আমার নিয়তিনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছি। মানুষ, যে যাই হোক, তার গায়ে যে কোন পাপের ছাপ থাক, শেষ পর্য্যন্ত তাকে ঈশ্বরের কাজ করে যেতে হবে। আমি চলে যাব। কিন্তু এথেন্স নগরী থাকবে। যে নগরী আমার কাছে আমার স্ত্রী ও সন্তানের চেয়েও প্রিয়। আমি চলে যাব। কিন্তু আমার ভাবনাগুলো বেঁচে থাকবে। আমি একা। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমি পৃথিবীর ভালো জিনিষগুলো উপভোগ করেছি। একথা ভেবে আমি সুখী যে আমার পরে যারা আসবে, আমারই জন্যে তারা আরও ভালো এবং আরও স্বাধীন হবে, তারা নিজেদের চিনতে পারবে। আগামী দিনে যেসব মানুষ পৃথিবীতে আসবে, আমি তাদেরই কল্যাণের জন্যে কাজ করেছি। আমি বাঁচার মত বেঁচেছি।

• • •

জাঁ পল সার্ত্রে

১৯৬৪-তে নোবেল পুরস্কার পেয়ে পুরস্কারের অর্থমূল্য প্রত্যাখ্যান করে সার্ত্রে বলেছিলেন, আমার কাছে নোবেল পুরস্কার ও এক থলি আলুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক, সফল নাট্যকার, কৃতী শিল্পসমালোচক, আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রতিভাবান রূপকার সার্ত্রে ফ্যাসীবাদী নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট সহযোদ্ধাদের সঙ্গে যেমন হাত মিলিয়েছেন, তেমনি স্তালিনযুগের বুদ্ধিজীবি-পীড়নের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। তিনি বলেছেন, 'মানুষ পৃথিবীতে একা, পৃথিবীর বিরুদ্ধে একা। ধর্ম এবং ঈশ্বরবিশ্বাস মানবিক অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়ে অর্থহীন অনুতাপ ও দায়িত্বহীন পাপ-পুণ্যের জালে বাঁধে। যখন পৃথিবীতে শিশুরা ক্ষুধার্ত, তখন অস্তিত্ববাদ মানুষের মৌল সমস্যা নয়। সারা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হলে তবে মানুষকে অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের অন্তর্লীন মানবিক দায়িত্বের এবং যন্ত্রণার মৌল সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।' তাঁর বর্তমান রচনা এই শতকের খ্যাতিমান ভাস্কর আলবার্তো জিয়াকোমেত্তি প্রসঙ্গে।



শূন্যতার সন্ধানে

জাঁ পল সার্ত্র

জিয়াকোমেত্তির কঠিন মুখচ্ছবির দিকে তাকালেই চোখে পড়ে তাঁর অহমিকা—সময়কে জয় করার এক উদ্ধত প্রেরণা। সংস্কৃতিকে তিনি বিদ্রূপ করেন। প্রগতিতে তাঁর আস্থা নেই। অন্ততঃ শিল্পের জগতে প্রগতিশীলতার কোনো মূল্য আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। দক্ষিণ ফ্রান্স ও উত্তর স্পেনের প্রস্তরযুগের শিল্পীদের তিনি সহমর্মী। 'এইজী' এবং 'আলতামিরা'-র চূণাপাথরের গুহায় এঁরা এঁদের উন্নত শিল্পচেতনার পরিচয় রেখে গেছেন। কিন্তু সেই পূর্ব-সূরীদের তুলনায় তিনি নিজেকে বেশী প্রগতিশীল বলে কোনো দাবী করেন নি।

সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে, যখন মানুষ এবং প্রকৃতি দু'জনেই ছিল তরুণ, সুন্দর আর অসুন্দরের কোন প্রভেদ ছিলনা—রুচির প্রশ্ন ছিলনা, সুকুমার শিল্পের অনুরাগী বা সমালোচকদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। যে মানুষ প্রথম পাথর কেটে মানুষের প্রতিমূর্তি তৈরী করার কথা ভেবেছিল, শূন্যতার মধ্য থেকেই শুরু হয়েছিল তার শিল্পসৃষ্টি।

তাঁর মডেল: মানুষ: স্বৈরাচারী ডিক্টেটর নয়, সেনানায়ক বা

ব্যায়ামবীর নয়—আদিম মানুষ। পরবর্তীকালের মডেলদের যে আকর্ষণী ক্ষমতা বা পদমর্য্যাদা ভাস্করদের বিপথে নিয়ে গেছে, আদিম মানুষের সেসব কিছুই ছিলো না। সে যেন শুধু এক দীর্ঘ, অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি—দিগন্তের নিঃসীম পটভূমিকায় হেঁটে চলেছে। কিন্তু তার চলার ভঙ্গিমা বস্তু জগতের গতি প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। তার প্রথম চলার ছন্দ হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিলো এক অনাগত অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। তার গতিবিধি বুঝতে গেলে তার উদ্দেশ্য বুঝতে হবে—সে গাছের ফল পাড়তে চাইছে না। কাঁটাঝোপ সরিয়ে পথ করে নিতে চায়? কিন্তু ঠিক কখন তার গতির সূচনা হয়েছিলো, তা' থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে কিছু অনুভব করা কখনোই সম্ভব নয়। আমি একটা গাছের নুয়ে-পড়া ডালকে গাছটা থেকে আলাদা করে দেখতে পারি, কিন্তু একজন মানুষের উত্থিত বাহু কিম্বা বজ্রমুষ্টিকে সেই মানুষ থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। 'মানুষ' তার হাত তোলে, 'মানুষ' তার বজ্রমুষ্টি দেখায়—'মানুষ' অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ড, একক—'মানুষ' তার গতির একমাত্র উৎস। তাছাড়া, অজস্র সংকেতের যাদু তার জানা আছে—তার মাথার চুলে, আর চোখের দৃষ্টিতে, তার ঠোঁটে, তার আঙুলের ডগায় বিচিত্র ইঙ্গিত। সে যেন সমস্ত শরীর দিয়ে কথা বলে। যখন সে কথা বলে, তার প্রতিটি শব্দই অর্থবহ। এমনকি যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে, তার ঘুমও যেন তার কথা। কি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হবে? কি দিয়ে তৈরী হবে তার প্রতিরূপ? পাথর—মহাশূন্যের একটা জড়পিণ্ড! শূন্যতার মধ্য থেকে জিয়াকোমেত্তিকে মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, গতিহীন স্থাবর জড়তায় আনতে হবে গতির ছন্দ, যা নিছক আপেক্ষিক তাকেই দিতে হবে অবিমিশ্র স্বাতন্ত্র্য, যা একান্তই বর্তমান তারই মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে অনাগত ভবিষ্যত—বস্তু জগতের নিষ্প্রাণ নৈঃশব্দে জাগাতে হবে ইঙ্গিত ও সংকেতের প্রাণচাঞ্চল্য। পাথর এবং মানুষের মধ্যে দূরত্ব অনেক—কিন্তু জিয়াকোমেত্তি এই দূরত্ব মাপতে পেরেছিলেন বলেই

তাঁর চিন্তার জগতে এর অস্তিত্ব। তিনি কি মানুষ—যে মানুষ মহাশূন্যেও ছাপ রাখতে চাইছে? তিনি কি পাথর—যে পাথর মানুষ হবার স্বপ্ন দেখে? হয়তো তিনি দু'য়েরই সংমিশ্রণ।

ভাস্করের স্বপ্ন নিজেকে পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরিত করা—যেন সেই পূর্ণতার মধ্য থেকে জেগে ওঠে একটা মানুষের প্রতিমূর্তি। পাথরের চিন্তা তাঁকে আবিষ্ট ক'রে। শূন্যতা একসময় তাঁর কাছে ছিলো বিভীষিকা। মাসের পর মাস ধরে তাঁর মনে হ'ত, তিনি হাঁটছেন—তাঁর চারপাশে গভীর অতলস্পর্শ অন্ধকার—সেই বিষণ্ণ অনুর্বর আশাহীন অন্ধকার, যা কোন কিছুর জন্ম দিতে পারে না। আর একসময় তাঁর মনে হ'ত, চারপাশের চেতনাহীন বস্তু জগতের সঙ্গে মাটির সংযোগ নেই—ওরা হাওয়ায় ভাসছে। শিল্পীর পৃথিবী দোলায়মান, দ্বিধাগ্রস্ত, অস্থির, চঞ্চল। বুকের ভেতরে তিনি অনুভব করেন যে অচেতন জড়পদার্থের জগতে উচ্চতা, গভীরতা বা দৈর্ঘ্য ব'লে কিছু নেই—পরস্পরের সত্যিকার সংস্পর্শেও তারা আসতে পারে না। এই অনুভূতি শিল্পীর পক্ষে মৃত্যুরই সমান।

আমি এমন কাউকে চিনিনা, যিনি তাঁর মতো সংবেদনশীল মন নিয়ে বিভিন্ন মানুষের মুখভঙ্গিমার বৈচিত্র, অঙ্গভঙ্গীর যাদু সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছেন। তিনি তাদের তীব্র হিংসার চোখে দেখেন—যেন তারা অন্য জগতের অধিবাসী। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে তিনি কখনো কখনো তাদের মাতৃময় দিকে চেয়েছেন—তাঁর কল্পনায় এক বিরাট অন্ধ জনস্রোত তাঁর দিকে ছুটে আসছে—বনবীথিকার পথ বেয়ে যেন হিমপ্রবাহের শিলারাশি নেমে আসছে। এমনি বিচিত্র ধারণা বিভিন্ন সময়ে তাঁকে আবিষ্ট করেছে—এইসব ধারণাকে কেন্দ্র ক'রে তিনি কাজ করেছেন—অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শূন্যতাকে চিনেছেন।

'লোকটা পাগল', সাধারণ মানুষ ভাবে, 'তিন হাজার বছর ধ'রে কতো ভাস্কর পাথর কেটে কতো সুন্দর মূর্তি তৈরী করেছে—তারা তো জিয়াকোমেত্তি'র মতো অসংলগ্ন বাজে কথায় সময় নষ্ট করেনি?

প্রচলিত কলাকৌশল প্রয়োগ ক'রে কি নিখুঁত ভাস্কর্য সৃষ্টি করা যায় না? পূর্বপুরুষদের অস্বীকার করার এই প্রবণতা কেন?'

সত্যি কথা বলতে কি, তিন হাজার বছর ধ'রে অগণিত ভাস্কর শুধু মৃতদেহেরই প্রতিমূর্তি গড়েছেন। কখনো তারা কবরের পাথরে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে, কখনো হয়তো তারা বিচারপতির আসনে বা ঘোড়ার ওপরে বসে আছে। কিন্তু একটা মরা ঘোড়ার পিঠে একটা মরা মানুষের মূর্তি কি আধখানা জীবন্ত মানুষেরও সমান হ'তে পারে? এইসব মূর্তি মিউজিয়মের দর্শকদের নিষ্প্রাণ চোখগুলোকে ঠকাতে পারে। ওরা ভাবে, মূর্তির হাত দু'টো যেন নড়ছে—আসলে কিন্তু হাত দু'টো নিশ্চল, লোহার নিগড়ে বাঁধা। এতোই অনমনীয় এইসব ভাস্কর্যের পরিবেশ, যে বৈচিত্র্যের অনন্ত বিস্তার সেখানে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। স্থূল সাদৃশ্য দেখে দর্শকেরা বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে—তাদের কল্পনাশক্তি জড় বস্তুপিণ্ডে গতি, উত্তাপ এবং আলোকের সঞ্চার করতে চায়।

সুতরাং আবার শূন্য থেকে নতুন ক'রে শুরু করতে হবে। তিন হাজার বছর পরে জিয়াকোমেত্তি এবং সমকালীন শিল্পীদের দায়িত্ব শিল্প-প্রদর্শনীর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে নতুন শিল্পসৃষ্টির বন্যা আনা নয়—তাদের প্রমাণ করতে হবে যে পাথর খোদাই করে ভাস্কর্য সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব কিনা। 'গতি কি সম্ভব?', পারমেনিডেস এবং জেনো প্রশ্ন করেছিলেন। ডায়োজিনিস পায়ে হেঁটে প্রমাণ করেছিলেন যে গতি সত্যিই সম্ভব। ঠিক তেমনি ভাবে প্রমাণ করতে হবে যে ভাস্কর্য সৃষ্টি করা সত্যিই সম্ভব।

কি করা সম্ভব, তা জানতে হলে শিল্পীকে শেষ সীমায় পৌঁছে দেখতে হবে। অনুকূল পরিস্থিতি সত্বেও যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবু কি করে বোঝা যাবে যে এই অসাফল্য ভাস্কর্যের ব্যর্থতা না ভাস্করের বিফলতা। অন্য শিল্পীরা এগিয়ে আসবে—তারাও আবার নতুন করে চেষ্টা করবে। জিয়াকোমেত্তি নিজেও বারবার নতুন সৃষ্টির পথে

নেমেছেন। তাঁর লক্ষ্য তো শুধু বৈচিত্র্য নয়, তাঁকে একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছতে হবে। তাঁর সামনে একটা অসাধারণ সমস্যা: পাথর থেকে মানুষ তৈরী করতে হবে, কিন্তু মানুষকে প্রস্তরীভূত করা চলবেনা। সব কিছু পাবো, নয়তো সব কিছুই হারাবো। যদি এই সমস্যার সমাধান হয়, স্ট্যাচুর সংখ্যার কোন গুরুত্ব নেই। জিয়াকোমেত্তি তাই বলেছেন, 'যদি আমি একবার বুঝতে পারতাম, কি করে একটা স্ট্যাচু তৈরী করা যায়, আমি হাজার হাজার স্ট্যাচু তৈরী করতে পারতাম'। যতোদিন না তিনি সফল হবেন, ততোদিন কোনো স্ট্যাচুই তৈরী হবেনা, শুধু টুকরো টুকরো অনন্য সৃষ্টি— তাদের গুরুত্ব শুধু এই যে তারা ভাস্করকে তাঁর লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। ঐ সবই তিনি ভেঙে ফেলেন, আবার নতুন করে গড়েন। কখনও কখনও তাঁর বন্ধুরা এই ধ্বংসস্তূপ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে একটা মানুষের মুখাবয়ব, কোনো যুবতীর প্রস্তরময় শরীর, কোনো নবযৌবনোন্মুখ পুরুষের মূর্তি। তিনি আপত্তি করেননি, নতুন সৃষ্টির কাজে ডুবে গেছেন। পনেরো বছরে শুধু একবার তিনি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

শুধু জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে তিনি প্রদর্শনীতে অংশ নিতে রাজী হয়েছিলেন। তবু তাঁর মনে দ্বিধা ছিলো, সেই সংশয়েরই প্রকাশ তাঁর উক্তিতে: 'দারিদ্র্যকে আমি ভয় করতাম, মুখ্যতঃ তাই এই ভাস্কর্যগুলো ব্রঞ্জ এবং ফটোগ্রাফিতে বেঁচে আছে।

তাঁর সংশয়ের কারণ: অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের মধ্যে দোলায়মান, চিরন্তন রূপায়ণ, পরিপূর্ণ বিকাশ, ধ্বংস এবং পুনরারম্ভের অন্তর্বর্তী প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত এইসব মর্মস্পর্শী শিল্পকীর্তি স্বাধীন অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে, জনমানসে আগ্রহ জাগিয়েছে এবং স্রষ্টার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, স্বতন্ত্রভাবে একটা সামাজিক সত্তায় উপনীত হয়েছে।

শিল্পী তাঁর এইসব সৃষ্টির কথা ভুলে যেতে চান। শূন্যতার সন্ধানে ব্যাপৃত এই ভাস্করের এইটেই সবচেয়ে লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য।

● ● ●

আলেকজাণ্ডার সোলঝেনিৎসিন

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রাশিয়ান সাহিত্যিক সোলঝেনিৎসিন আজ স্বদেশ থেকে নির্বাসিত। জন্ম ১৯১৮-য়, স্ট্যালিন-যুগের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এগারো বছর বন্দী ছিলেন সোলঝেনিৎসিন। প্রখ্যাত রাশিয়ান কবি ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেংকো বলেছেন, সোলঝেনিৎসিন একালের একমাত্র ক্লাসিক রাশিয়ান লেখক। অন্য সমালোচকেরা মনে করেন, আঙ্গিক ও শিল্পরীতির দিক থেকে তিনি দস্তয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, তলস্তয় ও গোর্কির সার্থক উত্তরাধিকারী। স্ট্যালিনযুগ থেকে সোভিয়েৎ রাশিয়ার আমলাতন্ত্র যে ভাবে সেন্সরশিপ ব্যবস্থার মাধ্যমে লেখকের কণ্ঠরোধ করে, তার সঙ্গে মার্ক্স-বাদের তাত্ত্বিক বা প্রয়োগগত পদ্ধতির কোন সত্যিকার যোগাযোগ আছে কিনা, এটা বিতর্কের বিষয়। তবে একথা সত্য যে এই সোভিয়েৎ আমলাতন্ত্রের নির্দেশে দস্তয়েভস্কির লেখা রাশিয়ায় প্রকাশ দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ ছিল, কবি মায়া-কোভস্কিকে বলা হতো 'নৈরাশ্যবাদী গুণ্ডা', কবি অ্যানা আখমাতোভাকে বলা হয়েছে 'প্রতি বিপ্লবী', নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বোরিস পাস্তেরনাককে বলা হয়েছে 'প্রতিক্রিয়াশীল'। আজ যখন এই সব কবি ও লেখক মৃত্যুর পরে রাশিয়ায় স্বীকৃতি পেয়েছেন, সোলঝেনিৎসিনের মৃত্যুর পর 'ফার্স্ট সারকল' 'ক্যানসার ওয়ার্ড' বা 'গুলাগ আর্কিপেলাগো' সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতা থেকে লেখকের বিচ্যুতি সংক্রান্ত কিছু আমলাতান্ত্রিক উপক্রমনিকা-সহ রাশিয়ায় প্রকাশিত হলে আমরা আশ্চর্য্য হব না।



স্বপ্ন

আলেকজাণ্ডার সোলঝেনিৎসিন

সে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছিল। কংক্রীটের তৈরী একটা টিউবের ভেতর দিয়ে। না, একটা টানেলের ভেতর দিয়ে। দুপাশ থেকে ইস্পাতের বারগুলো উঁচিয়ে আছে। মাঝে মাঝে তাকে আটকাচ্ছে। তার ঘাড়ে, ব্যথাটা যেখানে, সেখানেও লেগেছে। সে পেট ঘসে হামাগুড়ি দিচ্ছে। তার ভারী শরীরটা মাটির ওপর চাপ দিচ্ছে। ভারটা শরীরের ওজনের থেকেও বেশী। সে এই চাপে অভ্যস্ত নয়। তার মনে হচ্ছে, সে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবে। প্রথমে সে ভেবেছিল, বুঝি কংক্রীট ওপর থেকে তার ওপর চাপ দিচ্ছে। কিন্তু না, তার শরীরটাই আসলে ভারী। শরীরটা টেনে নিয়ে যেতে যেতে তার মনে হয়, ওটা যেন থলিভর্তি ধাতুর টুকরোর মত ভারী। এতো ভারী যে সে বোধহয় আর কোনদিন নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবেনা। শুধু একটা ব্যাপারেরই এখন তার কাছে গুরুত্ব আছে। এই সুড়ঙ্গ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে তাকে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে হবে। তাকে আলোর দিকে তাকাতে হবে। কিন্তু সুড়ঙ্গটা ফুরোয় না, কিছুতেই ফুরোয় না।

তারপর কোথা থেকে যেন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। অন্য কেউ কথা বলেনি। যেন বেতারে ভেসে আসা একটা ভাবনাই তার কানে বাজে। সেই স্বর তাকে পাশের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে বলে।

সে ভাবে, 'ওখানে মুখোমুখি দেয়াল থাকলে কিভাবে পাশের দিকে এগোনো সম্ভব?' কিন্তু আদেশটা না মেনে তার উপায় নেই। তার নিজের শরীরের ওজন যেমন তাকে এই মুহূর্তে চিঁড়েচ্যাপ্টা করে দিচ্ছে, এই আদেশও তেমনই গুরুভার। মৃদু অস্ফুট আর্তনাদ করে সে পাশের দিকে হামাগুড়ি দেয়। বাঁদিকে এগুতে যখন সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখনই হুকুম আসে, ডান দিকে যাও। সে মৃদু আর্তনাদ করে তখনই ডান দিকে যায়। অসহ্য ভার, আলো নেই, সুড়ঙ্গের শেষ কোথায় দেখা যাচ্ছে না এখনো। সেই স্পষ্ট কণ্ঠস্বর তাকে এবার ডান দিকে ঘুরতে বলে। সে কনুই ও পা দিয়ে রাস্তা করে নেয় এবং ডান দিকে দেয়াল থাকা সত্বেও সে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলে। মনে হয়, কাজ হচ্ছে। এবার আদেশ আসে, বাঁ দিকে ঘোরো। এখন আর তার সংশয় নেই, চিন্তা ভাবনার ক্ষমতাও নেই। কনুই দিয়ে সে পথ করে নিয়ে বাঁ দিকে যায়। তার ঘাড়ে বারবার ইস্পাতের বারের খোঁচা লাগছে, মাথা ঝনঝন করে উঠছে। জীবনে এ রকম ঝামেলায় সে কখনো পড়েনি। সুড়ঙ্গের শেষ না দেখে এখানে মরে যাওয়া দুঃখের ব্যাপার হবে।

হঠাৎ তার পাদুটো হাল্কা লাগে। যেন হাওয়ায় ফুলে উঠছে দুটো বেলুন। পা দুটো ওপরে উঠছে, যদিও বুক ও মাথা এখনও মাটি ছুঁয়ে আছে। সে আদেশের জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু কেউ আদেশ দেয় না। তখন সে বুঝতে পারে, হয়তো সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে বের হবার একটা পথ 'ছিল'। সে পা দুটোকে সুড়ঙ্গের বাইরে ভাসতে দেয়, পেছন দিকে হামাগুড়ি দেয় এবং সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। হাতে চাপ দিয়ে (কোথা থেকে সে শক্তি পেলো, কে জানে) সে নিজের পা দুটোকে অনুসরণ করে পেছন দিকে হামাগুড়ি দিয়ে একটা গর্তের ভেতর দিয়ে বাইরে বের হয়। গর্তটা সরু। কিন্তু এখন মাথা নীচের দিকে থাকায় সব রক্ত তার মাথায় নেমেছে। তার মনে হচ্ছে, তার মাথাটা ফেটে যাবে, সে মরে যাবে। সে হাত দুটো

দিয়ে আবার আস্তে ঠেলা দেয় এবং সারা শরীরে অজস্র কাটাছেঁড়া দাগ নিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে।

যেখানে নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে, এমন একটা জায়গায় একটা পাইপের ওপর এখন সে বসে আছে। আর কেউ কাছেপিঠে নেই। ওদের কাজের সময় শেষ হয়ে গেছে। চারপাশে কাদামাটি। পাইপের ওপর বসে বিশ্রাম নিতে নিতে তার খেয়াল হয়, তার পাশে বসে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে। মেয়েটির পরনে নোংরা ওভারঅল, মেয়েটির মাথা খোলা, খড়ের মত চুল আলগা, চিরুনি বা পিন নেই। মেয়েটি তার দিকে তাকাচ্ছেনা। মেয়েটি যেন আশা করছে, সে কিছু বলবে। প্রথমে তার ভয় হয়। তারপর সে বুঝতে পারে, মেয়েটি আরও বেশী ভয় পেয়েছে। তার কথা বলার ইচ্ছে ছিলনা, কিন্তু মেয়েটি তার প্রশ্নের জন্যে প্রতীক্ষায় রয়েছে দেখে সে বলে: 'ছোট্ট মেয়ে, তোমার মা কোথায়?'

'আমি জানিনা।'

মেয়েটি পায়ের নখ দেখছে, হাতের নখ দাঁতে খুঁটছে।

'সে কি, তুমি জান না?'

ওর মেজাজ গরম হতে সুরু হয়।

'তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি সত্যি কথা বল। সত্যি যা তাই রিপোর্টে লিখতে হয়···কথা বলছনা কেন? আবার জিজ্ঞেস করছি। বল, তোমার মা কোথায়?'

'ওই কথাটাই আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

মেয়েটি এবার তার দিকে তাকায়।

মেয়েটির চোখে জল। সেই মুহূর্তে রুশানভ বুঝতে পারে যে এই মেয়েটি প্রেস অপারেটর গ্র্‌শা-র মেয়ে। গ্র্‌শা 'জনগনের নেতার' সমালোচনা করে গালমন্দ করত বলে তাকে কনসেন্টেশন ক্যাম্পে পোরা হয়েছিল। গ্র্‌শার মেয়ে স্কুলে ভর্তি হবার ফর্মে তার মা যে অ্যারেস্ট হয়েছে, এই কথাটা লেখেনি। তাই রুশানভ মেয়েটিকে

ডেকে এনে ধমক দিয়েছিল। মেয়েটি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু ওর চুল ও চোখ দেখে এখন মনে হচ্ছে, মেয়েটি জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। এখন সেই মেয়েটি ওর পাশে বসে আছে। সুতরাং রুশানভ নিজেও মৃত! সে ঘামতে শুরু করে। ঘাম মুছে সে বলে—

'এখানে দারুণ গরম। খাওয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে?'

'ওখানে।'

মেয়েটা ঘাড় নাড়ে।

আঙুল বাড়িয়ে মেয়েটি দেখায়, পশুদের জল খাওয়ার পাত্রে সবুজ রঙের কাদার সঙ্গে মেশানো বৃষ্টির বাসি জল। রুশানভের মনে হল, এই জলটাই মৃত্যুর সময় গিলেছিল মেয়েটি এবং তখন সে চায়, ওই জল গিলতে যেয়ে রুশানভের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু তাহলে ...তাহলে রুশানভ তো বেঁচে আছে!

মেয়েটা যেন চলে যায়, সেই উদ্দেশ্যে চালাকী করে বলে রুশানভ—

'তুমি বরং ফোরম্যানকে ডেকে আনো। ও আমার বুট জোড়া আনবে। খালি পায়ে হাঁটবো কি করে?'

মাথা নেড়ে পাইপ থেকে লাফিয়ে নামে মেয়ে, জলকাদার মধ্যে ছপছপ করতে করতে এগিয়ে যায়। পরনে তার অবিন্যস্ত পোষাক, মাথায় টুপি নেই। গায়ে ওভারঅল, পায়ে বুট জুতো।

রুশানভের এতো তেষ্টা পেয়েছে যে সে ভাবে, সে পশুদের জন্যে ঢাকনিবিহীন লম্বা সরু পাত্রে রাখা ওই নোংরা জলই খাবে। পাইপ থেকে নামতে যেয়ে সে অবাক হয়ে দেখে, কাদায় তার পা পিছলে যাচ্ছেনা। তার পায়ের নীচে মাটি কেমন যেন অদ্ভুত। চারপাশের সব কিছুই কেমন অস্পষ্ট, অদ্ভুৎ! দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। সে এভাবেই হেঁটে যেতো। কিন্তু হঠাৎ তার মনে ভয় হল, সে গুরুত্বপূর্ণ একটা ডক্যুমেন্ট হারিয়ে ফেলেছে। হাতের আঙুল যতো দ্রুত কাজ করতে পারে, তার থেকেও দ্রুত নিজের পকেট হাতড়ালো সে। হ্যাঁ, ডক্যুমেন্টটা হারিয়ে গেছে।

সে ভয় পেলো, দারুণ ভয় পেলো।

ওই রকম কোন নথিপত্র এখন বাইরের কোন লোক পড়লে তার ঝামেলা হতে পারে। সে টিউবের ভেতর থেকে বের হবার সময়ই ওটা হারিয়েছে বুঝতে পেরে সে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। কিন্তু জায়গাটা সে আর চিনতে পারলনা। টিউবটাও নেই। তার বদলে, শ্রমিকেরা কাজ করছে এবং ওদের কেউ নথিটা পেলেই বিপদ!

শ্রমিকেরা সবাই বয়সে যুবক। ওদের কাউকেই সে চেনে না। হাতুড়ির চাপে ধাতুখণ্ড জোড়া দেওয়া যার পেশা, সেই রকম একজন ওয়েল্ডারের পরনে কাঁধে স্ট্র্যাপ-লাগানো ক্যানভাসের জ্যাকেট। লোকটা ওর দিকে তাকাচ্ছে কেন? ও কি ডক্যুমেন্টটা পেয়েছে?

'হাই, তোমার কাছে দেশলাই আছে?'

কৃশানভ বলে।

'কিন্তু তুমি তো সিগারেট খাও না।'

ওয়েল্‌ডার জবাব দেয়।

(ওরা সবই জানে? তা কি করে সম্ভব?)

'আমার অন্য কোন প্রয়োজনে দেশলাই দরকার।'

'অন্য কোন দরকারে?'

ওয়েল্ডার ওকে খুঁচিয়ে দেখছে। শ্রমশিল্প সংক্রান্ত অন্তর্ঘাতী ক্রিয়া-কলাপ যাদের পেশা, ঠিক তাদের মতোই জবাব দিয়েছে কৃশানভ। ওরা হয়তো তাকে আটকাবে। ইতিমধ্যে কেউ হয়তো ডক্যুমেন্টটা খুঁজে পাবে। ওটার জন্যেই দেশলাই দরকার। ওটা পোড়াতে হবে।

যুবক ওয়েল্ডার এগিয়ে আসে। কৃশানভ ভয় পায়। কি ঘটতে চলেছে, সে জানে। যুবক সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে।

'যেহেতু ইয়েলচানস্কায়া তার মেয়ের দেখাশোনা করার জন্যে আমায় বলেছে, আমি জানি, ওই মহিলার ধারণা যে সে দোষী এবং তাকে

অ্যারেস্ট করা হবে।'

রুশানভ কেঁপে ওঠে।

'তুমি কি করে এসব জানলে ?'

সে বলে।

(প্রশ্নটা যদিও অর্থহীন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই তরুণ শ্রমিক রুশানভের লেখা সেই রিপোর্টটা, হারিয়ে যাওয়া সেই ডক্যুমেন্টটা পড়েছে। তার শেষ কথাটা রিপোর্টের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।)

কিন্তু আর কিছু না বলে ওয়েলডার নিজের কাজে চলে গেল। রিপোর্টটা, হারানো ডক্যুমেন্টটা কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই আছে। রুশানভ ছুটতে থাকে। ওটা তাড়াতাড়ি ফিরে পাওয়া দরকার। দেয়াল, বাঁক ঘোরে রুশানভ, তার হৃৎপিণ্ড ধকধক করে, কিন্তু পাদুটো তাল রাখতে পারেনা। তার পাদুটো আস্তে চলেছে। সে ছুটতে পারছেনা। সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ওই তো, কাগজটা দেখা যাচ্ছে। ওটাই। সে ছুটে যেয়ে কাগজটা তুলতে চায় কিন্তু তার পা দুটো নড়েনা। সে হামাগুড়ি দিয়ে প্রধানতঃ হাতের সাহায্যে এগোয়। যদি আর কেউ তার আগেই ওখানে যেয়ে রিপোর্টটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

কে একজন তার কাঁধ ছোঁয়। সে ভাবে, সে মাথা ঘোরাবেনা। তাহলে কাগজটা হারিয়ে যাবে। কিন্তু নরম মেয়েলি হাতের ছোঁয়া। ইয়েলচানস্কায়া নিজেই এসেছে। ঝুঁকে পড়ে নরম গলায় কানে কানে বলছে মহিলা—

'বন্ধু আমার, বলতে পারো, আমার মেয়ে কোথায় ? আমার মেয়েকে কোথায় রেখে এলে তুমি ?'

রুশনাভ মুখ না ঘুরিয়েই বলে—

'ইয়েলিনা ফেডোরভনা, তুমি ভাবনাচিন্তা কোরোনা। তোমার মেয়ে ভালো জায়গাতেই আছে।'

'কোথায় ?'

'একটা চিলড্রেনস হোমে ?'

'কোথায় ?'

'আমি জানিনা'।

···সত্যি কথাটা সে মহিলাকে জানাতে পারলে খুসী হতো কিন্তু সত্যিই সে জানেনা, ওঁর মেয়ে এখন কোথায় আছে। সে নিজে মেয়েটিকে ট্রান্সফার করেনি। ওরা প্রায়ই মেয়েদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরিয়ে দেয়।

'আমার মেয়ে কি এখন আমার নামেই পরিচিত ?'

নরম গলায় বিষণ্ণ প্রশ্ন ভেসে আসে।

'না।'

সহানুভূতির সঙ্গে বলে রুশানভ।

'ওদের নিয়ম অনুযায়ী নাম বদলাতে হয়। আমার এই ব্যাপারে কিছু করার নেই ?

···মাটিতে শুয়ে রুশানভের মনে পড়ছে, এই ইয়েলচানস্কায়া দম্পতিকে তার ভালোই লেগেছিল। ওদের ওপরে তার রাগ ছিলনা। হ্যাঁ, সে মহিলার স্বামীর নামে রিপোর্ট করেছিল বটে। কিন্তু সে শুধু চুখনেনকো-র অনুরোধ রাখতে। ইয়েলচানস্কায়ার স্বামী পেশাগত ব্যাপারে চুখনেনকোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাই প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরাতে চেয়েছিল চুখনেনকো। মহিলার স্বামী অ্যারেষ্ট হওয়ায় সে আন্তরিকতার সঙ্গেই মহিলা ও তার মেয়ের দেখাশুনো করতো। পরে মহিলা যখন বুঝতে পারলো, সে নিজেও অ্যারেষ্ট হতে চলেছে, মেয়ের দায়িত্ব সে রুশানভকেই দিয়ে গেল। কিন্তু ইয়েলচানস্কায়া নামের সেই মহিলার বিরুদ্ধে কেন রিপোর্ট দিয়েছিল রুশানভ ? তার মনে নেই।

পটভূমি বদলে যায়।

খনির গহ্বরে গ্যালারীতে শুয়ে আছে সে। তার চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। চারপাশে মাটিতে টুকরো টুকরো কয়লা।

এবং একটা টেলিফোন। টেলিফোনটা এখানে কি করে এলো? কনেকশন আছে তো? সে ফোন করে কাউকে পানীয় আনতে বলবে? না, সে হাসপাতালে যেতে চাইবে।

সে রিসিভার তোলে। ডায়ালটোনের বদলে জোরালো গলার স্বর ভেসে আসে—

'কমরেড রুশানভ?'

'ইয়েস, ইয়েস'।

'কমরেড রুশানভ, এখুনি সুপ্রীম কোর্টে হাজিরা দাও।'

'সুপ্রীম কোর্ট?' হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখুনি। কিছু মনে করবেন না, কোন্ সুপ্রীম কোর্ট? পুরোনো না নতুন?'

'নতুন। তাড়াতাড়ি এসো।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হয়।

সুপ্রীম কোর্টে ইদানীং যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, তার মনে পড়েছে। প্রথমে রিসিভার তুলেছিল বলে সে নিজেকে গালাগাল দেয়। মাতুলেভিচ নেই···ক্লোপভ নেই···বেরিয়া পর্যন্ত নেই। কি যে সময় পড়েছে?

কিন্তু তাকে আদেশ মানতে হবে। সে এতো দুর্বল যে উঠতে পারছেনা কিন্তু এখন তাকে ডাকা হয়েছে এবং সে জানে, তাকে যেতেই হবে। সে হাত-পা শক্ত করে উঠে দাঁড়ায়, পড়ে যায়। হাঁটতে শেখান এমন একটা বাছুরের মত।

সে কি করবে? দেশের সর্বোচ্চ বিচারসংস্থাকে সে সম্মান করে। তার একমাত্র উপায় হলো, নিজের সমর্থনে যুক্তি দেখানো। হ্যাঁ, সে সাহস করে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে।

সে ওদের বলবে —

'আমি তো বিচারের রায় দিইনি। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ভারও আমার ওপরে ছিলনা। আমি শুধু আমার সন্দেহের কথা জানিয়েছি। সাধারণের ব্যবহার্য্য প্রস্রাবখানায় যদি আমি 'জনগণের মহান নেতা'র

ফটোর ছেঁড়া টুকরো সমেত এক টুকরো ছেঁড়া খবরের কাগজ দেখতে পাই, খবরটা যথাস্থানে জানানো আমার কর্তব্য। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে, নাও হতে পারে। সত্য কি, সেটা খুঁজে বার করা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান সংক্রান্ত সরকারী এজেন্সীর কাজ ছিল। আমি সোভিয়েৎ নাগরিক হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র।'

হ্যাঁ, সে ওদের বোঝাবে—

'পেছনে ফেলে আসা বছরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজকে নৈতিক দিক থেকে সুস্থ করে তোলা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পার্জ ছাড়া, বিরোধীদের বিনাশের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের শুদ্ধিকরণ ছাড়া এটা সম্ভব ছিলনা। এবং পশুমল সাফ করার জন্য কোদাল ব্যবহার করতে যেসব লোকের অনীহা নেই, তাদের সাহায্য ছাড়া 'পার্জ' বা বিরোধীদের হত্যার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজের শুদ্ধিকরণ সম্ভব নয়।'

তার মস্তিষ্কের ভেতরে এইসব যুক্তি গড়ে উঠছিল এবং কিভাবে সে যুক্তি দেখাবে, তাই ভেবে সে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। এখন সে সুপ্রীম কোর্টে পৌঁছুতে উদগ্রীব। তাকে ডাকা হলে সে চেঁচিয়ে বলবে—

'আমি তো একা নই! শুধু আমার বিচার করা হচ্ছে কেন? আমি যা করেছি, সেকাজ করেনি এমন একজনের নাম করা হোক। যদি সে ষ্টালিনযুগে এই কাজ না করে থাকে, কিভাবে সেই যুগে তার পদমর্যাদা বজায় রেখেছিল? তোমরা গুজুন-এর কথা উল্লেখ করছো, সে কারারুদ্ধ হয়েছিল, তাই না?'

সে এখন উত্তেজিত যেন সে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। এবং যদিও সে সত্যিসত্যিই চেঁচাচ্ছে না, তার গলা ফুলে উঠেছে, গলায় ব্যথা লাগছে। সে এখন খনির গ্যালারীর বদলে সাধারণ একটা করিডর দিয়ে হাঁটছে। পেছন থেকে কে যেন বলছে—

'পাশকা, তোমার কি হয়েছে? তুমি কি অসুস্থ? তুমি ওরকম টেনে টেনে হাঁটছো কেন?'

সে পেছন ঘুরে দেখে, জভেইনেক্ তাকে ডাকছে। তার পরণে

টিউনিক, কাঁধে বেল্ট আঁটা। ওকে অতো কমবয়সী মনে হচ্ছে কেন? হ্যাঁ, ওর বয়স কম ছিল। কিন্তু সেতো অনেক বছর আগের কথা।

'কোথায় চলেছো, জ্যান্?'

'কমিশনে হাজিরা দিতে।

'আমারই মতো।'

দুজনে যুবকের মত দ্রুত পা ফেলে ওরা হেঁটে যায়। রুশানভের মনে হয়, তার বয়স কুড়ি, তার তখনও বিয়েই হয়নি।

মস্ত বড় একটা অফিস। ডেস্কের আড়ালে বুদ্ধিজীবিরা বসে আছে। টাইপরা দাড়িওলা বুড়ো অ্যাকাউনট্যান্টদের মত দেখাচ্ছে। ইনজিনীয়ারদের জ্যাকেটের ল্যাপেলে লাল হাতুড়ি আঁকা। বয়স্ক অভিজাত চেহারার মহিলারা। চড়া মেক-আপে তরুণী টাইপিষ্টরা—তাদের তাদের স্কার্টের ঝুল হাঁটুর অনেক নীচে। তার এবং জভেইনিকের চারটে বুট একসংগে শব্দ তুলে এগিয়ে যেতেই সবাই ফিরে তাকায়। অনেকে উঠে দাঁড়ায়, কেউ কেউ সীটে বসেই মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায়। ওদের গতির দিকে সবারই লক্ষ্য। প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টিতেই আতঙ্ক। দেখে খুশী হয় প্যাভেল ও জ্যান্।

ওরা পরের কামরায় ঢুকে কমিশনের অন্য সদস্যদের অভিবাদন জানিয়ে লাল টেবিল-ক্লথ-ঢাকা একটা টেবিলের সামনে বসে।

কমিশনের প্রেসিডেন্ট ভেন্কা অর্ডার দেন—

'বেশ, এবার কাজ শুরু হোক।'

ওরা কাজ শুরু করে। প্রথমেই আসে প্রেস অপারেটর গ্রুসা।

'গ্রুসা মাসী, এখানে তুমি কি করছো?'

ভেন্কা অবাক হয়ে বলেন।

'এখানে অ্যাডমিনস্ট্রেশনে পার্জের ব্যাপারে আমরা ব্যস্ত। এব্যাপারে তোমার কি দরকার? তুমি কবে থেকে শাসকদের একজন হলে?'

সবাই হেসে ওঠে।

'না, সেরকম কিছু নয়।'

গ্রেলো পিসী বলে।
'আমার মেয়ে বড় হচ্ছে। তাকে কিনডারগার্টেনে ঢোকাতে চাই।'
'ঠিক আছে, গ্রুসা পিসী।'
প্যাভেল বলে।
'তোমার অ্যাপ্লিকেশন লিখে দিও। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেবো। তোমার মেয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন আমাদের কাজে বাধা দিও না। আমরা বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে বিরোধীদের খুঁজে বার করে তাদের ধ্বংস করে 'পার্জ'-এর ব্যবস্থা করতে চলেছি।'
তার এতো তেষ্টা লাগছে যে তার গলায় যেন আগুন ধরেছে বলে মনে হয়।
'আমাকে তেষ্টা মেটাবার কিছু দাও।'
সে চেঁচিয়ে ওঠে।
'এখুনি দিচ্ছি।'
ক্যান্সার ওয়ার্ডের ডাক্তার গ্যানগার্ট বললেন।
'তোমায় এখুনি জল এনে দিচ্ছি।'
স্বপ্ন ভেঙে গেছে। চোখ খোলে ক্যান্সার ওয়ার্ডের রোগী রুশানভ। লেডী-ডাক্তার গ্যানগার্ট তার বিছানার ধারে বসে আছে।
'আমার খুব খারাপ লাগছিল আজ', রুশানভ জানায়।
'না, তুমি ভালোই আছো। আসলে তোমার ওষুধের ডোজ আজ বাড়ানো হয়েছিল।'
'তার মানে? তোমরা কি রোজই ডোজ বাড়াবে?'
'না। এখন থেকে রোজ এই ডোজই দেওয়া হবে এবং তুমি এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে তোমার এতো খারাপ লাগবে না।'
'কিন্তু সুপ্রীম?' কথাটা সুরু করেই সে থেমে যায়।

ডিলিরিয়ামে দেখা স্বপ্নের পৃথিবী এবং বাস্তবের পৃথিবীর পার্থক্য সে এখনই বুঝতে পারছে না।
